পরমহংস মহানন্দগিরি

শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বামদেব সংঘ
৮, প্রামাণিক ঘাট রোড
কাশীপুর, কলিকাতা-৩৬

প্রকাশক :—
বামদেব সংঘের পক্ষে
সম্পাদক :—শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ., বি. এল.
৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-৩৬

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
শুভ ২০শে আশ্বিন, বুধবার শুক্লা সপ্তমী

প্রাপ্তিস্থান :—

মেসার্স মহেশ লাইব্রেরী ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিঃ-১২
" নাথ ব্রাদার্স ৯,শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
" দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
" ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
" সিনহা পাবলিসিং হাউস ৩৯, এস, আর, দাস রোড, কলিকাতা-২৬
" জনপদ ৬৮,কাশীপুর রোড, কলিঃ-৩৬
" ধাম এণ্ড কোং তারাপীঠ বীরভূম
শ্রীঅমিয় কুমার পাল, বামদেব সংঘ আশ্রম, তারাপীঠ বীরভূম
তারা কুঠির, ১৩৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকতা-১২

মুদ্রাকর :—
শ্রীব্যোমকেশ বসাক
বসাক ট্রেডিং কোং
৩০নং রাজ কুমার মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-৩৫

স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী

সচলশিব ত্রৈলঙ্গস্বামী

- সরস্বতী সূর্য্যনারায়ণ গিরি (গুপ্তসাধক)
  - পরমহংস মহানন্দগিরি
- স্বামী কালিকানন্দ
- স্বামী ব্রহ্মানন্দ
- স্বামী ভোলানন্দ
- স্বামী সদানন্দ
- স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গ
- স্বামী সচ্চিদানন্দ
- স্বামী সত্যানন্দ
- স্বামী নরসিংহানন্দ
- কানাইলালজী
- মঙ্গলদাস ভট্টজী
- মহাদেব ভট্টজী
- শ্রীকৃষ্ণ ভট্টজী
- অম্বাদেবী
- শ্রীরাম ভট্টজী
- ভৈরবী যোগেশ্বরী (ব্রাহ্মণী মা)
- রাজলক্ষ্মীদেবী (অম্বালিকাদেবী)
- শঙ্করী মাতাজী
- কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গৃহস্থ)
- রামতারন ভট্টাচার্য্য (গৃহস্থ)
- উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (গৃহস্থ)

৺রী তারামা

পরমহংস মহানন্দগিরি

(১)

ক'লকাতা ভগবান ব্যানার্জ্জি লেন,—আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হ'তে বেরিয়ে মিশেছে নাথের বাগান ষ্ট্রীটে। এই গলিপথের মধ্যে ছিল একদিন এক বৃহৎ অট্টালিকা, যেখানে হ'তো পুর্ব্বে-দোল-দুর্গোৎসব বারমাসে তের পার্ব্বন ও আতুর দরিদ্রে অন্ন বিতরণ। সেবা পরায়ণ ছিলেন গৃহ কর্ত্তারা যাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সে কীর্ত্তি, সে জাঁক-জমক আজ নিভে গিয়েছে, শুধু টিপ্-টিপ্ ক'রে এখন জ্বলছে অতীত স্মৃতি—পথের নামে। যে অট্টালিকা অতীতে মুখরিত হ'তো খোল, করতাল এবং ঢাক-ঢোলের মধুর গুঞ্জনে, কালস্রোতে কালের গতিতে, পরবর্ত্তীকালে সেই অট্টালিকায় দেখা দিল ভক্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞানবিচার সীমাবদ্ধ সাকারের সংহার, নিরাকারে একাকার। সমাজ আচার-বিচার, কৃষ্টি ও শাসন সবই নবচেতনা লাভ ক'রলো জ্ঞানীর জ্ঞান বিচারে, হঠাৎ আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুদয়ে। বায়সের বাসায় কোকিল অণ্ড প্রসব করে, এ পুরাতন রীতি; প্রগতির যুগে বিচারাধীন। যুক্তি-তর্কের মীমাংসায় পৌরাণিক তত্ত্বে আভিজাত্যের স্থান অসম্মান জনক ও সীমাবদ্ধ। ছিঁচ কাঁদুনে ভক্তি ও বিশ্বাসে নাই পুরুষকারের ন্যায় নিষ্ঠা, জ্ঞানের বিচার, শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা বা উচ্চাসন। অজ্ঞান আঁধারে আবৃত কুসংস্কার জনিত অন্ধবিশ্বাস ও ছিঁচ কাঁদুনে ভক্তি থাক্ এক ঘরে হ'য়ে শ্মশান-মশান ও মন্দিরে।

সহসা গর্জ্জে উঠলো আদি ব্রাহ্ম সমাজের কু-সংস্কার বিবর্জ্জিত ঢোলের গুরু গম্ভীর নাদ, ভক্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞান, পৌত্তলিকতার অবসান, কর্ম্ম চঞ্চল ক'লকাতার বুকে ছোঁয়াচে রোগের মত। তখনকার দিনে পরাধীন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্ব্বিত বিদ্বান-বিদ্যোৎসাহীরা পূর্ব্ব প্রচলিত পূর্ব্ব-পুরুষদের রীতি-নীতি ত্যাগ ক'রে দলে-দলে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলেন। এক ঘেয়ে পুরাতনের আস্বাদ-বিস্বাদে পরিণত হয় ব'লে মানুষ চায় নতুনের আস্বাদ, রসনা পরিতৃপ্ত ক'রতে। আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে যে, পুরাতনেরই পুনরাগমন

আমরা সে কথা ভুলে যাই ব'লে নতুনে হই মোহগ্রস্ত এবং পুরাতনে করি আরোপ কুসংস্কার ও কদাচার।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষীশ্চেতাকেবলোনির্গুণশ্চ॥"

একই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত ও নিগূঢ় ভাবে অধিষ্ঠিত শ্রোতি তিনিই কর্ম্মের সার মর্ম্ম, অধ্যক্ষ এবং সাক্ষীস্বরূপ তথা নির্গুণ, নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তাঁর ইচ্ছায় জগৎ উদ্ভাসিত এবং বিলুপ্ত হয়। ইচ্ছানুযায়ী তিনি সাকার ও নিরাকার হন।

যে মহাপুরুষের জীবনচরিত প্রকাশ ক'রতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি সেই মহাপুরুষই হলেন আহিরীটোলা নিবাসী ৺ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বংশধর, নাম তাঁর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ মার্চ মাসে এক শুভদিনে তিনি আহিরীটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ক'লকাতায় এক সওদাগরী অফিসে হিসাব-নিকাশ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যে সুরেন্দ্রনাথ খুবই মেধাবী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যাশিক্ষা শেষ ক'রে তিনি কিছুকাল পি, ডাবলু, ডিতে সার্ভেয়র পদে চাকুরী করার পর গ্রাণ্ডকর্ড লাইন পত্তন কালে গয়া জেলায় বদলী হন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তিনি সাহেব ইঞ্জিনিয়রের নির্দ্দেশমত কিছুদূরে পথ নির্ম্মাণ কাজে অপরাপর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে ক্যাম্পে অবস্থান করেন। নতুন পথ জরিপের সময় পথের মাঝে এক সন্ন্যাসীর পর্ণ কুটীর পড়ে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সেই কুটীর ভেঙ্গে দেওয়া হবে এই সংবাদ পেয়ে সন্ন্যাসী খুবই মর্ম্মাহত হন। জরীপের কাজ শেষ করে যখন সুরেন্দ্রনাথ ঐ পর্ণকুটীরের পাশ দিয়ে ক্যাম্পে ফিরছেন সেই সময় সন্ন্যাসী বিষণ্ণ বদনে সুরেন্দ্রনাথকে বললেন, "এ কুটীর ভেঙ্গোনা, তুমি তোমার বড়সাহেবকে বল, যেন পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।" এই কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ মুচকে হেসে বল্লেন, "পথ ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে অযথা অনেক অর্থব্যয় হবে তাই বড় সাহেব কিছুতেই রাজী হবেন না।" সন্ন্যাসী মৃদু-হাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ! তুমি একবার তোমার সাহেবকে বলেই দেখনা, তিনি নিশ্চয়ই রাজী হবেন।" যদিও বড় সাহেবের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রায়ই মতবিরোধ হ'ত তথাপি তিনি সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে বল্লেন, "আপনার কুটীরের বিষয় আমি নিশ্চয়ই জানাবো কিন্তু, তিনি রাজী হবেন ব'লে মনে হয় না।" একটি ক্ষুদ্র পাতায় এক অক্ষরী বীজমন্ত্র লিখে সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের টুপির মধ্যে আটকে দিলেন। আর কোন কথা না ব'লে সুরেন্দ্রনাথ ক্যাম্পে

ফিরে এলেন। কি জানি কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ আহারাদি না ক'রে বড় সাহেবের কুটীরে গেলেন। প্রখর রৌদ্রে গলদ-ঘর্ম্ম হ'য়ে যখন তিনি সাহেবের কুটীরে উপস্থিত হ'লেন তাঁর অবস্থা দেখে বড় সাহেব বল্লেন, "আহা, কেন এই রৌদ্রে এলেন, বিকালে এলেই তো হ'তো।" সন্ন্যাসীর কুটীর সম্বন্ধে বড় সাহেবকে প্রার্থনা জানালেন যাতে কুটীরটি রক্ষা পায়। সব কথা শুনে সাহেব বল্লেন, "যতই খরচ হোক্ আপনি পথ ঘুরিয়ে দিন,—ধর্ম্মে হাত দেওয়া আইন বিরুদ্ধ।" সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেই কুটিরে গেলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর আর ওখানে কোনদিন দেখা হ'লনা।

পাতায় লেখা বীজ মন্ত্রের যদি এত শক্তি হয়, না জানি সন্ন্যাসী তবে কত শক্তি ধারণ ক'রে আছেন। ক্ষুদ্র বট-বীজ দেখলে মনে হয়না যে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ ঐ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। রোদ-জল পেয়ে যখন কালে সে আত্ম প্রকাশ ক'রে বিরাট বাহু প্রসারণ করে তখন ঐ ক্ষুদ্র বীজের প্রভাব বেশ অনুমান করা যায়। কালেই জন্ম, কালেই স্থিতি আবার কালেই সব লয় পায়। এই মহাকালই হলেন সর্ব্বভূতের একমাত্র অবলম্বন যাঁকে বলা হয় সদাশিব। যাতে উৎপত্তি তাতেই নিবৃত্তি, তাতেই হয় জড়-শক্তির অভ্যুদয় ও অপচয়। তাত হ'ল সন্ন্যাসীর সেই পর্ণকুটীর রক্ষা পেল কিন্তু, সেই সন্ন্যাসী গেলেন কোথায়? এই প্রশ্নের কোন মীমাংসায় না আসতে পেরে সুরেন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পেলেন। পথ ঘুরে গেল, সন্ন্যাসীর পর্ণকুটীরও দণ্ডায়মাণ রইল কিন্তু, সুরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর দর্শনে বঞ্চিত হ'লেন। বিফলতাই আনে সফলতা তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে। "কোথায় সেই সন্ন্যাসী? কাছে পেয়েও হারালাম।" তীব্র ব্যাকুলতার মধ্যদিয়ে অনেক কথাই তাঁর মনে এল এবং সরে গেল তথাপি তিনি পারলেন না মনোস্থির ক'রতে। বৈরাগ্যের ছাপ লেগে গেল তাঁর মনে, অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বৈরাগী সন্ন্যাসীর ক্ষণিক দর্শনে। দিন কতক পরে জরীপের কাজ শেষ হ'য়ে গেল এবং সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এলেন।

আজব সহর ক'লকাতা। জ্ঞানী, মানী, ধনী, দানী, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানে যেমন প্রোজ্জ্বল তেমনি আবার অন্যদিকে গুণ্ডা, বদ্‌মায়েস, চোর, জুয়াচোর ও গাঁটকাটায় কু-খ্যাত। ধর্ম্ম-কর্ম্ম চলে এখানে গঙ্গার জোয়ারের মত আবার যখন পড়ে অধর্ম্মের ভাঁটা তখন সব ধর্ম্ম চাপা পড়ে নরম পলিমাটিতে। হাসি কান্নায় ভরা এ সহর জাঁক-জমকে ধনীর কদর। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পীচের চওড়া রাস্তা, দু-সারি সৌধ চূড়া, গ্যাসের আলোকে নিশায় দিন। স্বপ্নে গড়া এ সহর, যান-বাহন ও কোলাহল পূর্ণ। কর্ম্ম চঞ্চল এই সহরে প'ড়ে আছে কত অভাগা ফুট পাথের ধারে জীর্ণ মলিন কানি প'রে অর্দ্ধমৃত প্রায় চারটি অন্নের জন্যে। কেউ কাউকে চেনেনা হলেও পাশের বাড়ীর লোক। যে যার তালে চলে তাল দিয়ে তালিম পেলে। যাচ্ছে আসছে কত গাড়ী ও জুড়ি ধব্ ধব্, গব্ গব্ শব্দ করে ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীর পাশ দিয়ে। থিয়েটারে ও পার্কে দেখতে পাওয়া যায় নানা রকম সাজসজ্জা অর্থের গরব মাখা। অদৃষ্টের কি পরিহাস আর এক দিকে দেখতে পাওয়া যায় অনাহার ক্লিষ্ট আশ্রয়হীন শত শত নরনারী পড়ে আছে দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা স্তূপে। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল, বিধির বিধান, অদৃষ্টের ফের তাদের আমরা দিই দোহাই, পাছে কিছু ভোগের ভাগ দিতে হয়। কারো দুটি অন্ন জোটেনা আবার কারো অরুচি হয় দই, রাবড়ী, সন্দেশে। মানুষ হয়ে মানুষকে কেউ পুষতে চায় না, তাই তারা পোষে বিলাতি কুকুর মোটা টাকা ব্যয় করে। প্রগতি যুগে নাই পুরাতনের সমাদর আছে নকল করা নতুনের কদর। পটীর উপর পটী, ধনী ব্যবসায়ীর গদি। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে দোকান-পশারী, রং-বে-রংয়ের আলো বিজ্ঞাপনে রকমারী, শীঘ্র আসুন দেরী করবেন না, ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না।

সন্ধ্যা এল অফিসের ছুটী হল। ফিরছেন বাড়ী শ্রান্ত সুরেন্দ্রনাথ, লাল দীঘির ধার দিয়ে ডালহৌসি হতে। লাল দীঘির জল কিন্তু, লাল নয় নীলেই সীমাবদ্ধ, তবুও নাম হয়েছে লাল দীঘি। জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে বহু নর নারী হোলি উৎসবে লাল রং মেখে ঐ দীঘিতে স্নান করতো বলে জল লাল হয়ে যেতো তাই লালদীঘি নাম হয়েছে। অনেকের ধারণা লাল শালু বা লাল পদ্ম ঐ দীঘিতে ফুটতো বলে লালদীঘি নাম হয়েছে। জানিনা, লালমুখো সাহেবরা আশে পাশে বাস করতো বলে লালদীঘি নাম হয়েছে কিনা? লালদীঘি পার হয়ে যখন সুরেন্দ্রনাথ ফুটপাথের উপর দিয়ে ফিরছেন

সেই সময় এক পাকা গাঁট্‌ কাটা হাত সাফাই করে তাঁর পকেট হতে তুলে নিল সোনার ঘড়ি ও চেন নিঃসাড়ে। যার জিনিষ এই ভাবে যায় সে তখন বোকা আখ্যা পায়। সুরেন্দ্রনাথ যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী পকেটে ঘড়ি না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ঘড়ি কোথা"? বিস্ময়ে পকেট লক্ষ্য করে সুরেন্দ্রনাথ বল্লেন 'যা,—পকেটমারে পকেট কেটেছে। আমি একটুও টের পাইনি"। এই অজুহাতে পতি ও পত্নীর মধ্যে চল্‌লো বচসা কিছুক্ষণ। পত্নীর কটু কথায় সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব লুপ্ত বৈরাগ্য ফুটে উঠলো এবং সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা এল। কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই রাত্রেই তিনি গৃহত্যাগ করলেন। বিতৃষ্ণা হতেই উদয় হয় বৈরাগ্য। অলীক মায়ায় গড়া এ সংসারে কেউ কারো নয়, সবাই স্বার্থের দাস। জ্ঞানী অবতার শঙ্করাচার্য্য তাই বলেছেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।"

স্ত্রী এবং একমাত্র বালিকা কন্যাকে ত্যাগ করে যখন তিনি মাদ্রাজ পার হয়ে গাত্বুর ষ্টেশনে পৌছলেন তখন তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সাময়িক উত্তেজনার বশে গৃহত্যাগ করে তিনি যে ভুল করেছেন তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন। নিরিবিলির শান্ত পরিবেশে মনোস্থির করবার জন্যে তিনি গাত্বুর ষ্টেশন হতে মিটারগেজ লাইনে টেরাপট্টি নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। সেখান হতে পূর্ব্বদিকে পদব্রজে ৭টি পাহাড় অতিক্রম করে তিরুমাল্লাই নামক পাহাড়ের উপর অবস্থিত শ্রীশ্রী বেঙ্কটেশ্বর বা শ্রীশ্রী বালাজীর মন্দিরে উপস্থিত হলেন। প্রায় ১৬ মাইল নামাই ও চড়াই পথ অতিক্রমে তিনি শ্রান্ত হলেও নির্জ্জন নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় তাঁর মানসিক উদ্বেগ প্রশমিত হল। দৈবক্রমে পূর্ব্ব পরিচিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অন্তর্যামী সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের উদাস ভাব দেখে বল্লেন; "গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিজনদের সেবা করা। তোমার পত্নী ও কন্যা কান্নাকাটি করছে, তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও। সময়ে যে কোন তীর্থস্থানে তোমার সঙ্গে আমার পুনরায় দেখা হবে।" সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরে এলেন।

কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হল। তাঁর একমাত্র কন্যার বয়স তখন মাত্র আট নয় বৎসর। বৈরাগ্যের ছাপ মনে লাগলেও তিনি কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গৃহে অবস্থান করতে বাধ্য হন। কন্যা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও সেই যুগে গৌরীদান করবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। "দৈবের লিখন কে করে খণ্ডন।" সৎপাত্র পাওয়া গেল

এবং বিবাহের দিনও ধার্য্য হল। কন্যাকে সৎপাত্রের করে সম্প্রদানকরে সুরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করবেন এই ছিল তাঁর মনোবাসনা। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস, ঠিক বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যাটি ওলা-উঠা রোগে মারা গেল। বিবাহের জন্য যে সব নতুন গহনা তৈয়ারী করান হয়েছিল, সেই সব গহনায় মৃতা কন্যাকে সজ্জিত করে শ্মশানে দাহ করা হয়। দেহ ভস্ম হবার পর শ্মশানবাসী দরিদ্রেরা গহনাগুলি গ্রহণ করে। স্ত্রী গেল একমাত্র কন্যাও ইহলোক ত্যাগ করলো এরূপ অবস্থায় বেঁচে থাকাই যেন মহাপাপ। এই মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক আঘাতে সুরেন্দ্রনাথ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। সদাই তাঁর মনে উদাস ভাব, আহারে-বিহারে-নিদ্রায় কিছুতেই শান্তি নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই তাঁর লোপ পাচ্ছে এবং শরীরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পৌষ সংক্রান্তির দিন বৌদির কাছে পিঠে খাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। বৌদি নানারকম পিঠে তৈয়ারী করে দেবরকে সযতনে ভক্ষণ করালেন। দেবরের উদাসভাব প্রশমন হয়েছে ভেবে বৌদি তাঁকে পুনরায় বিবাহ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু কিছুই কার্য্যকরী হল না। পাছে সুরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করেন এই ভাবনায় তাঁর দাদা, পুনরায় কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ দেবার জন্যে পাত্রী দেখতে লাগলেন। একটি সৎবংশের সুশ্রী পাত্রী পাওয়া গিয়েছে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের পছন্দও হয়েছে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পছন্দের জন্য তিনি এক কপি ফটোও এনেছেন, যদি সুরেন্দ্রনাথের ফটো দেখে পছন্দ হয় তাহলে শীঘ্রই বিবাহ দিন স্থির হবে। রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ যখন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন সেই সময় তাঁর বৌদি ঘরে প্রবেশ করে টেবিলের উপর ফটোটি রেখে বল্লেন, "ঠাকুরপো। তোমার দাদা এই কন্যাকে পছন্দ করেছে টেবিলে ফটো রইলো, তোমার পছন্দ হয় কিনা কাল সকালে বলো।" বৌদি ঘরের বাহিরে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ ফটোটি দেখে আপন মনে বল্লেন, "মা, আর মায়ায় জড়িয়ো না, আশীষ দাও মা, যাতে এই মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারি।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল। গভীর রাতে তিনি এক কাপড়ে গৃহত্যাগ করলেন। কোথা তিনি যাবেন তার নেই কোন ঠিক ঠিকানা। যে দিকে দু-চক্ষু যায় সেই দিকে চলেছেন তিনি তীব্র বৈরাগ্য আকর্ষণে। চঞ্চল সহরের কোলাহল পূর্ণ আবহাওয়া অতিক্রম করে তিনি উপস্থিত হলেন আদিগঙ্গার তীরে। কলির কলুষ ভারে আজ আদি-গঙ্গা অকাল বার্দ্ধক্যে ক্ষীণা ও কাতরা হয়েছেন। এই আদিগঙ্গা এখন

টালিশনালা নামে বিকৃতা ও পরিচিতা বিজাতীয়-বিধর্ম্মীয় ঐতিহাসিক বিচারে। কি জানি, আদি যুগে হয়তো ক্ষীণা এই আদিগঙ্গা ছিলেন প্রখরা প্রবলা ও ভীষণা। কালস্রোতে যেমন পড়ে পলিমাটি নদীতে, তেমনি পড়ে মানুষের মনে-প্রাণে ও বিচারে বুদ্ধিতে। গেরুয়া ধারিণী মায়ের পবিত্র জলে হাত মুখ ধুয়ে সুরেন্দ্রনাথ কালী মায়ের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। কত কথাই তাঁর মনে উদয় হ'ল আলোক ছায়ার পট পরিবর্ত্তনের মত। চিত্তরূপ স্বচ্ছ পর্দ্দার উপর ভেসে উঠলো পিতা-মাতার স্নেহ-আদর, পত্নীর ভালবাসা এবং কন্যার আব্দার। সুষুপ্ত রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সতীদেবীর শবরূপ দেহ মন্দির নির্ব্বাক-নিস্পন্দ, গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মানা রয়েছেন, সাক্ষী স্বরূপে। সবারই লয় আছে কিন্তু, নেই আঁধারে বিলুপ্ত, আলোকে চাক-চিক্য, মন্দিরা-ভ্যন্তরে সৎ'এর তেজ সতীদেবীর। তিনি সদাই নিত্যা, স্নেহ ও বাৎসল্যে বিগলিতা। তাঁর রূপের নাই অন্ত তাই অরূপা নিরাকারা। দয়া তাঁর ধর্ম্ম, তাই তিনি চার হাতে দেন ভক্ত সন্তানকে, ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধকের মনোবিকারে মায়ের রূপ ও আকৃতি পরিস্ফুট হয় আধার অনুযায়ী কৃষ্ণ—পীত, শ্বেত, লোহিত, শ্যাম, শান্ত ও বিভৎস। সন্তানের দাবী ও মাতার স্নেহ ঔদার্য্যে মণ্ডিত, সেখানে নাই একটুও স্থান আকার বিকারে, রূপ সৌন্দর্য্যের ভেদবুদ্ধি।

অন্ধকারে নাট মন্দিরের অভ্যন্তরে এককোণে ব'সে শোকার্ত্ত চিত্তে লক্ষ্য করছেন সুরেন্দ্রনাথ মায়ের মন্দির। করুণ সুরে কে যেন ডাকলো, "সুরেন"। মা-মা, বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি বিস্ময়ে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে, বিদায়ের এ কাতরোক্তি কার? হঠাৎ তাঁর মনে ফুটে উঠলো বিদায় কালীন স্ত্রীর মলিন মুখ। দুটি হাত ধরে তিনি বলে গিয়েছিলেন, "ওগো, আমি চল্লাম, মেয়েটাকে দেখো, যেন কখন অযত্ন ক'রো না।" মেয়ে, কার মেয়ে আমার? না-না, আমার নয়, আমার হলে কখনই সে আমায় ছেড়ে চলে যেতো না। ঐতো, কে যেন আধ আধ স্বরে বাবা, ব'লে ডেকে ছুটে পালাল। আমায় দেখে ভয় পেয়ে পালাল। মা-মা। একবার ছুটে বুকে আয়! বুকে তুলে কত আদর করেছি, কত স্নেহ চুম্বন দিয়েছি তবুও ভয়ে পালাল। আমি কি ভুল দেখলাম? হ্যাঁ তাই হবে। সব বাজে, সব মিথ্যে। আমি পিতা নয়, আমার কেউ নেই; শ্মশানের বুকে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার মধ্যে আমি ব'সে আছি। চুপ ক'রে ব'সে স্নেহ, ভালবাসা ও মমতার পরিণাম দেখছি,—হা-হা-হা। এই সংসার—মায়ায় গড়া জাঁক-জমকের সংসার। পতঙ্গের

ক্ষণিক আনন্দ, দীপ্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় থাকে যৎসামান্য ভস্ম কাল অবদানে। সব শ্মশান; শ্মশান ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না। প্রভাত হ'ল রক্তবর্ণে উঠলো তপন শ্মশানের প্রতীক নিয়ে। ডাকছে পাখী আনন্দে বিভোর হ'য়ে, ডাকছো ডাক কিন্তু মনে রেখো তোমার ও করুণ মিষ্টস্বরে ঐ অগ্নিপিণ্ড তপন ক্ষমা ক'রবে না তোমার ঐ দু-দিনের ফুড়ুক ফুড়ুক আনন্দ একদিন সে তার প্রখর তেজে খাক্ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। এই বিরাট শ্মশানে নেই যুগল মিলনের ভালবাসা, কর্ত্তব্যের নিষ্ঠা, প্রেমের উচ্ছ্বাস, স্নেহের নবনী, বাৎসল্যের মমতা, জাঁক-জমকের গরব, অহংকারের রাজ অট্টালিকা, বিদ্যা-বুদ্ধি, মান, অপমান, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছুই নেই। নেই সেথা কৃপা, দরদ, অনুরাগ, বিরাগ, আমি—আমার ভাবনা। শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, তীব্র ক্ষুধা তার, সব খেয়েও তার ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই—হা-হা-হা।

ভোরের আলোয় যাত্রীর ভীড়ে নাট মন্দির ভ'রে গেল, মায়ের মন্দির খোলা হ'ল। ধূপ-ধূনা ও পুষ্প নিয়ে পুরোহিতরা মায়ের পূজায় ব্যস্ত হ'লেন। পূজা অর্থে জীবন ধারাকে পূত করাই হ'ল পূজা করা।

তোমার পূজা তুমি কর মা
আমি ডাকি মা-মা ব'লে।
পূজা—হোম—সাধন—ভজন
জানিনা মা ধ্যান ধারণ
তন্ত্র মন্ত্র শিবের বাণী
বুঝিনা মা, ও তারিণী
জানি শুধু মা-মা ধ্বনি
তুমি মা আমি ছেলে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম তত্ত্ব কথা
মনে লাগে প্রাণে ব্যথা
যার মা বিশ্ব জননী
লীলাময়ি কাল হরণী
কেমনে করি তাঁর পূজা
আমি যে সদা দেউলে।
আমি—আমার কিছু নাই
ডাকি তাই মা-মা সদাই
পূজা-জপ মা-মা ধ্বনি

সম্বল মোর এই জানি
সাধন—ভজন—জপ—যজ্ঞ
জানিনা ওসব আমি অজ্ঞ
(তাই) তোমার পূজা তুমি করমা
এ অধমে নাহি হেলে ॥

ঢাক-ঢোল-কাঁসর ও ঘণ্টার গুরু গম্ভীর শব্দ ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি,

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

ক্রমশঃ বেলা বাড়তে লাগলো, মায়ের নিত্য পূজা শেষ ক'রে পুরোহিতরা যাত্রীদের পূজায় ব্যস্ত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন নাটমন্দিরের এক কোণে চুপ করে ব'সে আছেন। তিনি কোথায় যাবেন; কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে শুধু হতাশভরে মায়ের দিকে তাকাচ্ছেন, দেখলে মনে হয় যেন তিনি মায়ের কাছে নির্দ্দেশ চাইছেন। দুপুর বেলা, মায়ের ভোগ নিবেদন হ'য়ে গেল। মার্ত্তণ্ডদেব গাঢ় পীত বর্ণে মাথার উপর উদিত হ'য়ে প্রখর তেজে দশদিক আলোকিত করলেন। সূর্য্যের এই অবস্থানেই প্রকাশ পেয়েছেন ভগবতী দুর্গা। দশদিক হতে মহামায়ার দশভুজা কল্পিত হয়েছে। উষাকাল কার্ত্তিক—বড়যোদ্ধা তিনি অজ্ঞানরূপ আঁধার নাশ করেন। সু-প্রভাত দেবী সরস্বতী, অস্তমিত তপন লক্ষ্মীদেবী এবং অস্তমিত তপনের শ্বেতবর্ণ একটি রশ্মি গণেশের শুণ্ড ও বাকী লোহিতবর্ণ অংশ তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং উদর সুচনা ক'রে।

কত দেশ বিদেশের ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারীর সমাগম হয়েছে মায়ের আঙ্গিনায় এই কালিঘাটে। কেউ মা মা বলে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে আবার কেউ মায়ের পূজা দিয়ে আনন্দে প্রসাদ সেবা করছে। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুধার্ত্ত হয়েছেন কিন্তু, তাঁর কাছে নেই একটিও পয়সা যে কিছু কিনে খাবেন। "জীব দিয়েছেন যিনি, অন্ন দেবেন তিনি।" এই মর্ম্ম আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। এরূপ অবস্থায় কারোর কাছে প্রসাদ চেয়ে খাওয়া বিবেক বিরুদ্ধ এবং আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভে বিঘ্নকর। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেরও ক্ষুধা—তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ক্ষুধা তৃষ্ণাকে জয় করবার জন্যে তিনি মহামায়া মাকে স্মরণ

করতে লাগলেন। হঠাৎ একটি ছোট কুমারী কন্যা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে আধ আধ স্বরে বল্লে, "তুমি বোধ হয় মায়ের প্রসাদ খাওনি, তাই তোমার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি একটু ব'সো, আমি মায়ের কাছ হতে প্রসাদ এনে দিচ্ছি।" ছুটে সে চলে গেল মায়ের কাছে নাট মন্দিরের অন্তপ্রান্তে। ক্ষণেক পরে নিয়ে এল সেই কুমারী এক ঠোঙ্গা ফল ও মিষ্টি। সুরেন্দ্রনাথের হাতে প্রসাদ দিয়ে সে বল্লে, "এই নাও প্রসাদ খাও।" সুরেন্দ্রনাথের আহার শেষ হ'লে সে আনন্দ সহকারে দ্রুত চলে গেল তার মায়ের কাছে। মহামায়া মা যে, কত না-রূপে, কত ভাবে, ভক্তদের কৃপা করেন তা প্রকাশ করা যায় না।"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।" "এই কুমারী কন্যার এত দরদ কেন? একি আমার সেই হারানো কন্যা? পিতার দুঃখে কাতর হ'য়ে সেকি ফিরে এলো কোন্ অজানা দেশ হতে? তাই বোধ হয় হবে।" শোকের বারি ঝরে পড়লো সুরেন্দ্রনাথের দু-চক্ষু হতে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি বল্লেন, "আবার মায়া? কিছু নেই সবই মিথ্যে, শূন্য এই ব্রহ্মাণ্ড সব শ্মশান। দ্রুত আঙ্গিনা ত্যাগ করে তিনি অগ্রসর হলেন হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে। ষ্টেশনে পৌঁছে তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলেন। গাড়ী ছাড়লো কিন্তু, কোথা যাবেন তা তিনি নিজেই জানেন না। চললো গাড়ী সারা রাত্র ঢিকোতে ঢিকোতে। পরদিন প্রভাতে যখন গাড়ী রাজমহন্দ্রী ষ্টেশনে পৌঁছলো তখন তিনি কার টানে, কোন্ অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে গাড়ী হতে নেমে সিধে গোদাবরী নদী তটে অগ্রসর হলেন। সাক্ষী স্বরূপ এই সেই গোদাবরী নদী এখনও রয়েছে প্রবাহমানা।

অতীত স্মৃতি জাগে মনে দুখিনী সীতা দেবীর কথা। পঞ্চবটি বন হতে অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন তিনি লঙ্কাধিপতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস ছলনাময় রাবণের দ্বারা। দেবী সীতা জ্যোতির্ম্ময়ি সতীদেবী, দেহাভ্যন্তরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রিতা অবস্থাই হ'ল অপহৃতা সীতা। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ও জীবাত্মার বারবার সংযোজনই হল রমণ বা শ্রীরামচন্দ্র। ধৈর্য্য অবলম্বনই হল লক্ষ্মণ। যে শাস্ত্রের দ্বারা বাহ্যিক রমণকে অয়ন (আভ্যন্তরীন) করা যায় তাকেই রামায়ণ বলা হয়।

ভীতি জনক পঞ্চবটি বন ও গোদাবরী নদীকে দর্শন করে সুরেন্দ্রনাথের উদাসী মন আরও উদাস হয়ে গেল। শোকসন্তপ্তা ভীতা সীতা দেবীর করুণ আর্ত্তনাদে এখনও পঞ্চবটি বিচলিতা। ঐ কানে বাজে সীতাদেবীর

করুণ স্বর, জটায়ুর দীর্ঘশ্বাস, রামচন্দ্রের হাহুতাশ এবং লক্ষ্মণের আক্ষেপ। এখন রয়েছে মণ্ডিত আকাশে-বাতাসে, প্রতি বৃক্ষ-লতা-গুল্মে গোদাবরী তটে এই পঞ্চবটি বনে। তাই গেয়েছেন কবি কৃত্তিবাস সজল নয়নে :—

"অগস্ত্য বলেন, রাম শুনহ বচন।
যে স্থানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভুবন॥
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য আয়তন।
পঞ্চবটি গিয়া তথা থাক তিনজন॥

প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর॥"

অগস্ত্য মুনির নির্দ্দেশ মত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে গরুড় নন্দন পক্ষীরাজ জটায়ুর সাহায্যে সুখে বাস ক'রতে লাগলেন। নিকটে দণ্ডকারণ্যে রাবণের দুই ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং আদরিণী ভগ্নী সুর্পনখা বাস ক'রতো। রামচন্দ্রের দিব্যকান্তিময় রূপ দেখে সুর্পনখা রামচন্দ্রকে বিবাহ করতে চায়। একদিন সে, পরমাসুন্দরী মায়ারূপ ধরে রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। আত্মারাম শ্রীরামচন্দ্র সুর্পনখার জঘন্য প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিমুখ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়াবিনী সুর্পনখা ভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করে সীতা দেবীকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। শ্রীরামের আদেশে লক্ষ্মণ সুর্পনখার প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। তীরের আঘাতে রাক্ষসীর নাক ও দুই কান ছিন্নভিন্ন হয়। রক্তাক্ত কলেবরে রাক্ষসী দণ্ডকারণ্যে খর ও দূষণ দুই ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হয়ে শ্রীরামের স্পর্দ্ধার কথা ব্যক্ত করে। লাঞ্ছিতা ভগ্নীর রক্তাক্ত কলেবর দেখে খর ও দূষণ দুই ভ্রাতা চৌদ্দ হাজার দানব দৈত্য সেনা নিয়ে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করলে। শ্রীরামচন্দ্র একাই যুদ্ধে তাদের নিহত করলেন। রাক্ষসদের নিধন দেখে সুর্পনখা লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণের কাছে করুণ কাহিনী অশ্রুজলে নিবেদন করলো। রাক্ষস রাবণ উত্তেজিত হয়ে নিশাচর মারীচের সাহায্য লাভ করবার জন্যে বালখিল্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল। রাবণের উদ্দেশ্য ছিল সীতাদেবীকে ছলে বলে অথবা কৌশলে হরণ করা। তপঃপ্রভায় প্রভাবান্বিত নিশাচর সেই সময় তপস্যায় রত। রাবণ তার তপস্যা ভেঙ্গে দিয়ে সীতাদেবীকে হরণ

করবার জন্যে সাহায্য চাইলে। এই কুকাজে মারীচ অনিচ্ছা সত্বেও রাবণের প্রতাপে ভীত হয়ে মায়ামৃগরূপ ধারণ করতে বাধ্য হল। এই মায়া মৃগের লোভ দেখিয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বঞ্চিত করে রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেছিল। রাবণ যখন বল পূর্ব্বক সীতাদেবীকে শূন্যে তুলে নিয়ে যায় সেই সময় তাঁর আর্ত্তনাদ শুনে বৃদ্ধ জটায়ু পক্ষী শূন্যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধরাতলে পতিত হয়। করুণ এ কাহিনী; সীতাদেবীর আর্ত্তনাদ, জটায়ুর শেষ দীর্ঘশ্বাস, সূর্পনখার জীঘাংসা প্রবৃত্তি, রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের আক্ষেপ, রাবণের উল্লাস এখন রয়েছে নিহিত, জলে, স্থলে, শূন্যে, বনে উপবনে প্রতি ধূলিকণায়, পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত এই দণ্ডকারণ্যে।

শ্রীরামচন্দ্রের চরম ত্যাগ, অনুজ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, সীতাদেবীর পতিভক্তি এবং জটায়ুর আত্মত্যাগের বিষয় চিন্তা করতে করতে যখন সুরেন্দ্রনাথ গোদাবরী তটে উপস্থিত হ'লেন তখন ভাগ্যবশতঃ সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। চেলা হবার মানসে সুরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর পদ যুগল স্পর্শ করে প্রার্থনা জানালেন, "প্রভু! আমাকে আপনার চেলা করে নিন।" তাঁর প্রার্থনায় বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী বল্লেন, "কোন্ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হ্যায় জগৎ মে? তন মন ধনসে পরোপকার। চেলা হবার পূর্ব্বে আতুর দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের সেবা করা চাই।"

"স্বর্গাস্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে
দান প্রসঙ্গো মধুরাচ বাণী দেবার্চ্চনা চাতিথি পূজনঞ্চ"॥

দান, মিষ্টবাক্য, দেবতার অর্চ্চনা এবং অতিথি সেবাই স্বর্গলাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসে ফুটপাত ও বস্তি হতে দুস্থ রোগীদের মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজে সেবা ক'রতে লাগলেন। হাঁসপাতালে রাত্রে রোগীর ঘরে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। চিফ্ নার্সের বিবাহ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যৎ বাণী দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল বলে একমাত্র তিনিই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। চিফ নার্সের বিবাহ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী মিলে যাবার পর পাছে তাঁকে লোকে বিরক্ত করে সেই কারণে তিনি ক'লকাতা ত্যাগ করে হাওড়ায় অবস্থান করেন। দৈবের কি লিখন, হঠাৎ অর্থের অভাব হেতু সেবাকার্য্যে ব্যাঘাত পড়লো, তিনি এখন কি করবেন জানবার জন্যে ভাবীগুরুর কাছে পত্র লিখলেন, কয়েকদিন পরে উত্তর এল, "দিন মজুরের কাজ করে অর্থ উপার্জ্জন কর। ভাবী গুরুর নির্দ্দেশ মত তিনি হাওড়ায় এক

জুটমিলে কুলির কাজে নিযুক্ত হলেন। মান-অপমান দুই-ই সমান এই ভাব পোষণ করে তিনি আনন্দ সহকারে গুরুর আদেশ পালন করতে লাগলেন।

"মানাপমানয়োস্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে"॥ (শ্রীমদ্ভগবদ গীতা)

যে ব্যক্তি মান-অপমানকে সমভাবে বুঝিয়া থাকেন যিনি মিত্র ও শত্রু পক্ষে সমান, যিনি সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ তিনিই মহাপুরুষ।

সুরেন্দ্রনাথের মনে একটুও অভিমান ছিল না। অভিমানই হল জীবের একমাত্র বন্ধন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি যা রোজগার করতেন তার সামান্য অংশ নিজের ভরণ পোষণের জন্যে রেখে বাকী অংশ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় করতেন। ভগবান যে কাকে কি অবস্থায় ফেলেন তা কল্পনাতীত। আমি আমার বলে যতই বড়াই করি না কেন, তবু তাঁর ইচ্ছাতেই কর্ম্ম-ইচ্ছা ও জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত। আশা-ভরসা, অদৃষ্ট পুরুষাকার এ সবই একেরই ইচ্ছায় লীলায়িত। আদি হ'তে অনন্ত শক্তির যে বিকাশ সে শক্তিও আদিরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

হাওড়া জুটমিলের ডাক্তার (এস, এ, এস,) সম্প্রতি তাঁর পত্নী অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পাছে বংশ নাশ হয় সেই ভয়ে তাঁর বৃদ্ধা মাতা পুত্রকে আদর করে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, "বাবা! আমার বয়স অনেক হ'য়েছে, মৃত্যু হ'লে কে তোমায় ভাত জল দেবে তাই আবার বিয়ে কর।" ডাক্তারের কোয়ার্টার গঙ্গার তীরে। গৃহলক্ষ্মী না থাকলে যেমন গৃহে শ্রী থাকেনা তেমনি আবার সন্তান-সন্ততি না থাকলে গৃহ মানায় না। দুপুর বেলা তাপের দিন, মাতা যখন শিক্ষিত পুত্রকে আদর ক'রে বারেবার ঐ একই কথা উচ্চারণ ক'রছেন, পুত্রও ঐ কথার উত্তর দিচ্ছেন রূঢ় ভাষায় "না, কিছুতেই নয়," পুত্রের এই ভাষা শুনে বৃদ্ধা মাতা কুপিতা হ'য়ে তিরস্কার ক'রে বল্লেন, "তবে যা ভাল বোঝ তাই কর।" যে সময়ে মাতা ও পুত্রে বাত-বিতণ্ডা চলে সেই সময়ে ঐ পথে কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে ডেকে বল্লেন, "ডাক্তারবাবু, মায়ের সঙ্গে আপনি যতই তর্ক-বিতর্ক করুন না কেন, অমুক মাসে, অমুক তারিখে আপনি বিবাহ ক'রতে বাধ্য হবেন।" এক অধস্তন দিন মজুরের মুখে এই বাণী শুনে ডাক্তার বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "তোমার কথা আমি ডায়েরীতে লিখে রাখছি, পরে দেখা

যাবে তুমি কত বড় ভবিষ্যৎ বেত্তা হয়েছো। মনে রেখো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো।” মৃদু হেসে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গাস্নানে গেলেন। কিছুদিন পরে এক স্বজাতীর বাড়ী ডাক্তার বাবু বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে গেলেন। ঠিক সময়েই বরপক্ষ বর নিয়ে কন্যার বাড়ী উপস্থিত হ'লেন। বিবাহ লগ্নের কিছু পূর্ব্বে, দেনা-পাওনা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয় এবং বরপক্ষ উত্তেজিত হ'য়ে বিবাহ নাকচ ক'রে দিয়ে, বরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাৎ হ'ল। কন্যার পিতা হায় হায় ক'রে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। যিনি কন্যার পিতা হয়েছেন, একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করেন, এদায় কত মর্ম্মান্তিক ও বিপজ্জনক।

ডাক্তার বি-পত্নীক হলেও উপযুক্ত পাত্র, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কন্যার পিতা এবং বন্ধু-বান্ধবেরা এই কন্যাকে বিবাহ করার জন্যে ডাক্তারকে ধরে প'ড়লেন। সবার অনুরোধ এড়াতে না পেরে ডাক্তার ঐ কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হলেন। একেই বলে “ন চ দৈবাৎ পরমবলম্।” এই নব দম্পতীর যুগল মিলনে সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। এ শক্তি তিনি কোথা হতে পেলেন? তিনি তো জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎবেত্তা নন। তাঁর তীব্র গুরু ভক্তিই এই শক্তির প্রধান উপাদান। ভাবি গুরুর অলৌকিক শক্তি অজ্ঞাতসারে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে বলেই সুরেন্দ্রনাথের বাণী ভবিষ্যতে সত্যে পরিণত হচ্ছে। উপযুক্ত আধারেই শক্তি প্রভাবান্বিত হয় মনঃ সংযমে। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রার বিকার ভাবই হ'ল পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম) পঞ্চভূতের পঞ্চ শক্তি আধার অনুযায়ী বিভিন্ন গুণ-সম্পন্না। ক্ষিতির উর্ব্বরতা, অপের আর্দ্রতা, তেজের দাহিকা, মরুতের স্পর্শ, এবং ব্যোমের শব্দশক্তি। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ে অধিষ্ঠিতা মূলতঃ আদ্যাশক্তিই নানা ভাবে বিরাজিতা। ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি পঞ্চভাবে প্রকাশমানা পরা, অপরা, মহামায়া, আদ্যা ও কুল-কুণ্ডলিনী। একই চৈতন্যে জগৎ চেতনাময়। জড়ে শক্তি অনুরুদ্ধ থাকে ব'লে জড় অচেতন পদার্থ।

মায়ের স্নেহ-বাৎসল্য যে কত মধুর ও পবিত্র, একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি সন্তানের মা হয়েছেন। রাত্রে ডাক্তার বাড়ী ফিরে না আসায় বৃদ্ধা মা সারারাত্র ছট্‌ফট ক'রছেন ও চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। কি মধুর ও পবিত্র এ সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধের কাছে অন্য সম্পর্ক অতি তুচ্ছ ও অলীক। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ স্নেহ অবদানে সুধা ক্ষরে মা বুলি উচ্চারণে। জননী

এবং জন্মভূমি তত্ত্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন বলেই সনাতন আর্য-ঋষিরা মুক্তকণ্ঠে গেয়েছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

নব পরিণীতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন প্রভাতে যখন ডাক্তার কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন সবাই আশ্চর্যান্বিত হ'লেন। রহস্যাবৃত এই যুগল মিলন, একমাত্র দৈবের লিখন। নবাগতা পুত্রবধূকে সাদরে ঘরে তুলে নিলেন বৃদ্ধা জননী স্নেহ-পরবশে। বিবাহের আচার মিটে যাবার পর ডাক্তার, সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-বাণী বড় সাহেবকে জানালেন। বড় সাহেব অবিবাহিত, বিলাতে এক পাত্রীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব, পাত্রীর পিতার সঙ্গে পত্র বিনিময় চলছে। ঐ পাত্রীর সঙ্গে বড় সাহেবের বিবাহ হবে কিনা, জানবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথের ডাক পড়লো। বড় সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে সুরেন্দ্রনাথ খুবই অস্বস্তিবোধ ক'রতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ভাবি-গুরুকে স্মরণ ক'রে তিনি বড় সাহেবের বিবাহের দিন, তারিখ ও মাস ব'লে দিলেন। কিছুকাল পরে পাত্রীর পিতা বিবাহের দিন; তারিখ ধার্য্য ক'রে বড় সাহেবকে পত্র দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের দিন তারিখের সঙ্গে হুবহু মিল দেখে বড় সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। এক সপ্তাহের মধ্যে বড় সাহেব বিলাত যাত্রা ক'রলেন। কিছুকাল পরে বিবাহ ক'রে বড় সাহেব বিলাত হ'তে ফিরে এসে আরও কিছু জানবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে ডাকতে পাঠালেন কিন্তু. সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন ব'লে সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল না। গঙ্গাস্নান ক'রে যখন সুরেন্দ্রনাথ তীরে উঠলেন সেই সময় সহসা ভাবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। ভাবিগুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে যখন সুরেন্দ্রনাথ করযোড়ে দণ্ডায়মান হলেন সেই সময় ভাবিগুরু তাঁকে বল্লেন, "আর তোমায় একাজ ক'রতে হবে না। এখন আমার সঙ্গে চল।" সুরেন্দ্রনাথ আর জুটমিলে প্রবেশ না ক'রে একই কাপড়ে ভাবিগুরুর সঙ্গে হাওড়া ত্যাগ ক'রলেন। বড় সাহেবের বাসনা পূর্ণ হ'ল না, আর কোনদিন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল না।

বিজন বন, শাল-সেগুন ও তরুতলায় আচ্ছাদন। বন্ধুর সে আঁকা-বাঁকা পথ, ব্যাঘ্র ও অজগরের নিরাপদ আবাসস্থল এই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য। অপরাহ্ন কাল, উত্তপ্ত বায়ুর স্পর্শে তরু-লতার কোমল পত্র নমিত। সুরেন্দ্রনাথ শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছেন। অজানা পথের কাছে নাই নদী-নালা বা ঝরণা। গাছে ফল-ফুল তাও নাই। ক্রমাগত পথ চলনে সুরেন্দ্রনাথের দেহ অবশ হ'য়ে এল। গাছের ফাঁকে দৃষ্টি পথে নাই গ্রামের নিশানা, শুধু ঘন বন ও উপবন। সহসা গুরু শুষ্ক কণ্ঠে বল্লেন, "সুরেন! বড় শ্রান্ত এইখানে একটু বিশ্রাম করি।" একটি পাথরের উপর গুরু আসন স্থাপন ক'রলেন শিষ্য নিয়ে উপবেশন ক'রলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে সম্বোধন ক'রে তিনি বল্লেন, "খিদেও পেয়েছে পিপাসাও লেগেছে; কি করি বলতো সুরেন।" দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে শিষ্য উত্তর দিলেন, "ফল-জল এখানে কিছুই নেই, শুধু বন আর জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই।" শিষ্যের করুণ বাণী শুনে স্মিত হাস্যে বল্লেন তিনি শিষ্যকে, "এক কাজ কর সুরেন, যে পাথরটায় তুমি বসে আছ ওটা সরিয়ে দেখতো কিছু পাওয়া যায় কিনা?" শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ মত সুরেন্দ্রনাথ পাথর সরালেন; কি আশ্চর্য্য পাওয়া গেল একটি শাঁখালুর ন্যায় মূল। সেটি উত্তোলন ক'রে তিনি শ্রীগুরুকে দেখিয়ে বল্লেন, "বাবা পেয়েছি এই মূল।" মূলটি দেখে আগ্রহ-সহকারে বল্লেন গুরু শিষ্যকে, "বেশ-বেশ, ওটাকে পুড়িয়ে মাখ।" শুকনো পাতা জড় ক'রে সুরেন্দ্রনাথ মূলটি পুড়িয়ে মাখলেন,—মাখমের মত নরম, বর্ণ পাংশু। একটি পরিষ্কার পাতায় মাখা মূল রেখে শ্রীগুরুর সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন শিষ্য, "বাবা সেবা করুন।" "শিবোহম্-শিবোহম্" উচ্চারণ করে, সামান্য একটু গ্রহণ ক'রে শিষ্যের হাতে দিয়ে গুরু বল্লেন, "সুরেন খাও।" সামান্য একটু প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব লোপ পেল। একি স্বর্গের সুধা? এমন সুতার তিনি তো কখন কোন ফল-মূলে পাননি। তাত হ'ল কিন্তু, সূর্য্য যে অস্ত গেল। গোধূলি বেলা, ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকার শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যময় ঐ নির্জ্জন স্থানে। দৃষ্টিপথে নাই কোন গ্রাম বা পল্লী। কিছুক্ষণ পরে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ার মত আবৃত হ'ল ঐ ভীতিজনক অরণ্য। আশে-পাশে ডাকছে শিবা ও ফেউ বিকট শব্দে, জানাচ্ছে হীংস্র জন্তুর আগমন। সুরেন্দ্রনাথের অতি নিকটে নড়ে উঠলো ঝোপ-ঝাড় অবিলম্বে, শুষ্ক পত্রের খস্-খস্ শব্দ কাণে এল সুরেন্দ্রনাথের।

ভয় ও ভাবনার সন্ধিক্ষণে তাঁর জীবন আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হ'ল. সব মায়া জয় করেও তিনি এখন সক্ষম হননি জীবনের মায়াকে জয় ক'রতে। আত্মভোলা গুরু স্বয়ং ভোলানাথ বেশ নিশ্চিন্তে ব'সে আছেন তরুমূলে। সন্ত্রস্ত শিষ্যের মনঃপ্রাণ যে, অসীম পারাবারে হাবু-ডুবু খাচ্ছে তাতে, অন্তর্যামী গুরু কি উদাসীন? না, তা নয়,—পরীক্ষা জন্ম হ'তে মৃত্যু অবধি চলে কেবলই পরীক্ষা। কালের নিয়মে পরীক্ষার ব্যতিক্রম নেই। জীব একটিতে উত্তীর্ণ হলেও আর একটিতে সম্মুখীন হয়। এইভাবে চলে পরীক্ষা একটির পর একটি ক্রমাগত যতকাল না জীব পরমাত্মায় লীন হয়। সর্ব্বদা ঘুরছে চক্রীর চক্র জন্ম-মৃত্যুর সংবিধানে। লীলাতত্ত্বে পরীক্ষার একমাত্র কারণই হ'ল অভিমান ও রিপু সম্ভোগ। দানব-দৈত্যের মত এদের কুটীল দংশন। রিপুর উদ্রেক বা উত্তেজনায় হয় ইন্দ্রিয় বিকারগ্রস্থ তাই আসে মনে লজ্জা-ঘৃণা-ভয়-শোক-তাপ ও ভাবনা। এ সবের মূল কারণই হ'ল ছায়ারূপ মায়া। রিপুজয়ী যাঁরা তাঁদের নেই এসব বালাই, তাই তাঁরা হন না দুঃখে কাতর বা সুখে অভিভূত।

নেমে এল গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে। যেন একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার ছুটে চলে গেল সুরেন্দ্রনাথের পাশ দিয়ে। ভয়ার্ত্ত সুরেন্দ্রনাথ সিটিয়ে উঠলেন। অদূরে তুলতে লাগলো ঝোপ-ঝাড় ফেউয়ের ফেউ ফেউ, চিৎকারে। এত যত্নে লালিত-পালিত দেহে কি শেষে অকালে হীংস্র জন্তুর কবলে খণ্ড-বিখণ্ড হবে? অকালে অপঘাতে আকস্মিক যদি যায় প্রাণ, তবে কে ক'রবে সাধন-ভজন, কি হবে প্রয়োজন ভগবানে। নানা চিন্তা আসে মনে মজ্জাগত মায়ার কারণে। মায়াকে যিনি মায়ে পরিণত ক'রতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর কাছে মৃত্যুভয় কিছুই নাই, সদাই আনন্দ খেলে তড়িতের ন্যায় মনে ও প্রাণে।

সহসা মৌন ভঙ্গ ক'রে শ্রীগুরু বল্লেন শিষ্যকে, "সুরেন। এই বনে বাঘ বাস করে। তুমি এক কাজ কর, বনের মধ্যে এগিয়ে যাও আশ্রয় পাবে।" শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ মত সন্ত্রস্ত শিষ্য বন মধ্যে অগ্রসর হ'লেন। সামান্য পথ অগ্রসর হতেই একটু ফাঁকা জায়গায় একটি ছোট্ট মেটেঘর তিনি দেখতে পেলেন। ঘরের সামনে মাটির দাওয়ায় ক্ষীণাপ্রভা প্রদীপের আলো দেখা গেল। হতাশার মধ্যে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। এ যেন মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ, দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে প্রদীপ নিভে যাবার পূর্ব্বে। ঘন আঁধারের মাঝে ক্ষীণা আশার প্রদীপ দেখে সুরেন্দ্রনাথ দ্রুত দাওয়ার কাছে এগিয়ে

গেলেন। ফুটন্ত যৌবনা এক শ্যামাঙ্গী জটা জুট ধারিণী-ভৈরবীকে প্রদীপের কাছে দণ্ডায়মানা দেখে সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হ'লেন। ভৈরবীর প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে স্নেহ ও বাৎসল্যের নিদর্শন সুপষ্ট রয়েছে। হাবে-ভাবে ও ইঙ্গিতে অভয় ও শাসন বিজড়িত। অতি সংকোচে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন সুরেন্দ্রনাথ "মা। একটু কি আশ্রয় পাবো?" "নিশ্চয়ই পাবে বাবা, ভিতরে এসো।" এই কথা ব'লে বনবাসিনী সুরেন্দ্রনাথকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আত্মবোধ, বিচার-বুদ্ধি, সাধন-ভজন, ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠা সব ভুলে যায় মানুষ যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভয়ার্ত্ত সুরেন্দ্রনাথের শ্রান্ত অবশ দেহ ঢলে পড়ছে, বিশ্রাম প্রয়োজন। একটি মাত্র অপরিসর মেঠে ক্ষুদ্র ঘর, স্বামী ও স্ত্রীর বাসোপযোগী কিন্তু ব্রহ্মচারী তরুণ সন্ন্যাসীর পক্ষে যুবতী ভৈরবীর পাশে শয়ন করা উচিত নয়। এই সব নানা চিন্তায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যথিত হ'লেন। দ্বার রুদ্ধ ক'রে ভৈরবী সুরেন্দ্রনাথের পাশে উপবেশন ক'রলেন। কিছুক্ষণ পরে কুটীরের বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন আরম্ভ হ'ল। সুরেন্দ্রনাথকে শ্রান্ত দেখে মধু কণ্ঠে ভৈরবী বল্লেন, "বাবা তুমি শ্রান্ত শুয়ে পড়। জানিনা কার মনে কি আছে। আগুনের কাছে ঘি থাকলে গলে যায়। কুসুমেতে কীট লাগে। ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই উড়ে আসে। রমণীর মোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞেয়। "একি অদ্ভুত পরীক্ষা, তাইতো কি করি, বাঘ ডাকছে, আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাহিরে গেলে হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে,— গুরু রক্ষা কর।" অনন্ত চিন্তায় সুরেন্দ্রনাথ অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। এক দিকে রক্তলোলুপ হীংস্র জন্তুর লালসাযুক্ত লোল জিহ্বা লক্-লক্ ক'রছে আর একদিকে রমণীর মোহিনী-শক্তির প্রবৃত্তি-রূপ উজ্জ্বল দাহিকাগ্নি পতঙ্গকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রতে উদ্যত। নারী হ'তে বহু সনাতন আর্য্য-ঋষির উত্থান ও পতনের প্রতিচ্ছবি পুরাণ ও উপ-পুরাণে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই নারীজাতি স্বর্গের সুধা, আত্মাশক্তির অংশ, সুখ-দুঃখ গামিনী, সনাতনী-সহধর্ম্মিনী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী আবার অন্যদিকে, সুরার মাদকতা, কালকূট, মায়াবিনী ও পতি ঘাতিনী। সন্ধিস্থলে এই নারী ভোগ-বিলাসিনী কপটাচারিণী ও দুঃখ দায়িনী। নিয়ম নিষ্ঠায় যেমন ব্রহ্মচর্য্য সুদৃঢ় হয় তেমনি আবার এক মুহূর্ত্তে ভঙ্গ-হতেও দেখা যায়। মিষ্টস্বরে ভৈরবী আবার সুরেন্দ্রনাথকে বল্লেন, "বাবা। ভাবনার যেমন শেষ নেই তেমনি যুক্তি তর্কেরও মীমাংসা নেই। তোমার শ্রান্ত দেহ তাই একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।" ভৈরবীর বাণী শুনে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "মা আপনি কোথায়

শোবেন ?" তাঁর বাণী শুনে ভৈরবী বেশ আগ্রহ সহকারে উত্তর দিলেন, "কেন বাবা, মা-ছেলে এ পবিত্র সম্বন্ধ, তোমার পাশে শোবো।" সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন, "তা কি ক'রে সম্ভব হয় মা, আমি যে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী।" তাঁর মুখে এই কথা শুনে ভৈরবী সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রূঢ় ভাষায় বল্লেন, "কেন সম্ভব হবে না, মা ও ছেলে এই পবিত্র সম্বন্ধে দেবতারাও হীংসা পোষণ ক'রে। তোমার মনে যদি সংশয় বা গ্লানি থাকে তাহলে আমি বাহিরে দাওয়ায় যাচ্ছি।" দ্বার খুলে ভৈরবী বাহিরে যেতে উদ্যত হলেন। নিরাশ্রয় অতিথিকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে চল্লেন বনবাসিনী তপস্বিনী ব্যাঘ্রাদি হীংস্র জন্তুর কবলে। ওগো হিন্দুনারী! তুমি এত উদার এত মহতী? নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে অপরের জীবন রক্ষা কর। তাই বোধ হয় নারীর নারীত্ব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। সহ-মরণ, জহর-ভক্ষণ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি এ আদর্শনীয় হিন্দু নারীর ইতিবৃত্ত আজও ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে সমুজ্জ্বল রবির মত সাক্ষ্য দিচ্ছে। সবই আছে বাস্তব ভঙ্গীতে, তবু কিছু নেই জ্ঞানীর জ্ঞান বিচারে। বাস্তবের অস্তিত্ব ক্ষণিক ব'লে, জ্ঞানীরা বলেন, "জগৎ মিথ্যা, মায়া কল্পিত মনের ভ্রম। যতক্ষণ দেহাত্ম বোধ থাকে ততক্ষণ জগৎ সত্য তা না হ'লে মিথ্যা, মায়া কল্পিত, মহাশূন্য। মহাশূন্যে জগতের স্থিতি ব'লে মহাশূন্য ব্রহ্ম, নির্গুণ, নিরাকার ও অব্যক্ত। তুলনা রহিত ব'লে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার লীলাই মায়া, তাই মায়াই লীলার অভিব্যক্তি। মায়াতে প্রতিফলিত চৈতন্য সত্তার বিকাশকে ঈশ্বর বলা হয়। লীলাই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তাই ইচ্ছাতে শক্তির প্রকাশ অপরিহার্য্য। লীলা না থাকলে লীলাময়ের আনন্দ থাকে না তাই লীলাই আনন্দ, আনন্দই লীলা। মায়া অবলম্বনে যখন লীলাময়ের লীলা প্রকট হয় তখন মায়াকে মিথ্যা ব'লে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মায়াকে অবলম্বন ক'রে মায়ার আড়ালে তিনি নিজেকে গোপন রেখেছেন বলেই আমরা বাস্তব বিচারে তাঁর দর্শন-স্পর্শন ও আস্বাদনে বঞ্চিত হই। সাধনার দ্বারা যখন আমরা মায়াকে জয় ক'রতে সমর্থ হই তখনই তাঁর দর্শন-স্পর্শন ও আস্বাদন লাভ করি। সমষ্টিগত এই মায়াই মহামায়া, আদ্যাশক্তি এবং বিশ্ব জননীরূপে পরিকল্পিতা হন।

"মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যতত্ত্ব ধিয়াপরা
যদানাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদাখলু॥

(শিবসংহিতা)

এই মায়াই বিশ্বজননী, মায়া লোপ পেলে বিশ্বও লোপ পায় তখন শূন্য ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ আর কিছুই থাকে না।

মা বড়, না ব্রহ্মচর্য্য বড়? বীর্য্যকে ধারণ করাই হল ব্রহ্মচর্য্য পালন করা। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই হ'লেন বিশ্ব-মাতা বা দেবী জগৎধাত্রী। মা-শব্দ পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে পরেও থাকবে কিন্তু, ব্রহ্মচর্য্য যে কোন মুহূর্ত্তে নাশ হতে পারে। লীলা সংবরণই মায়া লোপ বা নাশ। এই অবস্থায় থাকে না সাধকের আমি-আমার অভিমান বা দেহাত্ম বোধ।

সুরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে ভৈরবী বাহিরে না গিয়ে শয্যার এক পাশে উপবেশন করলেন কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথের অবশ দেহ শয্যায় ঢ'লে পড়লো, তিনি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। সুচিভেদ্য বিভৎস রজনী কেটে গেল নিশ্চিন্ত শয়ানে। প্রভাতের আলো দেখা দিল গাছের ফাঁকে, ডেকে উঠলো পক্ষীকুল নানা স্বরে, মুখরিত হ'ল তরুলতা বন মধুর গুঞ্জনে। সুরেন্দ্রনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল, স্বপ্ন ভাঙ্গার মত তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। দু-চক্ষু মার্জ্জনা ক'রে চারিদিক লক্ষ্য ক'রে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে আপন মনে বল্লেন, "একি অদ্ভুত ব্যাপার? আমি ছিলাম মেঠে ঘরের মধ্যে কিন্তু, এখানে কি করে এলাম? তবে কি আমি বনের মধ্যে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম? কোথায় গেলেন সেই বনবাসিনী তপস্বিনী? তাইতো এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, চারিদিকে ব্যাঘ্র পদচিহ্ন রয়েছে, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকলেও তো তারা আমার অঙ্গ স্পর্শ করেনি? অদ্ভুত এই পরিস্থিতি অদ্ভুত এই ঘটনা। সবই গুরু কৃপা, কৃপাহি কেবলম্।" জয় গুরু, উচ্চারণ ক'রে বিষণ্ণ বদনে তিনি শ্রীগুরুর নিকটে উপস্থিত হ'লেন। শিষ্যের বিষণ্ণ বদন দেখে শ্রীগুরু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "সুরেন, রাত্রে আশ্রয় পেয়েছিলে ত?" শ্রীগুরুর বাণী শুনে সুরেন্দ্রনাথের ভাব প্রবণতায় নয়ন ধারা ঝ'রে প'ড়লো। শ্রীগুরুর পদ-যুগল স্পর্শ ক'রে শিশুর ন্যায় তিনি কেঁদে ফেল্লেন। আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়ে শ্রীগুরু বল্লেন, "সুরেন! তুমি বড় বোকা, তারামাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলে না। যাক্ দুঃখ ক'রোনা এ সব যোগবিভূতি সময়ে অবার দেখা পাবে।" সুরেন্দ্রনাথ করযোড়ে উচ্চারণ ক'রলেন :—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তংযেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

বর্ম্মার বন-পথে গুরু ও শিষ্যের আগমনে শ্বাপদ-সঙ্কুলপূর্ণ ঐ গভীর অরণ্য তপোবনে পরিণত হ'ল। এই সময় হতে শিব প্রতিম শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উপযুক্ত শিষ্য সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীমৎ সূর্য্যানন্দগিরি পরমহংস, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে প্রধান শিষ্যরূপে গ্রহণ ক'রলেন। গুরু প্রদত্ত নাম হ'ল তাঁর মহানন্দগিরি পরমহংস। বর্ম্মা যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ অবধি গুরু ও শিষ্য বর্ম্মায় ভয়াবহ অরণ্যে কঠোর সাধনা করেন।

গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী শাখার অন্তর্ভুক্ত। দণ্ডী, কুটীচক, বহুদক হংস, পরমহংস, অবধূত এবং নাগা দশনামী মধ্যে পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিদিকে আচার্য্য শঙ্করের চারিটি মঠ অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকা মঠ; দক্ষিণে মহীশূরে তুঙ্গনদীর তীরে শৃঙ্গেরী মঠ; উত্তরে বদরীকাশ্রম হ'তে প্রায় সাড়ে নয় ক্রোশ নিম্নে যোশী বা জ্যোর্তিমঠ বিরাজিত। বন, অরণ্য, তীর্থ আশ্রম প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীবৃন্দ দ্বারকা এবং গোবর্দ্ধন মঠের অন্তর্ভুক্ত। দশনামী নাগা সন্ন্যাসীদের আখড়া বিদ্যমান; নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনা উল্লেখ যোগ্য। প্রত্যেক আখড়ায় একজন মণ্ডলীশ্বর থাকেন। সাধু সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা যায়। সন্ন্যাসী, উদাসী, নির্ম্মল, ও বৈষ্ণব শীর্ষস্থানীয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন মঠ ও সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাঁদের মত ও পথ বহু থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সবারই এক এবং একেই তাঁদের সাধারণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

(৫)

লক্ষ-লক্ষ গুরু পাওয়া যায় কিন্তু, উপযুক্ত একটি শিষ্য পাওয়া খুবই দুরূহ। যিনি শাসনাধীনে থেকে গুরুর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করেন এবং গুরু সেবায় দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে সমর্থ হন, একমাত্র তিনিই শিষ্য হবার যোগ্য। গুরু সামান্য নর নন, সাক্ষাৎ ভগবান এই ধারণা যাঁর বদ্ধমূল হয়েছে তাঁর আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। গুরুর চরণে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণই হ'ল চরম সিদ্ধিলাভ। বাক-বিতণ্ডা ও

সমালোচনার বহির্ভূত হ'লেন গুরু এবং তাঁর নির্দ্দেশই হ'ল বেদবাণী বা মন্ত্র। যে বাণীর দ্বারা জীবের মোহ নাশ হয় তাই হ'ল মন্ত্র।

"দেবতা গুরু মন্ত্রনামৈক্যং সম্ভবয়ানৃধিয়া,
তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রঃ প্রকটে হানিরেব চ ॥"

(মুণ্ডমালা তন্ত্র)

ইষ্ট দেবতা, গুরু ও মন্ত্র এই তিনকে একে পরিণত ক'রতে পারলেই অর্থাৎ এই তিনকে অভেদ জ্ঞান ক'রলেই সিদ্ধিলাভ ঘটে।

ইষ্টদেবতা, মাটি, পাথর, ধাতু যাতেই গড়া হোক্‌না কেন, তবুও তিনি সদা জাগ্রত ও প্রাণময় বা প্রাণময়ি। মন্ত্র সামান্য অক্ষর বা বর্ণ নয় দেবতারই প্রকাশক এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। গুরু নরাকার রূপ ধারণ ক'রলেও তিনি দেবতা সাক্ষাৎ ভগবান। এই চিন্তা গাঢ় হ'লেই একে তিন এবং তিনে এক হয়। বহুর একে সংযোজনই হ'ল সাধনা এবং তাতে অখণ্ড বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করাই হ'ল বেদ-বেদান্ত, তন্ত্রও পুরাণ। আত্মাতে গুরু দর্শন এবং গুরু চরণে আত্ম নিবেদনই হ'ল সংসিদ্ধি লাভ বা মোক্ষ। এই ভাবই হ'ল তত্ত্বমসি জ্ঞানলাভ। জ্ঞান হ'ল সমুদ্র; গঙ্গা-বিশ্বাস, যমুনা-সংযম এবং সরস্বতী-সমাধি।

ঘটের আকাশ ঘটেই ভাসে।
তাই অঘটনে ঘট বিকাশে ॥

শ্রীগুরু বাবার নির্দ্দেশ পালন ক'রতে হবে, তাঁর বাণীই আমার কাছে বেদ-বাণী। এই চিন্তায় মহানন্দগিরি দিবারাত্র মগ্ন। ক্রমাগত তীর্থ ভ্রমণে তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। চলেছে তাঁর উদাসী মন ভেসে ভক্তির টানে অসীম জ্ঞান পারাবারের দিকে। লহরী আঘাতে যদি মন ভেঙ্গে যায়, কূল না পেয়ে যদি কূল হারায়, তথাপি জলের বিম্ব জলেতে মিশায় অসীম পারাবারে। বৈদ্যনাথ ধাম, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব ও বেনারস ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তিনি এক শুভদিনে যাত্রা ক'রলেন। পাথেয় তাঁর তীব্র গুরু ভক্তি এবং সঙ্গের সাথী হ'লেন একমাত্র আত্মবিশ্বাস ও চরম ত্যাগ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন তারামায়ের রাজত্ব তখন বৃথা করি কেন, ভয় ভাবনা এবং সংকোচ। জীব দিয়েছেন যিনি রক্ষা ক'রবেন তিনি। আমি-আমার ভাবনা সংকীর্ণ মনের কল্পনা। নানা তীর্থ ও ধাম তিনি সানন্দে ভ্রমণ ক'রতে লাগলেন। বিন্দু বিন্দু জলসংযোগে যেমন সাগরের উৎপত্তি হয় তেমনি মহাপুরুষের পদার্পণে তুচ্ছস্থানও তীর্থে পরিণত হয়।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চস্থিতম্।
ভূত ভর্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গসিষ্ণু প্রভাবিষ্ণু চ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

তিনি ভূত সমূহে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান, তিনি ভূতগণের পালক, গ্রাসকারী এবং স্বয়ং বিভিন্ন রূপে উৎপন্ন হন।

ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বভূতে সূক্ষ্মাবস্থায় ব্যাপ্ত তেমনি আবার তাঁর অনাদি শক্তি সর্ব্বভূতকে নিয়ে লীলায় মত্ত। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ) উপভোগ করি সে শক্তি ঐ অনাদি শক্তির কণামাত্র। নদ-নদী, অসীম সাগর, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন, ফল-ফুল এই নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ঐ অনাদিশক্তিরই পরিচায়ক। তত্ত্ব আদি-অন্তহীন ব'লে লীলায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় বিরামহীন।

(৬)

বৈদ্যনাথধামে বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ক'রে শিষ্য ও এক ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন গুরু সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজ পূর্ব্বদিকে মাঠ ঘাট ভেঙ্গে বীরভূম জেলা অভিমুখে। নিশায় আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরা তরুমূলে বা কোন দেব মন্দিরে। বহু বন উপবন পার হ'য়ে কয়েকদিন পর তাঁরা পদার্পণ ক'রলেন বীরভূমের রাঙ্গামাটিতে। নগর পার হয়ে যখন তাঁরা গ্রামে প্রবেশ ক'রলেন তখন পর্য্যন্ত ভক্তরা জানেন না তাঁরা কোথায় চলেছেন। গুরু পথ প্রদর্শক এবং তিনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, এই বিশ্বাসে ভক্তদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম পার হয়ে যখন তাঁরা দিগ্‌হীন বিস্তীর্ণ মাঠে পড়লেন তখন বেলা প্রায় দ্বি-প্রহর। কাঠফাটা রৌদ্রে ক্রমাগত পথ চলনে ভক্তদ্বয় শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত এবং গলদ-ঘর্ম্ম হয়েছেন। উচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ চলে গিয়েছে লক্ষ্যের বাহিরে, মিশেছে ঝুঁকেপড়া নীল আকাশের গায়ে। বহুদূরে আবছা দেখা যাচ্ছে দু-একটি ঝামরে পড়া তরু মাঠের এক প্রান্তে। সহসা বল্লেন গুরু আপন মনে, প্রচণ্ড রৌদ্র একটি গাছও নেই যে, ছায়ায় বসি।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মার্ত্তণ্ডদেবকে আবৃত ক'রলো। কিছুক্ষণ পরে শীতল বায়ুর স্পর্শে তাঁরা আরাম বোধ ক'রলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অনুকম্পা, কত দরদ, কত টান, ভক্তের পায়ে কাঁটা বিঁধলে ভগবান তার যন্ত্রণা ভোগ করেন। তিনি প্রতিদান কিছু চান না, শুধু এই চান ভক্ত

যেন তাঁকে ভুলে না যান। এই হ'ল বিশুদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপাদান।

বিস্তীর্ণ ময়দান পার হ'য়ে তাঁরা উপস্থিত হ'লেন ছোট-ছোট ঝোপ-ঝাড়ের কাছে। আশে-পাশে খেলা করছে শৃগাল শাবক, নর অস্থি মুখে নিয়ে। অদূরে ঘন তরুরাজি হ'তে ভেসে আসছে নানা অমঙ্গল সূচক ধ্বনি, খা-খা-খা, ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ, খট্ খট্, পট্ পট্। কাহুয়া কাহুয়া রবে প্রকম্পিত হ'ল ঝোপ ঝাড় কিছুক্ষণ পরে। মায়া বদ্ধ জীব সশঙ্কিত হয় এই সব মর্ম্মান্তিক করুণ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে। এই করুণ ধ্বনি যেন নিদান সময়ের আহ্বান। কে যেন অভিসারে কেউ কাউকে মায়া ছিন্ন করে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে কোন অজানা দেশে নিয়ে যেতে চায়। যাবোনা বল্লেও ছাড়ে না, কাকুতি, মিনতি সে ভাল বাসে না, ঘ্যান-ঘ্যান করে কাঁদলেও দয়া করে না। ভয় দেখানই যেন তার পেশা। একই শব্দ আদি হতে উত্থিত হয়ে ধ্বনিতে ব্যাপ্ত হয়, বর্ণ-ভাষা-বাণী-লহরী, আহ্বান, প্রত্যাখান, মিষ্ট-কটু-লঘু, মধু, উচ্চ-কোমল কড়িমা এবং খাদ। তাই লাগে মধুর, আনন্দদায়ক, বিষাদসূচক, কর্কশও ভীতিজনক। একই হরিনাম কীর্ত্তনে লাগে মধুর কিন্তু, শব বাহকের ধ্বনিতে আসে শোক ও ভয়। শ্মশান দেখলে কেউ সন্ত্রস্ত হয় মৃত্যু ভয়ে, আবার কেউ আনন্দে আটখানা হয় শবের বুকে শিবানীর রূপ দেখে। সবারই মূলে একমাত্র মায়াই লীলাময়ি। কেউ জীবন সর্ব্বস্ব পণ করে এই পটিয়সী মায়াকে মাতৃসত্বার মাধ্যমে উপভোগ করে আবার কেউ মায়ার কবলে প'ড়ে, আকৃষ্ট হ'য়ে হায় হায় করে। মায়া জীবনের মায়া, আমি চাই না স্বর্গ, চাইনা বৈকুণ্ঠ, চাইনা ব্রহ্মলোক। আঁধার আলোকে ভরা এই ভূলোকই ভাল। হোক্ দুঃখ কষ্ট, আসুক বার্দ্ধক্য এই মাটি জল ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। এই ভূলোকই আমার স্বর্গ,—হলে। শোক-সন্তপ্ত। নিভু নিভু বাতি নিভে যাবার পূর্ব্বে দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে চায়। এ সবই মায়ার খেলা, মজ্জাগত মায়াই সুখ দুঃখ প্রদায়িনী। জীবের আমি আমার ভাবই হল মায়া। আমি আমার ভোলবার জন্যে; সবই তুমি, সবই তোমার এই ভাব স্মরণে রাখবার জন্যে প্রয়োজন হয় জপ-তপ, সাধন-ভজন ও মাথা ঠোকাঠুকি। আমি আমার ভাব যখন মন হ'তে সরে গিয়ে তুমি তোমার ভাবে পরিস্ফুট হয় তখন মনে আসে না ভয়, ভাবনা, শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট, মান, অপমান, অভিমান, সঙ্কোচ ও সংশয়। তুমি, তোমার ভাব যত ঘন হবে, ততই লাভ হবে তত্ত্বমসি জ্ঞান।

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে যতই তাঁরা এগিয়ে চলেছেন ততই তাঁরা দেখছেন, চারিদিকে পড়ে আছে অসংখ্য নরকরোটি, কঙ্কাল ও অস্থি। কালের এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের আহুতি ও আবাহন দেখে ভক্তদের মাথা ঘুরে গেল। জন-মানবহীন এক মহাশ্মশান, নিত্য নিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনে রয়েছে বিদ্যমান, জন্ম-মৃত্যুর সংবিধানে শেষ প্রয়াণ। নিকটে নেই কোন বসতি অথচ কোথা হ'তে আসে এত নিধন যজ্ঞের আহুতি? একটি নয়, দুটি নয়, দু-একশো নয়, চতুর্দ্দিকে রয়েছে পড়ে রাশি রাশি নরকরোটি ও অস্থি। ডানা মেলে ছিঁড়ে খাচ্ছে শকুনের দল, সদ্য নিক্ষিপ্ত এক কোমল শিশু। অস্থি চিবোচ্ছে শিবা ও কুকুর সুখে-সচ্ছন্দে ঝোপের আড়ালে। একের আনন্দোৎসব অপরের সর্ব্বনাশ। আনন্দ বিলাস ও শোকচ্ছ্বাস একই আধারে কেন হয়, এ প্রশ্নের মীমাংসা নাই ব'লে লীলাময়ের ইচ্ছা বলে আরোপ করা হয়। ইচ্ছাই যদি হয় লীলার মূল কারণ, তাহলে জীবের একমাত্র অবলম্বন থাকে সাধন ভজনে, আমি কিছু নয় সবই তুমি, তুমিই নিরঞ্জন।

প্রায় একক্রোশ ব্যাপী দীর্ঘ এক সমতল নিম্নভূমিকে আবৃত ক'রে রয়েছে ছোট ছোট কুঞ্জ ও নানা জাতীয় তরু। বিষাদ মাখা ছায়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে কত মৃত দেহ, গড়াগড়ি খাচ্ছে কত খণ্ড বিখণ্ড মুণ্ড আঁদাড়ে পাঁদাড়ে। স্তূপাকার ছেঁড়া মাদুর, পোড়া বাঁশ, কলসীর কানা আরো বিভীষিকা বৃদ্ধি করেছে। শোকাতুরা ক্ষীণা উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদী বহে যাচ্ছে শ্মশানের পাশ দিয়ে কাতরে। নদী গর্ভে নিহিত রয়েছে কত অভাগার করোটি ও অস্থি তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে। সৎ-অসৎ বিদ্বান-বুদ্ধিমান, ধনী-দরিদ্র, পাপী-তাপী নাই বিভেদ বিচার তাই একই আধারে শেষ প্রয়াণ কালের নিয়মে। নাই এখানে আদালতের ডিক্রীজারী ন্যায়-অন্যায় বিচারে। অলক্ষ্য বিচারকের বিচারে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু, সবারই সমাবেশ, একই আধারে পরিশেষ পঞ্চভূতে গড়া এ নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশলেও অলক্ষ্য বিচারকের বিচারে মামলার নিষ্পত্তি হয় না আমলা তন্ত্রে সাক্ষ্য প্রমাণে। জেরা এ আদালতে নেই, নেই সুপারিশ আবেদন-নিবেদন বা বাহ্যিক আইন-কানুন। দেখে শুনে, প'ড়ে হয়তো ভয় আসতে পারে কিন্তু, ভয় পেলেই বা কি হবে। বিষ্ঠা মেখে ব'সে থাকলেও যমে ছাড়ে না। সময় হলেই যাকে প্রয়োজন তাকে ঠিক সে নিয়ে যাবেই যাবে। কোন বাধা-বিঘ্ন, দিন, ক্ষণ, অশ্লেষা, মঘা সে মানে না, মানে না ত্রয়োস্পর্শ বা দিকশূল। এই হ'ল সৃষ্টি তত্ত্বের নিয়ম, কালের ধারা, নাই ব্যতিক্রম।

কোথা হ'তে এল এই রাশি রাশি হতভাগ্য শুষ্ক কপাল, কঙ্কাল ও অস্থি? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হ'ল, এ সব অতীত যুগের সঞ্চিত নিধন সামগ্রী। তান্ত্রিক সাধকদের অট্টহাসি ও মাদকতার উল্লাসে মুখরিত ছিল একদিন এই ভয়াবহ মহাশ্মশান। অতীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝোপের আওতায় চলতো কত তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ, শব ও চিতা সাধনা খরবারে গাঢ় আঁধারে। কেউ কর্ম্মদোষে বিকলাঙ্গ হ'য়ে চোখের জল ফেলেছে, কেউ ভয় পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে শ্মশান বিভীষিকায় এবং স্বল্প ভাগ্যবানই কৃতার্থ হয়েছেন, শবের বুকে শিবানীর জ্যোতির্ম্ময়ি রূপ দেখে। তাঁর করুণার উপর যে বীর সাধনা নির্ভরশীল, সেই সাধনায় চলেনা তামসিক ক্রিয়া-কলাপ, পৈশাচিক বৃত্তির অনুষ্ঠান দাপটে। বীর সাধনা, তীব্র ভক্তির আরাধনা। তীব্র ভক্তির ভাব বিকাশে প্রকাশ পায় মহামায়া মায়ের বিভিন্ন রূপ কালী-তারা ইত্যাদি দশ-মহাবিদ্যারূপে। ভক্তি অভাবে শাস্ত্র উক্তিও অসার প্রতিপন্ন হয় যুগ-কাল ধর্ম্মে।

কেবলমাত্র নামে, মা শব্দ উচ্চারণে একদিন কেঁপে উঠতো এই বিভীষিকাময় মহাশ্মশান সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম বাল-ব্রহ্মচারী ভৈরব শ্রীশ্রীবামা ক্ষেপা বাবার নাদে। পূজা, যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র, বেদ-বেদান্ত কিছুই প্রয়োজন হয়নি তাঁর মায়ের কোল পাবার জন্যে। সে সরল বিশ্বাস ও ভক্তির টানে, মধুর মা শব্দ উচ্চারণে ঝ'রে পড়তো পাষাণী মায়ের নয়ন ধারা বাৎসল্যের মমত্ববোধে। মা ও ছেলে দুটি কথা, দাবী ও স্নেহে পরস্পর গাঁথা, মা শব্দ শ্রবণে মায়ের যত অশ্রু ঝরে দামাল ছেলেরও তত শক্তি বাড়ে। এই হ'ল প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বীরাচার। মাকে পেতে হবে; মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; যাক্ এ দোদুল্যমান দেহ-মন-প্রাণ; একদিন তো যাবেই, তবে আবার মায়া কিসের? ভয়-ভাবনা, শোক-তাপ চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে; মাকে পেতে হ'লে ওসব ভুলতে হবে। যাগ-যোগ, ভক্তি মুক্তি ওসব বুঝিনা, বুঝতেও চাইনা। পেতে চাই মাকে; মায়ের ঐ চির শান্তিময় কোল, যেখানে নাই বিরহ-বিচ্ছেদ, বাস্তবের হট্টগোল। কিসের ভাবনা, কেন করি ভয়, অভয়া যার মা, সন্তানে দেয় সদা অভয়। কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান যাক্ অন্তর হ'তে দূরে সরে, যে পারে সে করুক সারা জীবন ধরে। আমি অত পারি না, সাধন-ভজন জানি না, আচার-বিচার মানি না, জানি শুধু মা-মা ধ্বনি, তিনি মা, আমি ছেলে। মায়ের অত পূজা জপে কি প্রয়োজন? যেথা দাবীর স্পর্শে, মা শব্দ উচ্চারণে স্নেহ বাৎসল্য ঝরে

পড়ে কাজ কি অত আড়ম্বরে। পূজাই বা ক'রব কি ক'রে আমিত সদা দেউলে, এক অভিমান ছাড়া আমার ব'লতে আর তো কিছুই নেই। ফল-ফুল-পাতা-জল এ সবইতো মায়ের সৃষ্টি, তা হলে গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজা ক'রতে হয়। শাস্ত্র বলেন, মহামায়া মাকে পূজো ক'রবে গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে। ভূমার আত্ম-স্বরূপ যে গন্ধ, সেই গন্ধ দিয়ে পূজা ক'রবে; পুষ্প আকাশের আত্ম-স্বরূপ নির্ম্মল, ধূপ বায়ুর আত্ম-স্বরূপ; দীপ অগ্নির আত্মস্বরূপ, নৈবেদ্য অমৃতের আত্মস্বরূপ, তাম্বুল সকলের আত্মস্বরূপ। এই পঞ্চোপচার মানস পূজার উপকরণই হ'ল আত্মায় আত্ম নিবেদন, মনঃ সংযমে। অত পরমাত্মা-জীবাত্মা বুঝিনা শুধু এই টুকু বুঝি মায়ের বিশুদ্ধ স্নেহ ও সন্তানের সরল দাবীর সম্মিলনে যে আনন্দ বিরাজিত, সে আনন্দ অতুলনীয়, স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র। মা শব্দ উচ্চারণে গন্ধের উৎপত্তি; নির্ম্মল চিদাকাশই পুষ্প; কামনা-বাসনার চরম ত্যাগই দীপ; আত্ম সমর্পণ নৈবেদ্য এবং সমজ্ঞানই হ'ল তাম্বুল। এই হ'ল সরল পূজার পঞ্চোপচার। পঞ্চ উপচার, পঞ্চ দেবতার মহিমায় মণ্ডিত যথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-সূর্য্য ও চন্দ্র। সৃষ্টি-স্থিতি লয়-প্রলয় ও মহাপ্রলয় লীলা তত্ত্বের অবদান।

তারাপীঠে যে মহাশ্মশানে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন সেই পবিত্র স্থানই হ'ল ঋষি বশিষ্টদেবের তপোবন। জানিনা ইনি কোন্ বশিষ্টদেব। যিনি ইষ্টকে বশ ক'রতে সক্ষম হন তিনিই বশিষ্ট। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছাশক্তি, এক এবং মঙ্গল। যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হ'তে মনকে সরিয়ে নিয়ে এসে একে অর্থাৎ আত্মায় বশীভূত করতে সক্ষম হন তিনিই বশিষ্ট। মনকে আত্মায় সংযোগ ক'রে আত্মায় বশীভূত ক'রতে পারলেই জীবের মঙ্গল হয়। এই আসন এখন শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপাবাবার অধিকারভুক্ত। তাই কলিযুগে তিনিই এখন ঋষি বশিষ্ট। শ্বেত শিমুল তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে ঋষি বশিষ্ট সাধনা ক'রতেন। যোগিনী তন্ত্র মতে দৈবাৎ মৃত্যু পাঁচটি বিভিন্ন মুণ্ড যথা :—নীচজাতীয় নরমুণ্ড, হনুমান মুণ্ড, কৃষ্ণ সর্প মুণ্ড, হস্তী মুণ্ড (অভাবে গোমুণ্ড) কৃষ্ণ পেচক মুণ্ড। ইহা ব্যতীত অন্য মতে বিকল্পও দেখা যায়। তারামায়ের কপালেও পাঁচটি শুষ্ক মুণ্ড সজ্জিত রয়েছে। মুণ্ডের মধ্যে বুদ্ধিগুহায় জ্ঞানের স্থান। অর্থাৎ আমাদের কপোলদেশে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিরাজ ক'রছে। তাই মনকে বাস্তব হ'তে সরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর উপবেশন করানই হ'ল পঞ্চমুণ্ডির আসনে উপবেশন। বর্ত্তমানে ঐ আসন লক্ষমুণ্ডিতে পরিণত হ'য়েছে। লক্ষ কথাটিতে

'ষ' ফলা দিলে সাধকের সাধন পথ সুগম হয়। "লক্ষ্য মুণ্ড" হে সাধক ! তোমার মুণ্ডের মধ্যে যে সহস্রার পদ্ম মধ্যে বিশুদ্ধ পারার ন্যায়, কোটি কোটি সূর্যের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল এবং কোটি কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধতায় কমনীয় মন সংযমে সেই আত্মার দিকে লক্ষ্য রাখ তবে লক্ষমুণ্ডির আসনের মর্যাদা দেওয়া হবে। এই আসনে শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা মহাসিদ্ধিলাভ করেছেন। বামে বাম', দক্ষিণে দক্ষিণা। যে মহাশক্তির বাম পা শিবের বুকে তিনি হলেন তারিণী দেবী। যিনি তারামায়ের বাম-পা বক্ষে পাওয়ার জন্যে পাগল হ'য়েছেন তিনি বামাক্ষেপা অর্থাৎ ভৈরব। বাম অর্থে আবার বিপরীত, তাই শাস্ত্র বলেন, "বিপরীতরতাতুরা।" সৃষ্টি তত্ত্বের আদিতে, তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজো ও তমঃ সাম্য অবস্থায় ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল ঐ অবস্থাই হ'ল প্রকৃতি দেবী বা দেবী কালিকা (ইংরাজীতে ম্যাটার বলা হয়)। হঠাৎ হুংকার শব্দ উত্থিত হ'য়ে এই ত্রয়ীভাবকে দ্বিভাগে বিভক্ত করে। এক ভাগের নাম হ'ল পুরুষ এবং অন্য ভাগের নাম দেওয়া হ'ল প্রকৃতি। দুধের মধ্যে মাখন আছে, আলোড়ন ক'রলেই দুধের উপর ভেসে ওঠে। সহজাত দ্রব্য হলেও আর মিশ খায় না, ঠিক এইভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি সরাসরি মিশ না খাওয়ায় পুরুষের বিপরীতে প্রকৃতি অবস্থান ক'রলেন। পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীতে এই সংমিলনই হ'লেন তারাদেবী। পুরুষ ও প্রকৃতি সংমিলনে তারাদেবীর নিম্নাংশ পুরুষ ও উর্দ্ধাংশ প্রকৃতি ব'লে পুরুষ-প্রকৃতি সমন্বিত বলা হয়। নিষ্কাম এ সাধনা জীবের ক্ষণিক সঙ্গম সুখের বিপরীত অবস্থা বলেই তারাদেবীকে বামা বলা হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনই হ'ল তারা সাধনার প্রধান আচার বা কৌলাচার।

যে মহাশ্মশানের প্রতি ধূলিকণা বিভূতিতে মণ্ডিত, সেই ভীতিজনক ; শ্বাপদ-সঙ্কুল পূর্ণ অরণ্যাবৃত সুদীর্ঘ তপোবনে, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-তাপ সব সহ্য করে নির্ভয়ে অতিবাহিত ক'রেছেন দিগম্বর ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বহু বৎসর একাধিক্রমে মহামায়া মায়ের শক্তিতে শক্তিবন্ত হ'য়ে। প্রলোভন, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অপবাদ সব উপেক্ষা ক'রে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছিলেন। এই শক্তিধর দামাল ছেলে বিশ্বমায়ের কাছে তপি ক'রে কত অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন যা সাধারণ সংসার কীটের পক্ষে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ব'লে প্রতীয়মান হয়। মাতৃশ্রাদ্ধে বৃষ্টিস্তম্ভন, রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্থ রোগীকে প্রহারে রোগ নিরাময়, সর্প দংশন হ'তে জীবন রক্ষা ইত্যাদি বহু অলৌকিক ঘটনা তিনি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন মহামায়া মায়ের অসীম কৃপায়। শক্তির প্রভাবকে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে জড়শক্তি

বা বিভূতি ব'লে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের প্রহসনই হ'ল শক্তির প্রভাব। শক্তির প্রভাব বা বিভূতি না থাকলে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় কিছুই থাকে না। নাদ-সিদ্ধ যোগী বামা-ক্ষেপা বাবার মা শব্দ উচ্চারণে বা তারানাদে ঐ ভয়াবহ শ্মশান কেঁপে উঠতো এবং কাছে ছুটে আসতো হিংসা-দ্বেষ ও ভয় ত্যাগ ক'রে শিবা, কুকুর এবং বিষধর সর্প। সেই জাগ্রত শ্মশান আজও শূন্য পড়ে রয়েছে উপযুক্ত সাধকের অভাবে। এই শ্মশানে বাহ্যিক যে, ক্রিয়া কলাপ করা হয় শুধু মনঃ সংযমের জন্য। শব-সাধনা রিপু ও ইন্দ্রিয়কে জয় করা এবং অষ্টপাশ হ'তে জীবাত্মার মুক্তির জন্যে বীরাচারে অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টপাশ হ'ল,

"ঘৃণা লজ্জা-ভয়ং শোক জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলংতথা জাতিরষ্টো পাশা প্রকীর্ত্তিতঃ।"

বাহ্যিক যে শবসাধনা করা হয়, সেই শব নীচ জাতি হওয়া চাই এবং রোগে বা আত্মঘাতী অবস্থায় মৃত্যু হলে চলবে না। অর্থাৎ যার দৈবাৎ অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে সেই শবই সাধানার উপযোগী। যেমন জলে ডোবা (গঙ্গায় নয়) সাপে কাটা, উচ্চ স্থান হ'তে পতন ইত্যাদি বিচার ক'রে শব সাধনা ক'রতে হয়। যার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার আত্মা ভগবানের বিচারাধীন অতএব সেই আত্মা কি ক'রে সক্ষম হয় অন্যকে পথ দেখাতে ? তন্ত্রের সাধনা বাহ্যিক মনে হ'লেও সবই আভ্যন্তরীন যোগের অঙ্গ বিশেষ। অষ্টপাশ হ'তে মুক্ত হবার জন্যে সাধক ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি ত্যাগ ক'রে শব, চিতা, মুণ্ড সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এ দেহ যে নশ্বর এবং শব ভিন্ন আর কিছু নয় এই চিন্তাই মনে সদা সর্ব্বদা পোষণ করাই হ'ল বীরাচারে শব ও চিতা (চিত্তে অগ্নি চিন্তা) সাধনা।

তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপা বাবা ব'লতেন "নাক-মুখ-কান টিপে কিছু হয় না বাবা; (প্রাণায়াম ও কুম্ভক) ভক্তিই সার বস্তু।" ভক্তের ভগবান এবং নাস্তিকের জড় প্রধান। তিনি আরো ব'লতেন, ওরে তোরা ভোগ যোগ এক সঙ্গে কর, কলির এই সাধনা।" পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ) সবাই ভোগ করতে বাধ্য, এই পঞ্চতন্মাত্রা প্রবৃত্তির মাধ্যমে ভোগ না ক'রে নিবৃত্তির মাধ্যমে ভোগ করাই হ'ল যোগ ভোগ এক সঙ্গে করা। যেমন কোন স্ত্রীলোকের রূপ-রস প্রবৃত্তির মাধ্যমে ভোগ না করে যদি মাতৃ-সত্ত্বার মাধ্যমে স্নেহ বাৎসল্য ভোগ করা হয় তাই হ'ল 'যোগ ভোগ' একসঙ্গে।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবশ্চ বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহুবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্"

(উত্তর গীতা তৃতীয় অধ্যায়)

শাস্ত্রের অন্ত নাই, জ্ঞাতব্য বিষয় বহুল, জীবের পরমায়ু সংখ্যা অত্যল্প। জীবন কালেও বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয় অতএব হংস যেমন জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত থাকিলে জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে সেইরূপ সকল শাস্ত্রের সার ভাগ গ্রহণ করিবে।

মহাশ্মশানে প্রবেশ করে গুরু সূর্য্যানন্দ গিরি পরমহংস ভক্তদ্বয়কে বল্লেন, প্রাচীন যুগের এই তপোবনে, দশটি ইন্দ্রিয়কে জয় করবার জন্যে এখানে দশটি আসন বিদ্যমান। ফলে ফুলে পূর্ণ অতি প্রাচীন এই শ্বেতশিমুল বৃক্ষটি তারামায়ের প্রতিভূ স্বরূপ কল্পতরু। এই তরুর মূলে ঋষি বশিষ্টদেব কৃত পঞ্চমুণ্ডীর আসন সিদ্ধাসনে পরিণত হয়েছে। আজ মহানিশায় তোমাদের দুজনকে বিভিন্ন দুটি আসনে বসিয়ে দেবো।" শ্রীগুরুর মুখে এই বাণী শুনে মহানন্দ গিরি মহারাজ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এ আসন কি এখন সাধক বিহীন অবস্থায় শূন্য পড়ে আছে?" "না বৎস! যাঁর প্রতিষ্ঠিত এই আসন এখন তিনি নবকলেবর ধারণ করে নিজের আসন নিজেই রক্ষা করছেন।" উত্তর দিলেন গুরু শিষ্যকে। "তাঁকে তো দেখছিনা গুরুদেব? কে তিনি, সেই মহামানব?" জিজ্ঞাসা ক'রলেন শিষ্য শ্রীগুরু বাবাকে। "তিনি তারিণী মায়ের ক্ষেপা ছেলে সাধারণে বামাক্ষেপা নামে পরিচিত। মহামায়া মাকে ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না বা জানতেও চান না। মায়ের নামে তিনি হাসেন, কাঁদেন, নৃত্য করেন আবার কখন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে আগন্তুকদের মড়ার হাড় ছুঁড়ে মারেন। তিনি এত মাতৃভক্ত যে, মাকে ধরবার জন্যে এই ভয়াবহ বিরাট শ্মশানে গভীর আঁধারে ছুটাছুটি করেন। কৃপা হলে তাঁর দর্শন পাবে।" এই কথা বলে সূর্য্যানন্দগিরি দ্বারকা নদীর তীরে দুই ভক্তকে বিভিন্ন দুটি আসন দেখিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা আগত প্রায় দেখে ভক্তদ্বয় জীবিত কুণ্ডে স্নানে গেলেন। জনশ্রুতি আছে, অতি প্রাচীনকালে বশিষ্টদেবের প্রেমাশ্রু প'ড়ে এই কুণ্ডের উৎপত্তি।*

* তারাপীঠ ভৈরব দেখুন।

জয়দত্ত সওদাগরের একমাত্র পুত্র ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হলে এই জল মাহাত্ম্যে পুনর্জীবন লাভ করেছিল বলে জীবিত কুণ্ড বলা হয়। এই ঘোর কলিযুগে মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ না করলেও জীবিত কুণ্ড নামটি এখন প্রচলিত আছে।

"রেফস্তু কুঙ্কুমাভাস কুণ্ড মধ্যে ব্যবস্থিত।
মকারশ্চ বিন্দুরূপৌ মহাযনৌ স্থিতপ্রিয়ে।"

(তন্ত্রসার)

নাভির অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ শিব আছেন, শিবলিঙ্গের মস্তকে যে ছিদ্র আছে তাই হ'ল কুণ্ড। এই কুণ্ড মধ্যে কুল বধুর ন্যায় কুণ্ডলিনী শক্তি (ব্রহ্মের চিৎশক্তি) সুসুপ্ত অবস্থায় বিরাজিতা এই কারণে জীবিত কুণ্ড বলা হয়।

জীবিত কুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান ক'রে ভক্তদ্বয় শ্রীগুরুর কাছে উপস্থিত হলেন। ভক্তদ্বয়কে আসনে বসিয়ে দিয়ে গুরু বল্লেন, "গণ্ডী দিয়ে দিলাম তোমরা চোখ বন্ধ ক'রে জপ কর, প্রলোভন বা ভয় পেয়ে যেন আসন ত্যাগ করোনা তাতে বিপদ হতে পারে।" ভক্তদের সাবধান করে দিয়ে শ্রীগুরু সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজ মন্দিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মহানিশা আগমনে শিবা ডেকে উঠলো। তরুরাজির শাখা প্রশাখা নড়ে উঠলো, খসে পড়লো শুক্‌নো পাতা খস্ খস্ শব্দ ক'রে। গাঢ় আঁধারে আচ্ছন্ন শ্মশানের একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্ত অবধি তরুশাখা হ'তে শকুন শাবকের কান্না সুরু হ'ল ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ। ঝট্‌পট শব্দ ক'রে কারা যেন মারামারি সুরু ক'রলো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। শ্মশানের চতুর্দ্দিকে খটখট শব্দ ক'রে গড়াতে লাগলো নর-করোটি। কোঁৎপাড়া উ-আঁ, করুণ শব্দ এবং ফোঁস্-ফাঁস দীর্ঘশ্বাসে শ্মশান ভ'রে গেল। শুষ্ক করোটির নাশারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হ'চ্ছে এলোমেলো বায়ু নানা শব্দে। সহসা শোকাতুরা রমণীর করুণ ক্রন্দনে শ্মশান মুখরিত হল। নানা ভীতিজনক শব্দে ভক্তদ্বয় ভীত হ'লেন। তাঁদের এখন এমন সাহস ও শক্তি নেই যে, আসন ত্যাগ ক'রে ছুটে পালাবেন। আমাতে আমি নেই এই ভাবনার মধ্যে তাঁরা মনে-প্রাণে তারামাকে স্মরণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা দেহাত্মবোধ হারিয়ে ফেল্‌লেন। সহসা সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ভয়াবহ শ্মশান তখন এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে শান্তরূপ ধারণ ক'রলো; এ যেন হিমাঙ্গ রোগীর শেষ প্রয়াণের শিথিলতা। শ্মশান বিভূতি আরম্ভ হ'ল, শিবা ও কুকুর শ্মশান ছেড়ে গ্রামে প্রবেশ ক'রলো। থমথমে বিষাদভাবে

আকুলি-বিকুলি প্রাণের যাতনা অসহ্য হয়ে উঠলো। যাঁরা সাহসী বীর পুরুষ, তাঁদের কাছে ভুত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই কিন্তু, যাঁদের প্রাণে ভয় আছে তাঁদের কাছে ভুত-প্রেত আছে আলোক ছায়ায় কাল্পনিক মূর্ত্তিতে। অসংখ্য ছায়া মূর্ত্তি যেন তাঁদের ঘন ঘন প্রদক্ষিণ ক'রছে গাঢ় আঁধারে। তারা যেন সঙ্কেতে হাত নেড়ে ডাকছে দলভারি করবার জন্যে। কাণের কাছে কারা যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছে। অদূরে বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ নিনাদে মহাশ্মশান প্রকম্পিত হ'ল। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার নানা শব্দে শ্মশান মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো। এলোমেলো উষ্ণ বায়ু উৎকট পচাগন্ধে আবার কখন সুমিষ্ট বন পুষ্পের গন্ধে শ্মশান মাতোয়ারা ক'রলো। এইভাবে চল্‌লো ভক্তদ্বয়ের পরীক্ষা বিক্ষিপ্ত শবের মাঝে। পরীক্ষার কি শেষ নেই ? মৃত্যু ঘটলেই যে জীবের পরীক্ষা শেষ হয়, তা হয় না। পরীক্ষাই যেন লীলা তত্বের প্রহসন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল কর্ম্মফল ভোগ করান। কর্ম্মফল অবসানে জীব পায় মুক্তি চিরতরে। যাঁরা মুক্ত পুরুষ সম সুখ সম দুঃখী, তাঁরা ভয় পান না পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে।

রাত্র প্রায় শেষ প্রহর, দুলছে লতাপাতার কোমলপত্র ফুর ফুরে দখিন বাতাসে। কি জানি কি দেখে, কার ইঙ্গিতে কি আকর্ষণে, আসন ত্যাগ ক'রে ছুটে পালালেন মহানন্দ গিরি মহারাজের সহকর্মী শ্মশানের মর্ম্মস্থলে। কি যে ঘটে গেল কতকটা অনুমান করলেও শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ মত মহানন্দ গিরি মহারাজ আসন ত্যাগ না ক'রে উপবিষ্ট রইলেন। নদীর পরপারে শিবা ডেকে উঠলো, জানিয়ে দিল মহানিশার অবসান। নড়ে উঠলো তরুর শাখা প্রশাখা হনুমানের কিচ্‌মিচ শব্দের সঙ্গে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে শকুন ডানা ঝাড়া দিলে একের পরে একে বৃক্ষশাখে। প্রভাতী আগমনে পক্ষী কুলের কুজনে শ্মশান মুখরিত হ'ল। সহসা কোথা হতে এল এক অপরিচ্ছন্ন কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় মহানন্দ গিরির আসনের কাছে। আলুথালু তার কেশ গুচ্ছ ধূলা-মাটি মাখা, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় উদাসীর ন্যায় ভাব গভীর ও কটাক্ষপূর্ণ। দুই ক'রে দুটি নর অস্থি নিয়ে খট্ খট্ শব্দ ক'রে সে নৃত্য করছে ও বলছে, "মাকুর মাকুর"। লোকটি পাগল এই ভাব নিয়ে মহানন্দ গিরি মহারাজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। প্রভাতের আলো দেখা দিতে সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজ শিষ্যের খোঁজে সেই স্থানে উপস্থিত হ'লেন। তিনি এই পাগলের উদ্দাম নৃত্য দেখে, তার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। কিছুমাত্র ভীত না হয়ে পাগল তাঁর আরো নিকটে এসে উচ্চ কণ্ঠে "মাকুর—মাকুর" বলে নৃত্য ক'রতে লাগলো। সূর্য্যানন্দ

গিরি মহারাজ বলপূর্ব্বক তার হস্ত চেপে ধরে উচ্চৈস্বরে বল্লেন, "মা কুরু, মা কুরু, মা কুরু।" এই কথা শোনা মাত্র পাগল "য়্যাঁ" শব্দ উচ্চারণ ক'রে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়লো। সস্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি বল্লেন, "যাও, শুধু মায়ের নাম কর আর যেন শব সাধনা করো না।" সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে সে চলে গেল। শিষ্যের অনুরোধে গুরু বল্লেন, "ও মায়ের ভক্ত, এই শ্মশানে উত্তর সাধক না নিয়ে একা শব সাধনায় রত ছিল। শবের পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় যখন শ্মশান বিভূতি আরম্ভ হয় সেই সময় শব উপদ্রব আরম্ভ করে। ও তখন ভীত হয়ে ছিল 'মা কুরু'র পরিবর্ত্তে মাকুর মন্ত্রোচ্চারণ করে। এই অবস্থায় ভৈরব শূন্য হতে তিনবার মন্ত্র সংশোধন করে দেন কিন্তু ও তখন এত ভীত যে ভৈরবের সতর্ক বাণী ওর কর্ণে প্রবেশ ক'রলো না। শেষে শব ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে নদীর বালুচরে নিক্ষেপ করে। তাই ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছিল।" শ্রীগুরুর আদেশে মহানন্দগিরি মহারাজ আসন ত্যাগ ক'রে মায়ের মন্দিরে গেলেন। সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে গুরু ও শিষ্য তারাপীঠ ত্যাগ ক'রে বহরমপুরের মধ্য দিয়ে কামরূপ কামাখ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

নিয়ত চক্রের মত ঘুরায়োনা আর।
যোনি রূপে বিরাজিছ জীবের আধার॥
রহস্য যোনির এই কুণ্ড মধ্যে রয়।
ম কারে ঐ বিন্দুরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
প্রেমে এই রহস্য লীলা সৃষ্টির কারণ।
হংসধ্বনি বক্ষ মধ্যে মায়াতে ধারণ॥
যুক্ত ভাবে মুক্ত জীব জ্ঞান মার্গে ধায়।
হংস হংসী একে মিলে ক'রে কেলি তায়॥
তোমার শক্তিতে ঘটে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
সকলই তোমার ইচ্ছা নাহিক সংশয়॥
পরমা বৈষ্ণবী তুমি কভু নিরাকারা।
আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ি ইচ্ছায় সাকারা॥
পুরুষ প্রকৃতিরূপে সৃষ্টি কর জীবে।
হুংকারে ফাটাও বীজ লয় পুনঃ শিবে
আদি অন্ত চক্রাকার তুমিই আধার।
সাকারে পূজিত হও যোগে নিরাকার॥

স্থষ্টির আধার হ'য়ে স্থিতি লয়কারী।
সাকারে পুরুষ হও শক্তিরূপে নারী ॥

সতীদেবীর নিষ্প্রাণ দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। সতী মায়ের মহাযোনি আসাম প্রদেশে কামরূপ কামাখ্যায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নীল গিরি পর্ব্বত শিখরে পতিত হয়। প্রবাদ আছে মাতৃ সাধকেরা যদি ভক্তি ভরে, এই মহাযোনি পূজা এবং স্পর্শ করেন তাহলে তাঁরা আর বারে বার যোনি প্রাপ্ত হন না। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব'লতেন, "ওরে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ কর্ তবে ভগবান বা মোক্ষ পাবি।" কামরূপ অর্থে বহুরূপী কামনা-বাসনার শেষ নেই। কামনা পূর্ণ হয় এই পবিত্র স্থানে তাই নাম হয়েছে কামাখ্যা। যে সাধক মোক্ষ কামনা নিয়ে এই পবিত্র যোনি পূজা এবং স্পর্শ করেন একমাত্র তিনিই মায়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। জীবের কামনা বাসনা যত বাড়ে সেই কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে সে তত সংখ্যক বার জন্মও মৃত্যু ভোগ করে।

(৭)

চলেছেন গুরু ও শিষ্য ইয়ারুবক্ সেকটাই দিয়ে অরণ্যাবৃত জন—মানবহীন কুকী পাহাড়ে। হঠাৎ গুরু, শিষ্যকে ত্যাগ করে অন্যপথ ধরলেন, যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, "পুনরায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে ঠাঙ্গাইল বস্তিতে। অজানা পথে অগ্রসর হলেন শিষ্য নাগা পথচারীদের অনুসরণ ক'রে। ফল-পাকড় কিছুই মেলে না সেখানে তাই সঙ্গে নিয়েছেন মহানন্দগিরি মহারাজ চাল গুঁড়ি ও শুকনো কচু শাক। পথে শুক্‌নো পাতায় আগুন ধরিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেবা করেন তিনি দিনান্তে একবার। পেমবন বস্তি পার হয়ে যখন বড় জঙ্গলের নিকট তিনি উপস্থিত হলেন তখন পাগডাণ্ডীর পথ হারিয়ে ফেলে গো-চারণের পাগডাণ্ডীতে উপস্থিত হলেন। এই অরণ্যময় পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে নাই জন মানবের সাড়া শব্দ, শুধু খাঁ-খাঁ ক'রছে দিগ্-দিগন্তর বিভীষিকায়। নিস্তর নিঝুম অবস্থা দৃষ্টিপথে, একমাত্র পথহারা পথিক ব্যতীত নাই অন্য কোন প্রাণীর স্পন্দন। বুকভরা হতাশায় ক্ষীণ হ'ল আশার প্রদীপ নিমেষে। নির্জ্জন নিস্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশে চলেছেন শিষ্য নিঃসঙ্গভাবে বিহ্বল চিত্তে। রহস্যময়ী প্রকৃতি দেবীর মোহিনী রূপের আড়ালে ঘটে যায় কত সন্ত্রাস, কত উদ্বেগ, কত বিড়ম্বনা দৈনন্দিন লোক চক্ষুর অন্তরালে। মহানন্দগিরি মহারাজের শ্রান্ত অবশ দেহ ও সন্ত্রস্ত মন, উদ্বেগে

উৎক্ষিপ্ত হ'ল। ঠাঁই নাই জনশূন্য অরণ্যময় এই ভীতিজনক পর্ব্বতে, জীবন রক্ষার্থে কোন ঠাঁই নাই। দৃষ্টিপথে গভীর অরণ্য ব্যতীত কোন নিরাপদ স্থান নাই। সাপের মত আঁকা বাঁকা বন্ধুর অরণ্যময় পথে যখন তিনি এগিয়ে চলেছেন সেই সময় এক বৃহৎ অজগর মন্থর গতিতে পথ অতিক্রম করে বন হ'তে বনান্তরে গমন ক'রলো। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে, গায়ের রোঁয়া খাড়া হ'য়ে উঠে সন্ত্রাসে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল তবুও মিললোনা বস্তীর সন্ধান। অস্তমিত রাঙ্গা তপনকে হঠাৎ এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘে আবৃত করলো। দেখতে দেখতে পশ্চিম গগন কাল মেঘে ছেয়ে গেল। শীতল বায়ুর স্পর্শে নিঝুমের স্পন্দন দেখা দিল। নড়ে উঠলো লতা পাতা সজীব হয়ে। শ্রান্ত হলেও মহারাজ দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। কোথা চলেছেন তা তিনি জানেন না, তবুও পথ বেয়ে চলেছেন তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। সাধনার প্রারম্ভে আসে নানা বাধা-বিঘ্ন, ভয়-ভাবনা, সন্দেহ ও হতাশা পরীক্ষার অজুহাতে। এসব পিছু ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসা চলবেনা; অতীতে ফিরে যাওয়া হবেনা। বিফলতাই আনে সফলতা, ধৈর্য্যই তার মূল কারণ। এই ধৈর্য্যই একদিন এগিয়ে নিয়ে যাবে সাধককে আঁধার হ'তে আলোয় এবং আলো হ'তে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ জ্যোতির সমীক্ষে। এই অখণ্ড বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিই প্রেমে মণ্ডিত চিদানন্দ স্বরূপ। সেখানে নাই আমি—আমার ভাবনা বা ভয়। সবই তুমি, আমি কিছু নয়, তোমাতেই তুমি সব হও; তাই আদি-অন্তহীন তুমি, তোমাতেই সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় হয়। তবে কেন করি ভাবনা ও ভয়, পাঁকে যখন পড়েছি, পাঁক মাখতেই হবে, পেছিয়ে এলে পাঁক আরো লেপ্টে ধরবে, এগিয়ে গেলে জলে ধুয়ে যাবে।

হঠাৎ মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শুনে এবং সৌদামিনীর চক্‌-চকে বক্রহাঁসি দেখে মহারাজের বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। এ যেন নিদান সময়ের চরম সঙ্কেত। লেংটী, লোটা ও কম্বল সার সাধুর বোধ হয় আজ উৎকট পরীক্ষা। ফলাফলের সিদ্ধান্ত হবে যবনিকার অন্তরালে। মায়া, একটি মাত্র মায়া, দেহাত্মবোধ জড়িত জীবনের মায়া। এই মায়াই হ'ল পরীক্ষার মূল কারণ। যত মায়া বাড়বে ততই কষ্ট পেতে হবে। মায়া যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, এই মায়াই তো মহামায়া মা নিজে। আমি যখন তাঁর সন্তান তবে মায়াকে কেন করি ভয়? মা ব'লে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। মা বুলি শুনতে যে তিনি ভালবাসেন। ছেলে যতই কুকর্ম্ম করুক না কেন তবু মা ব'লে ডাকলে তাঁর স্নেহ-বাৎসল্য ভাব নিশ্চয়ই জেগে উঠবে—

মা-মা-মা। তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, কালী তারা, কৃষ্ণ—রাম যেই হও না কেন, আমি তোমার সন্তান, তুমিই আমার মা, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, জানতেও চাই না। জন্মাবার সময় যে বীজ মন্ত্র মা, বুলি তুমি শিখিয়ে পাঠিয়েছ, যে বুলি শোকে-তাপে, দুঃখ-কষ্টে এমন কি পৃথিবী ত্যাগ করবার পূর্ব্বে আপনা হ'তে নিঃসাড়ে মুখ হ'তে বেরিয়ে আসে সেই মা, বুলিই আমার কাছে অমৃতাপেক্ষাও শ্রেয় এবং অন্য বুলি এ বুলির তুলনায় অতি তুচ্ছ ও অতি হেয়। জন্ম-জন্মান্তরের মজ্জাগত তোমার শেখান মা বুলি যে ভুলতে পারি না তাই অন্য বুলি মুখে সরে না। একেই বলে মায়ের কাছে বুলির মাধ্যমে সন্তানের আত্ম নিবেদন।

নানা বিঘ্ন ও উপদ্রবে মহারাজের জীবন অতীষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। দেখা যাক্ এখন মা হারে, কি ছেলে হারে। "তাইতো কি করি কোথা যাই, কেমনে প্রাণ বাঁচাই, কোন কি ঠাঁই নাই? কে আছ রক্ষা কর।" আবেগে এই কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন। কারো সাড়া শব্দ এলনা শুধু প্রতিধ্বনি হ'ল, "কে আছ রক্ষা কর।" ক্ষণকাল পরে আবৃত হ'ল, অরণ্যময় পর্ব্বতমালা গাঢ় অন্ধকারে। দানবদৈত্যের ন্যায় তরুরাজি খল্ খল্ ক'রে হেঁসে উঠলো। কৃষ্ণবর্ণ-বিস্তীর্ণ মেঘে পিশাচের কদাকার দন্তপংক্তি কড়্-মড়্ শব্দ করে ভয় দেখাল। নামলো বৃষ্টি মুষলধারে। গায়ের কম্বল ভিজে গিয়ে ভারী হ'ল, বোঝার উপর বোঝা বাড়লো। শীতল জল-স্পর্শে মহারাজ ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। "এই বিপদে আমার আপনার কি কেউ নেই? দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-রিপু তারা কি আমার আপন নয়? কালের ধর্ম্মানুযায়ী যে যার, সে তার, সবাই স্বার্থপর। তবে 'কে আমি?' কোথায় আমি? কেন আমি? কোন সাড়া নেই তবে বৃথা কেন আমি, আমার ভেবে অভিমান করি। আমি-আমার বলে কিছু নেই, সবই তুমি, সবই তোমার তাই তোমার মধ্যে রয়েছে আমার আমি মায়ার পর পারে।" ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবী শূন্যের মাঝে ঘুরছে যুগ যুগ ধ'রে চঞ্চল হ'য়ে। একদিন সে হবে নিশ্চল, অচঞ্চল কেন্দ্র হ'তে বিচ্যুত হয়ে। তুমিই একমাত্র সার আর সব অসার। এই হ'ল "অহং ব্রহ্মোস্মি" হ'তে "সোঽহং" জ্ঞানলাভ। আর কোন উপায় না পেয়ে মহারাজ "জয় মা তারা" উচ্চারণ করে মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রলেন। যাঁর দেওয়া দেহ মন প্রাণ, তাঁর চরণে নিবেদন করাই হ'ল আত্মসমর্পণ। সাধকের এই অবস্থায় প্রয়োজন হয় না, আসন, আচমন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা।

এই বারেতে সার বুঝেছি,
তারানামে মন সঁপেছি।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুত ব্যোমে
এই পঞ্চভূতে ধরে যমে,
যাক্‌না ঘুচে এ তুচ্ছ কায়া
মায়ের পায়ে মন ঢেলেছি॥
এই দেহেতে আছে ছয়জন
যমের তারা হয় গো স্বজন
ওরা নানা ছলে মায়ায় ফেলে
তাই নামে মন দিয়েছি॥
এ দাস বলে ওমা তারা
দশ ইন্দ্রিয়ে করে সারা
ভেঙ্গে চুরে দেয় যে কায়া
মনটা এবার যায় বুঝি॥

জীবন-মরণ সংগ্রামে যখন মানুষের সব চেষ্টা, সব বুদ্ধি পণ্ড হ'য়ে যায় তখন হতাশার মাঝে তার মনে উদয় হয় নির্ভরতা। মনে তখন তার সতত জাগে আমি কিছু নয়, সবই তুমি, তুমি ইচ্ছাময়ি, তাই ইচ্ছা ক'রলে রাখতেও পার আবার মেরে ফেলতেও পার। এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর মা। প্রাণ যায় যাক্ তাতে দুঃখ নাই; তোমার দেওয়া প্রাণ, তুমি নেবে, এ তো এমন কিছু বড় কথা নয়, কিন্তু মাগো, যাতনা আর দিওনা; মায়ার কবলে ফেলে দগ্ধে-দগ্ধে আর মেরোনা। সন্তান যদি কর্ম্মদোষে পাপী তাপী হয়, তবুও সেই কর্ম্ম এবং সন্তান তোমারই সৃষ্টি। লীলাময়ী এখন যা তোমার ইচ্ছা তাই কর মা।

ঘন-ঘটা আঁধারে সেই দুর্যোগে বনের মধ্যে ভিজে কম্বল কাঁধে নিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছেন মহারাজ উলুবন ভেদ করে। পাথরে হোঁচট খেয়ে পায়ের আঙ্গুল থেঁতো হ'য়ে গেল। এই অবস্থায় তিনি হাঁমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন এক গর্তের মধ্যে। উত্থান শক্তি তাঁর রহিত হ'ল, আঘাত পেয়ে চোখের কোণে জল দেখা দিল। জীবন মৃত্যু এ পরীক্ষা; পরীক্ষার ছলে জীব হয় খাঁটী বারে বার দগ্ধানীতে।

"যে ক'রে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ।

তাতেও যদি না ছাড়ে আশ
মিটাই তার মনোবাস ॥”

মা হ'য়ে যদি তুমি সন্তানকে দ'গ্ধে মারতে চাও তবে তাই কর। দেখা যাক্ শেষ অবধি মা হারে কি ছেলে হারে? আসন্ন মৃত্যুর এ কঠোর পরীক্ষার সন্ধিস্থলে রয়েছে অভিসারে স্নেহ ও দাবীর অবদান। এই নিগূঢ় সম্বন্ধে হবে ব্যবধানের চির অবসান। কষ্ট না করলে কি কৃষ্ণ লাভ হয়? আঁধার না থাকলে জ্যোতি বিকাশ পায় না। আধারই আঁধার ব'লে জ্যোতির প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হতাশার মাঝে সহসা ফুটে উঠলো দৃঢ় নির্ভরতা মহারাজের ভঙ্গুর মনে। আবেগভরে উচ্চকণ্ঠে তিনি বল্লেন, “মাগো! মায়াবিনী রাক্ষসী হ'য়ে যদি পবিত্র স্নেহ বাৎসল্যভাবে কালি দিতে চাও, তবে তাই দাও! আর তোমায় ত্রি-তাপ নাশিনী তারা মাতেশ্বরী না ব'লে এইবার কালী বলে ডাকবো।”

“ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎ স্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥”
(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

হে দেবি! তুমি (ব্রাহ্মীরূপে) এই জগৎ সৃষ্টি কর। তুমি (বৈষ্ণবীরূপে) উহা পালন কর এবং অন্তে তুমি (রৌদ্রীরূপে) উহা ভক্ষণ কর॥

“মাগো! তুমি ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছাই তুমি পূর্ণ কর; বিল্বমঙ্গল, সে তার চোখ উপড়ে ফেলে অন্ধ হ'য়ে যেমন হাতড়ে হাতড়ে চলতো আমিও সেই রকম হাতড়ে হাতড়ে চলবো, তবু চলা ছাড়বো না। মাগো, তোমার যেথা ইচ্ছা সেথা নিয়ে চলো।” আপন মনে এই কথা ব'লে গর্ত্ত হ'তে উঠে মহারাজ উলুবনের মধ্য দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে অগ্রসর হলেন। কিছু পথ অগ্রসর হবার পর তাঁর পায়ে ভাল পথ ঠেকলো। উল্লাস ভরে তিনি চিৎকার ক'রে বল্লেন, “মায়ের কৃপায় ভাল পথ পেয়েছি; তবে আর ভাবনা কি? জয় তারা মাতেশ্বরী।” মায়ের কি অসীম কৃপা, অনতিদূরে আগুন জ্বলছে দেখে তিনি ঐ দিকে অগ্রসর হলেন। নিবু নিবু ক্ষীণা আশার প্রদীপ আবার জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দু-চক্ষু হ'তে জল ঝরে পড়লো। আর একটু অগ্রসর হতেই তিনি দেখতে পেলেন বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের এক কোণে উঁচু টং বাঁধা একটি ঘাসের ঝপ্পর রয়েছে. তার মধ্যে একটি দ্বাদশ বৎসরের বালক আগুন পোয়াচ্ছে। “তারা মাতেশ্বরী” উচ্চারণ করে যখন মহারাজ টং বাঁধা

ছপ্পরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন সেই সময় একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা, "কে এল, কোথা হতে এল ?" বল্লে ছুটে এসে মহারাজের হাত ধ'রলো। বালিকার পরণে কাদা মাখা লাল শাড়ী, আলুথালু পিঙ্গল বর্ণের কেশদাম সর্পফণার ন্যায় দোদুল্যমানা। শ্যামবর্ণা লাবণ্যময়ী মুখ মণ্ডলে স্মিতহাস্য পূর্ণ। তার আবেগ ভরা সরল ভাষা বেশ স্মরণ করিয়ে দেয় যেন স্নেহ নিদর্শনে মহারাজের মৃতা জননী মূর্ত্তিমতী হয়েছেন। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজ কাতর স্বরে বল্লেন, "মা, আমি পথ হারিয়েছি।" এই কথা শুনে বালিকা বল্লে, "ও, তুমি বুঝি বস্তিতে যাবে ? বস্তি যে এখান হতে অনেক দূরে। তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমাদের কাছে থাকবে।" হাত ধরে বালিকা, মহারাজকে ছপ্পরের মধ্যে নিয়ে এসে টঙ্গের উপর হ'তে একটি শুক্‌নো কম্বল নামিয়ে দিয়ে মহারাজের ভিজে কম্বলটি টঙ্গে শুকোতে দিল। তার আদর যত্নে মুগ্ধ হ'য়ে মহারাজ স্বর্গীয়া জননীর শোকে কাতর হলেন। ভগবান যে কখন কাকে, কি রূপে, কি ভাবে যে কৃপা করেন তা বলা কঠিন। কচু ও ভুট্টা পুড়িয়ে, কাঁচা লঙ্কা ও নুন দিয়ে মেখে বালিকা মহারাজকে সেবা ক'রতে দিলে। ক্ষুধার তাড়নায় মহারাজ সেবা ক'রে বাঁশের চোঙ্গায় জল পান ক'রলেন। কন্যারূপী মা, সন্তানকে পরিতৃপ্ত ভাবে ভোজন করিয়ে বিশ্রামের জন্যে হোক্‌লা বিছিয়ে দিল। তার এত দরদ দেখে মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "এইটুকু মেয়ের এত স্নেহ ও দরদ কি ক'রে সম্ভব হয় ?" ভগবানের সৃষ্ট জগতে অসম্ভব কিছু নেই, সবই সম্ভব। আমি যে কাজ পারি না সে কাজ অন্য কেউ পারবেনা এ যুক্তি মনে পোষণ করা ধৃষ্টতা মাত্র। এ জগতে সবই সম্ভব—অসম্ভব কিছু নেই, আমি আমার অহংকারেই আমরা সম্ভবকে অসম্ভব ভাবি।

কন্যারূপী মা, সন্তানকে আদর ক'রে বল্লে, "অনেক রাত হয়েছে এইবার শুয়ে পড়। যদি কিছু দরকার হয় বা ভয় পাও তাহলে আমায় ডেকো।" এই কথা ব'লে বালককে সঙ্গে নিয়ে অনতিদূরে ছপ্পরের অন্য প্রান্তে বালিকা শয়ন করলো। অচিরেই মহারাজ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হ'লেন। সারারাত কেটে গেল তাঁর নির্ভয় নিশ্চিন্তে। সূর্য্যরশ্মি যখন মুখে পড়লো তখন মহারাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি দেখলেন, সেখানে নেই কোন ছপ্পর, বালা বা বালক। উলুঘাসই তাঁর সুখ শয্যা, তরুর বিস্তীর্ণ বাহুই—ছপ্পর, মহামায়া মায়ের কৃপাই বালা ও কাল হ'ল বালক। চু-চক্ষু মর্দ্দন

ক'রে চারিদিক দেখে, আপন মনে তিনি বল্লেন, "একি প্রত্যক্ষ্যের অবসাদ না দৃষ্টির ভ্রম? আমি কি তবে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছিলাম? তাই হবে।" মায়ে ছেলে লুকোচুরী খেলা, আত্মা ও পরমাত্মায় রসলীলা। মা চায় আমি লুকিয়ে থাকি, ছেলে আমায় খুঁজে বার করুক। যা সহজে পাওয়া যায় না তাই পাওয়াই হল সিদ্ধিলাভ। মায়া অবলম্বনে চলেছে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় চক্রাকারে। এই তত্ত্বের আদিও নেই, অন্তও নেই, তাই বলা হয় অনাদি-অনন্ত। কৃপাময়ি মা, ধন্য তোমার লীলা। জয় তারা মাতেশ্বরী, ব'লে মহারাজ ঐ স্থান ত্যাগ ক'রলেন। "ঠাঙ্গাল বস্তীতে যেতে হবে, জানি না কোন্‌দিকে কতদূরে? তারা মাতেশ্বরীর নামে যখন গা ভাসিয়েছি তখন স্রোতের টানে যাক্ ভেসে এ তুচ্ছ দেহ-মন-প্রাণ তাঁর খুসী মত। নাম যখন পেয়েছি তখন ঠিক যাবো নামেই ত্বরে, নামীর কাছে।" এই কথা ব'লে মহারাজ ধানক্ষেত পার হ'য়ে গেলেন। যখন তিনি গো-চারণের মাঠে উপস্থিত হ'লেন সেই সময় তাঁর শ্রীগুরু সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। "এত দেরী হ'ল কেন, পথ হারিয়ে ফেলেছিলে বুঝি?" শ্রীগুরু মুখে এই বাণী শুনে, তিনি সজল নয়নে পদ-যুগল স্পর্শ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন। উপযুক্ত শিষ্যকে আদর ক'রে বুকে তুলে নিয়ে আশীষ দিলেন গুরু সর্ব্বান্তকরণে। কলির জীবের পক্ষে যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়, একমাত্র গুরু ভক্তিই সিদ্ধিলাভের প্রধান সহায়ক। গুরু ভক্তি ছাড়া জীবের মুক্তি নেই তাতে সে যতই কৃচ্ছ সাধনা করুক না কেন, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

> "জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি
> ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি॥
> গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখেন কখন।
> তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥"
>
> (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মুক্তিদাতা এই জ্ঞান যখন শিষ্যের মনে পরিস্ফুট হয় তখন সিদ্ধিলাভ ঘটে। মহাপুরুষদের জীবন-দর্শনে একমাত্র তীব্র গুরু ভক্তিই বৈশিষ্ট্য রূপে মুক্ত জীবনের আলোকপাত করে। গুরু তুচ্ছ নর নন, দেবতা। মহাপুরুষদের জীবনী লোকোত্তরীয় এবং তীব্র গুরু ভক্তিতে মণ্ডিত। এরূপ আদর্শনীয় গুরু ভক্তি, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত পরম যোগী কাটিয়া বাবার নাম উল্লেখযোগ্য।* অমৃত সহর হ'তে প্রায়

সচলশিব ত্রৈলঙ্গ স্বামী

আবির্ভাব — পৌষ ১০১৪ সাল
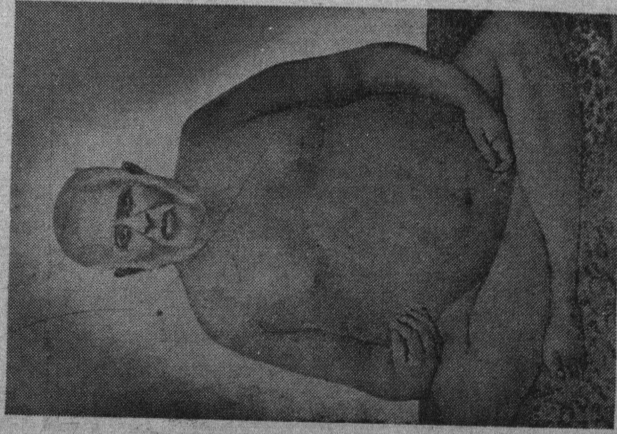
তিরোভাব — ১২৯৪ সাল
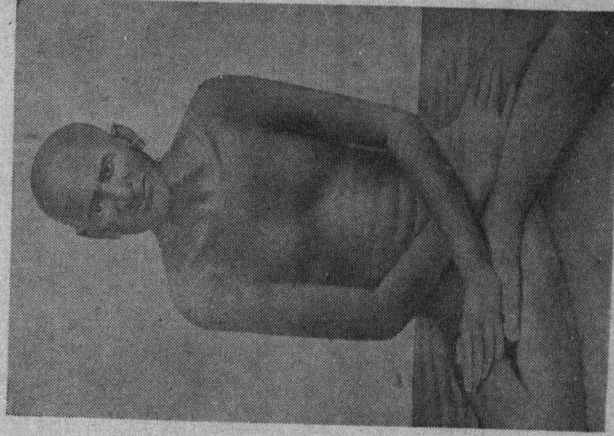
শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী

আবির্ভাব — ১২৪০ সাল

তিরোভাব ২৫শে আষাঢ় — ১৩০৬ সাল

পরমহংস মহানন্দ গিরি

আবির্ভাব মার্চ মাস — ১৮৪১ খৃঃ

তিরোভাব — ১লা এপ্রিল ১৯২৮ খৃঃ

পরমহংস মহানন্দ গিরি

পরমহংস ভবানন্দ গিরি

স্বামী বিমলানন্দ গিরি

তিরিশ ক্রোশ দূরে লোনা চামরি নামক গ্রামে এই মহাত্মার জন্ম হয়। বাল-বৈরাগ্য অবস্থায় তিনি ভারতের উত্তর খণ্ডে গঙ্গোত্রী পাহাড়ে উপস্থিত হন। সেই সময় একদিন পাহাড়ের কিছু নিম্নে এক গুহার মুখে একখণ্ড শিলা দণ্ডায়মান দেখেন। কি জানি কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় তিনি বলপূর্ব্বক শিলাটি গুম্ফের মুখ হ'তে স্থানচ্যুত ক'রলেন। শিলা নিঃসরণে এক বৃহৎ গুম্ফ দেখা গেল। নিঃশঙ্ক চিত্তে তিনি গুম্ফে প্রবেশ ক'রে দেখলেন এক অতি প্রাচীন সু-পক্ক জটা-জুটধারী বিরাট পুরুষ আসনে সমাসীন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রাচীন ঋষিতুল্য এবং মুদ্রিত নয়নদ্বয় ভ্রু ও লোল চর্ম্মে আবৃত। যোগী প্রবর সুদীর্ঘকাল এই গুহায় সমাধীস্থ রয়েছেন। হঠাৎ তাঁর সমাধি ভেঙ্গে গেল, তিনি নয়নের লোল পর্দ্দা অঙ্গুলী সাহায্যে উর্দ্ধে তুলে আগন্তুকের দিকে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টির কটাক্ষ দেখে আগন্তুক ভীত হ'য়ে গুহার বাহিরে এ'সে এই অপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় ক্ষুব্ধ হ'লেন। মহামানব গুহার বাহিরে এ'সে আগন্তুকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। দীর্ঘাকায় তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁর বপু, সুপক্ক দীর্ঘাকায় জটা এবং শ্মশ্রু ও গোঁফ আদিম যুগের ঋষির পরিচায়ক। তাঁর গম্ভীর প্রশান্ত মুখ মণ্ডলে পদ্ম-পলাশ লোচন দ্বয় হ'তে দীপ্ত জ্যোতি নির্গত হ'তে লাগলো। আগন্তুক এই দৃশ্যে সন্ত্রস্ত হ'য়ে কাঁপতে লাগলেন। মহামানব গম্ভীর স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি কে?" অতি সঙ্কোচে, ভয়ার্ত্ত চিত্তে আগন্তুক ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন, "আমি আপনার চেলা।" আগন্তুকের বাণী শ্রবণ ক'রে তিনি বল্লেন, "কি তুমি আমার চেলা? বেশ, তুমি আমার চেলা হওতো এই স্থান হ'তে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আমার আদেশ পালন কর।" কোনরূপ ইতস্ততঃ না ক'রে আগন্তুক 'জয়গুরু' উচ্চারণ ক'রে প্রায় ১০।১২ ফুট উচ্চ হ'তে শীতল জলে ঝাঁপ দিলেন। তুষার গলা জলে খরস্রোতে যখন তাঁর অবশ হিমাঙ্গ দেহ ভেসে চলে যাচ্ছে তখন সেই মহামানব সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারণ ক'রে আগন্তুকের মাথার ঝুঁটী ধারণ ক'রে উপরে তুলে নিয়ে এলেন। তাঁর শিরে কর স্থাপন ক'রে আশীষ দিয়ে মহামানব বল্লেন, "হ্যাঁ, তুমিই চেলা হবার উপযুক্ত কিন্তু, বৎস, ঋষির এই তপোভূমি ত্যাগ ক'রে নিম্নে যাও, সেখানে তুমি সিদ্ধ যোগী গুরুর কৃপা লাভ ক'রবে।" মহামানবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাৎ

* ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন চরিত তদীয় শিষ্য মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত॥

ক'রে তিনি নিয়ে এলেন এবং তাঁর আশীর্ব্বাদে এক সিদ্ধ যোগীর কৃপালাভ ক'রলেন।

"দর্শনাৎস্পর্শনাৎ কৃপয়া শিষ্য দেহকে।
জনয়েদ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকং॥
(যোগাবশিষ্ট)

কৃপা ক'রে যিনি দর্শন স্পর্শন ও শব্দের দ্বারা শিষ্যদেহে শুভতার উৎপাদন ক'রতে সমর্থ হন তিনিই গুরু।

(৮)

সচল শিব তৈলঙ্গ স্বামীর সাধন পীঠ, মানস সরোবর। ঝড়,বৃষ্টি, তুষারপাত, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, সব উপেক্ষা ক'রে তিনি কখন শীতল জলে কখন বা তুষারে বহুকাল কঠোর যোগ সাধনায় রত ছিলেন।* এই পবিত্র স্থানের অনতি দূরে নিয়ে, শ্মশানে যখন সর্পদংশনে মৃত, এক বিধবার একমাত্র পুত্রকে দাহ করবার জন্যে ঝিলে চাপান হয়, সেই সময় সহসা স্বামিজি সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে চিতায় শায়িত বালককে স্পর্শ করেন। সাক্ষাৎ শঙ্করের পবিত্র স্পর্শে মৃত পুত্রের প্রাণ সঞ্চার হ'ল, বালক সুস্থ দেহে চিতায় উঠে ব'সলো। অলৌকিক এই দৃশ্যে সবাই অবাক হ'ল যারা ছিল শ্মশানে। পাছে লোকে বিরক্ত করে সেই কারণে স্বামিজি যোগ শক্তির প্রভাবে চকিতে অদৃশ্য হলেন।

পরমগুরু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পবিত্র তপঃস্থান দর্শন করতে হবে. এই পবিত্র স্থান সনাতন আর্য্য ঋষিদের তপ.ভূমি। তাঁদের পদ রেণু শিরে স্থাপন ক'রতে হ'বে, তবে হ'বে জীবন সার্থক। অপার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হিমাচলের অংশবিশেষ নৈসর্গিক মনোরম এই পবিত্র ভূমি লীলাময়ের এক স্বপ্ন রাজ্য, আত্মজ্ঞান লাভের পরম যোগভূমি। মায়া এখানে নাই, কামনা বাসনা বিবর্জ্জিত এই মনোরম সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়ে দেয় স্রষ্টার কারি-গরির, চাতুর্য্য ও অপার করুণা। সৃষ্টি যদি হয় এত মনোমুগ্ধকর, না জানি তবে স্রষ্টা আরও কত সুন্দর ? মনোহর? দুর্গম এ পিচ্ছিল পথ চলে গিয়েছে তির্ব্বতের মধ্য দিয়ে উর্দ্ধে, ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থল মানস-সরোবরে। অদূরে তুষারাবৃত ধবল হিমালয়ের শৃঙ্গ রয়েছে দণ্ডায়মান্ ধীর-স্থির, প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হয়ে, উচ্চশিরে আকাশ ভেদ ক'রে। কত রয়েছে লোক-চক্ষুর

(* মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ও তত্ত্বোপদেশ, শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।)

অন্তরালে তাপস ঋষিদের তপঃ-গহ্বর এই নিশ্চল নিশ্চিন্ত পর্ব্বত মালায়। হর-পার্ব্বতীর লীলা বিলাসের প্রাণ কেন্দ্র কৈলাস শিখর, স্নেহ-বাৎসল্য, করুণা ও ঔদার্য্যে মণ্ডিত হ'য়ে, আবৃত রয়েছে শুভ্র তুষারে। বিরাট যোগী এই হিমালয়ের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভেসে যায় উদাসী মন দূরে-বহুদূরে সত্যের সন্ধানে। জাগ্রত সুশুপ্তির মাঝে এ যেন অলীক স্বপন, মনোময় গঠন, চাতুর্য্যপূর্ণ মাধুরী বিকশিত, রহস্যময়ী প্রকৃতি দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত।

অলক্ষ্য এক শক্তির প্রেরণায় চলেছেন মহানন্দগিরি মহারাজ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সানন্দে অধঃ হ'তে উর্দ্ধে পিচ্ছিল আঁকা-বাঁকা পথে হিমালয়ে, মানস সরোবর উদ্দেশ্যে। অজ্ঞাত সে দুর্গম পথ, পথের সন্ধান, একমাত্র তীব্র গুরু ভক্তিই পথ নির্দ্দেশক। শ্রীগুরুর কৃপায় কোন রকমে একবার সেখানে পৌছতে পারলে তবে হবে দুর্ল'ভ এ মনুষ্য জীবন সফল।

দেহের মধ্যে চারিটি সরোবর বিদ্যমান। নাভির নিম্নে অভ্যন্তরে কাম সরোবর ; বাম বক্ষে অভ্যন্তরে মানস সরোবর ; দক্ষিণ বক্ষে অভ্যন্তরে প্রেম সরোবর এবং মস্তকের অভ্যন্তরে সহস্রারে অক্ষয় সরোবরের অবস্থিতি শাস্ত্র উক্তি। কাম ও মানস এবং প্রেম ও অক্ষয় সরোবরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। ব্রহ্মপুত্র নদ অর্থাৎ শুষুম্নার মধ্যে রেবতী এবং রেবতীর মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। এই ব্রহ্মনাড়ীই ব্রহ্মপুত্র নদ রূপে বাস্তবে প্রকট হয়েছে। ওই ব্রহ্মনাড়ী মূলাধার হ'তে উত্থিত হ'য়ে উর্দ্ধে মিশেছে অক্ষয় সরোবরে। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে মন শক্তিবন্ত হ'য়ে কাম সরোবর পার হ'য়ে যখন মানস সরোবরে উপস্থিত হয় তখন থাকে না সরোবরে বিক্ষোভ এবং ইন্দ্রিয়ের বিকার। হংস পরমাত্ম স্বরূপ জীবাত্মা এবং হংসী হলেন বিদ্যা বা আদ্যাশক্তি তুল্যা কুল কুণ্ডলিনী শক্তি। পরস্পর সংযোজন ও বিয়োজনে তখন ভোগ করে মন বিশুদ্ধ আনন্দ বা প্রেম। বাস্তব দৃষ্টিতে যেমন মিলনে সুখ এবং বিরহে দুঃখ তেমনি কুণ্ডলিনী শক্তির সুশুপ্তিতে দুঃখ এবং জাগ্রতে সুখ। প্রেম সরোবরে হংস ও হংসীর কেলি বিকার বিহীন রসামৃত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

মানস সরোবরে উপস্থিত হ'য়ে মহারাজ আনন্দে মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। সনাতন আর্য্য ঋষি এবং পরম যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পদ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মেখে উল্লাস ভরে তিনি চিৎকার ক'রে বল্লেন, "মহা পীঠস্থানে পৌচেছি আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল।" এই মানস সরোবরই হ'ল সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর আসন, দিগ্‌বসন, কাল আচমন এবং ধ্যান ও ধারণা সমজ্ঞানে সমাহিত।

সন ১০১৪ সাল পৌষ মাসে এই শক্তিধর মহাত্মা আবির্ভূত হন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজনা হেলিয়ানগরে। পিতা নৃসিংহধর ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। মাতা, বিদ্যাবতী যেমনি দানশীলা এবং তেমনি ভক্তিমতী। দেহাভ্যন্তরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও জ্যোতির্লিঙ্গ এই ত্রিলিঙ্গ বিদ্যমান। এই লিঙ্গকে যাঁর মন ভেদ ক'রতে সমর্থ হয় তিনিই ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীধর।

কি আনন্দ, পরমানন্দ; মহানন্দগিরি মহারাজের চোখে—মুখে—সর্ব্বাঙ্গে যেন বিজুলীর ন্যায় আনন্দ খেলছে। আনন্দে তিনি মাতোয়ারা হ'য়ে কখন চিৎকার ক'রছেন তারা—মাতেশ্বরী ব'লে, কখন ছুটা-ছুটি ক'রছেন আবার কখন ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কন-কনে শীতের জড়াবস্থা বা শিথিলতা তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারলো না। একখণ্ড লেংটী সার সাধকের কম্বল কোথায় পড়ে আছে সে খেয়ালও তাঁর নেই আনন্দের আতিশয্যে। ঐকান্তিক ইচ্ছার উদ্দীপনাও তীব্র ভক্তির আবেশে তিনি শিশু সুলভ স্বভাবে বিজড়িত হ'লেন। কখন হাসি, কখন কান্না, কখন চঞ্চল, কখন স্থির হাব-ভাব তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগলো। এই ভাবে মানস সরোবরে কেটে গেল তাঁর কয়েকদিন সুখে সরলভাবে। ঐতো মস্তকে বিস্তীর্ণ রয়েছে নীলি আসন, তারা মাতেশ্বরীর শীতল কোল, ঐ আসনে ব'সতে হবে, তবেই ঘুচবে সকল জ্বালা চিরতরে। সময় বহে যায় আর বিলম্ব ক'রে গড়িমসি করলে, কাল হবে ব'লে অপেক্ষা ক'রলে কালেই ধরবে, তখন একুল ওকুল, দু-কুল হারাতে হবে। কাল আসে, কাল বহে যায়, তিলে তিলে আয়ুও সে ক্ষয় ক'রে নিয়ে যায়। কালের প্রতীক্ষায় থাকে, কুড়ে আশাবাদীরা, কাল প্রবঞ্চনায় কালে নিহিত হবার জন্যে। কর্ম্মময় এ জগৎ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কিছুই করা যায় না, কর্ম্মই যখন লীলার ধর্ম্ম তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে থাক মতি-গতি অচঞ্চল হয়ে।

পুঁতুল খেলা শেষ কর মন
থাকতে সময় ডাকনা।
আসবে শমন চুপি সাড়ে
ধর্ম্ম দণ্ড লয়ে করে
মায়ার বাঁধন যাবে ছিঁড়ে
ধরবে চেপে ছাড়বে না॥

তারা নাম জপরে মন
অন্তে পা'বে রাঙ্গাচরণ
শমন তখন যাবে টুটে
ধরতে তোমায় পারবে না।
এ দাস বলে ওমা তারা
করিসনে তোর চরণ ছাড়া
ওমা বাল্যকালে মাতৃহারা
ঐ মা বলা যেন ঘোচে না॥

মানস সরোবরে মহারাজ আসন স্থাপন ক'রলেন। এই আসনই তো সন্তানের নির্ভর যোগ্য স্থান, মায়ের কোল। মহারাজ যোগ সাধনায় ব্রতী হলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অতিবাহিত হ'ল। হিম বায়ু প্রবাহ, তুষার ঝড়-বৃষ্টিতেও তাঁর মনের স্থৈর্য্যভাব ভেঙ্গে প'ড়লো না। দেহের নিগ্রহ এবং মনঃ স্থিরতায় অচিরেই তিনি যোগ সংসিদ্ধি লাভ ক'রলেন। ঘোর কলির কলুষ-প্রভাব মুক্ত এই তপঃ ভূমি মহারাজের ত্যাগ করবার একটুও ইচ্ছা নেই কিন্তু, কলির জীবের অন্নগত প্রাণ; এই দুর্গম উপত্যকায় জীবন রক্ষার্থে কোনদিন কিছু আহার জোটে আবার কোনদিনই কিছুই জোটে না। অনিয়ম-অনাহারে তাঁর দেহের ক্ষয় হলেও মানসিক শান্তির একটুও ক্ষয় হয়নি। এক গভীর রাতে তাঁর দেহ যখন পেঁজা তুলার ন্যায় তুষারে আবৃত হয় সেই সময় তাঁর হঠাৎ সমাধি ভেঙ্গে গেল। তিনি এক গুরু গম্ভীর দৈব বাণী শুনতে পেলেন, "মহানন্দ! আসন ত্যাগ ক'রে নেমে যাও! যোগ সাধনার আর প্রয়োজন নেই; এইবার মায়ের পবিত্র নাম প্রচারে ব্রতী হও!" এই প্রত্যাদেশ পেয়ে মহারাজ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, তিনি আসন ত্যাগ ক'রে, 'বাবা-বাবা, ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন। ক্রমাগত চড়াই ও নামাই পথ ভ্রমণে এবং কোনদিন অর্দ্ধাহার বা উপবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। বহুদিন পর তিনি বাহারাইচ জেলার অন্তর্গত নেপালগঞ্জ এলাকায় তাঁর শিষ্য বিষ্ণুদাস নাজিরের কুটীরে উপস্থিত হলেন। প্রায় এক পক্ষ কাল শিষ্য গৃহে অবস্থানের পর তিনি দুর্ব্বল দেহে কিছু বল ফিরে পেলেন। ঐ সময় তাঁকে বেরিলী নিয়ে আসবার জন্যে তাঁর এক শিষ্য নাম শিবস্বরূপ নেপালগঞ্জে জগদম্বা প্রসাদকে পাঠালেন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল অযোধ্যা হ'য়ে কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থানের পর তিনি যাত্রা ক'রবেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যে গাড়ী বদল করায় পাছে কষ্ট হয় সেই কারণে ভক্তবৃন্দ ছোট লাইন দিয়ে

বারাণসী যাত্রার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন। ভগবানও ভক্তাধীন, তাই তিনি বাধ্য হ'লেন ভক্তবৃন্দের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে। অনেক সময় অনুরোধ উপরোধে, কর্ম্মক্ষেত্রে অপরের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে হয় বাধ্য হ'য়ে কিন্তু, তাতে অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হয় মনোমধ্যে। ইচ্ছাশক্তিকে বলপূর্ব্বক দমন ক'রলে তার প্রতিক্রিয়ায় ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। "অযোধ্যা যাওয়া হ'ল না, ত্যাগের চরম মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পেলাম না।" এই চিন্তায় মহারাজ ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনের তীব্র ইচ্ছা এবং প্রাণের ব্যথা প্রাণেই গেঁথে রইলো। কাশীধামে পৌঁছনোর পর কয়েক-দিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভাল হ'ল। সহসা একদিন বেরিলী হ'তে তারে সংবাদ এল শিবস্বরূপের নিকট হ'তে, "মহারাজ! বিলম্ব না ক'রে আপনি জগদম্বা প্রসাদের সঙ্গে সিধে বেরিলী যাত্রা করুন। এই সংবাদ পেয়ে মহারাজ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে আপন মনে বল্লেন, "আমার অযোধ্যা যাওয়া হ'ল না, তারা মাতেশ্বরীর রামরূপ আর দর্শন ক'রতে পেলাম না। মাগো! তুমি ইচ্ছাময়ী হলেও ভক্তাধীন তবে কেন মা, সন্তানের এই ইচ্ছা পূর্ণ ক'রলে না? হায় হায় আমার অযোধ্যা যাওয়া হ'ল না, শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেলাম না।" অযোধ্যা দর্শনের জন্যে মহারাজ ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়লেন।

"ভাবেন লভতে সর্ব্বং ভাবেন দেব দর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্।"

সাধন ভজন ইত্যাদির মধ্যে ভাবই সার বস্তু। ভাব ঘন হ'লে দর্শন স্পর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং সৎ ইচ্ছাপূর্ণ হয়।

(৯)

বেরিলী যেতে হবে, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে হবে। ইচ্ছাতেই যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় তখন তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরিলী যাত্রা করবার জন্যে মহারাজ, আজ নিত্যক্রিয়া সকাল সকাল সেরে নিয়েছেন। বেলা ৯টার সময় ট্রেন ছাড়বে তাই জগন্নাথ প্রসাদ, মহারাজকে নিয়ে মধ্যম শ্রেণী এক খালি কামরায় উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা বাজলো কিন্তু গার্ড সাহেব লাল নিশান দেখানোর জন্যে গাড়ী ছাড়লো না। গার্ড সাহেব লাল নিশান হাতে নিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এসে ড্রাইভারকে ডেকে বল্লেন; "ট্রেন ফৈজাবাদ হ'য়ে ঘুরে বেরিলী যাবে। তারে সংবাদ এসেছে প্রতাপ গড়ের সেতু প্লাবনে নড়ছে। এই সংবাদ যখন মহারাজ পেলেন তখন

তিনি আনন্দে তারা মায়ের উদ্দেশে বারে-বার প্রণাম ক'রতে লাগলেন। "মাগো, তারা মাতেশ্বরী ! এ অধম সন্তানের প্রতি তোমার কত কৃপা। তুমি যে মা, ভক্তাধীন সে প্রমাণ বারে বার পেয়েও তবু তোমাকে আমরা ভুলে যাই। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ ক'রবো এর চেয়েও আর আনন্দ কি হতে পারে ? পুলকে তাঁর প্রেমাশ্রু ঝ'রে পড়লো।

"ততো জগন্মগল মঙ্গলাত্মনাত্মনা।
বিধায় রামায়ণ কীর্ত্তিমুত্তমাং॥
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘুত্তমো।
রাজাধিবর্য্যৈ বপি সেবিতং যথা॥"

(শ্রীমদ্ রাম গীতা)

ভগবান রামচন্দ্র সেতু বন্ধন এবং রাক্ষসদের বধ ক'রে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রামায়ণ ঘটিত কীর্ত্তি সমাপন ক'রে লোকের জ্ঞান শিক্ষার জন্যে পূর্ব্বপুরুষ আচরিত যাগ-যজ্ঞাদি এবং জনক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিরা যে যোগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত ছিলেন তিনিও তদানুষ্ঠানে ব্রতী হ'লেন।

যখন ফৈজাবাদ ষ্টেশনে ট্রেন থামলো তখন জগদম্বা প্রসাদ, ফল ধোয়ার জন্যে প্ল্যাটফর্ম্মে জল আনতে গেলেন। মহারাজ তখন কামরায় সার্সী খুলে মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে একাগ্র মনে শ্রীরাম চন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ এক কান্তিময় নব-জলধর-ঘন-শ্যাম বালক তাঁর নজরে পড়লো। সেই অপরূপ বালকের শিরে চূড়া বাঁধা, কপালে ও নাশায় তিলক কাটা তাঁর এক করে কমণ্ডলু এবং অন্য করে শ্রীক্ষেত্র ধামের বক্র বেত বিদ্যমান। পরিধানে তাঁর পীতবাস, অর্দ্ধাংশ স্কন্ধে বিস্তৃত রয়েছে। গলে ও করে তুলসী মালা শোভিত। বালক সহাস্য বদনে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে মধু কণ্ঠে বল্লেন, "শিব শিব—শিব।" অবাক হয়ে দেখলেন মহারাজ, ত্যাগের চরম মূর্ত্তি, ছদ্মবেশী নারায়ণের অপরূপ রূপ। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকার পর, নিজেকে সংযত করে, আবেগ ভরে উত্তর দিলেন মহারাজ "আপনি তো সাক্ষাৎ রামজী।" "তুমিও তো শিবজী", এই কথা ব'লে বালক অদৃশ্য হ'লেন। জগন্নাথ প্রসাদ জল নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ছদ্মবেশী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ-পদ্ম স্পর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় মহারাজ "রামজী, রামজী", ব'লে কামরা হ'তে নেমে শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে, প্ল্যাট ফর্ম্মের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত অবধি ছুটাছুটী ক'রতে লাগলেন। গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো দেখে জগন্নাথ প্রসাদ মহারাজের হাত ধ'রে জোর

ক'রে গাড়ীতে তুলে নিলেন। ক্ষণকাল পরে গাড়ী ছাড়লো। বেঞ্চের এককোণে ঘাড় নিচু ক'রে ব'সে মহারাজ রামজীর চিন্তায় চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলেন।

শঙ্করো উবাচ :—

"দুর্ল ভা বৈষ্ণবী ভক্তির্ভাগধেয়ং বিশ্বেশ্বরি।
রকারাদিনী নামানি শৃণ্বতো মম পার্ব্বতি।
মনঃ প্রসন্নতামেতি রামনামাভি শঙ্করা।
রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।।"

শঙ্কর বলিলেন :—হে ঈশ্বরী। ভক্তি অতীব দুর্ল ভ বস্তু, ইহা সৌভাগ্য ব্যতীত ঘটে না। হে পার্ব্বতী! তুমি রকারাদি নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার মনের প্রসন্নতা লাভ হইবে। যোগীগণ অনন্ত সত্যানন্দ স্বরূপ যে চিদাত্মাতে রমণ করেন সেই চিদাত্মাই রাম, অতএব রাম শব্দে পর-ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছে।

"চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।"
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রাহ্মণো রূপ কল্পনা।।"

(শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ)

ব্রহ্মের কিরূপে শরীর সম্ভব হয়; তাহা শাস্ত্র বলিতেছেন, উপাসকগণের ধ্যানের নিমিত্ত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় অবিদ্যাদিদোষ পরিশূন্য অমূর্ত্ত ব্রহ্ম মায়িক রূপ পরিগ্রহণ পুরুষ. স্ত্রী, অঙ্গ ও অস্ত্রাদি শক্তি—শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চায়তন ভেদে, কল্পিত দেহেই সৈন্যাদি কল্পিত হয়।।

ইতি পূর্ব্বে মহারাজ যখন ফৈজাবাদে শিষ্য নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের (হেড্‌মাষ্টার) বাড়ী অবস্থান ক'রেছিলেন সেই সময় তিনি হনুমান গড়, কনক ভবন, ও স্বর্গদ্বার দর্শন ক'রেছিলেন কিন্তু. এরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন লাভ করেননি। শ্রীগুরু সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজ ব'লতেন, "বেড়াল যখন শীকার ধরে তখন তার দাঁতের ধারে টুঁটি ফুটো হ'য়ে যায় কিন্তু যখন তার নিজের ছানার টুঁটি ধ'রে একস্থান হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, তখন তার ছানার টুঁটিতে একটুও দাঁতের দাগ লাগে না।" ভক্তের কাছে তারামাতেশ্বরী ভক্তাধীন হ'লেও পাপীরা কিন্তু তাঁর শাসনাধীন। পাপীদের শাসন করবার জন্যে করুণাময়ি মা, শানিত খড়্গ ধারণ ক'রে আছেন। ভগবানের অনন্ত রূপ, তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু নির্ভর করে। তিনি

কখন্ যে কাকে কি রূপে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন তা কেউ ব'লতে পারে না। তবে একথাও সত্য যে, তাঁর সন্তান যে যতই পাপ করুক না কেন, সে যদি এক বার কাতরস্বরে প্রাণ ভ'রে মা, ব'লে ডাকে তাতে বেটী, তাকে কৃপা ক'রতে নিশ্চয়ই বাধ্য হয়। মায়ের জাত কিনা তাই সন্তানের প্রতি বেটির এত দরদ।

মা বলে ডেকে সুখ পাই।
ডাকি তাই মা-মা, সদাই॥

কি আছে কে জানে কত সুধাভরা
মা শব্দে নিহিত পূত স্নেহ ধারা
যখনই বলি মধু মা-মা বুলি
অশ্রুনীরে ভেসে যাই।

বাৎসল্য পরশে মাতৃত্ব বিকাশে
ঝরে অশ্রু মায়ের শ্রবণে হরষে
বিশুদ্ধ এ স্নেহ সন্তানে মোহ
স্নেহ-দাবীতে রত তাই।

বিশ্ব মাতৃত্বে এ বিশ্ব গড়া
সৃষ্টি স্থিতি লয়ে মা বুলি ভরা
শুধু মা-মা বুলি করে বলাবলি
জীব-জন্তু কীট সবাই॥

হঠাৎ মহারাজের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। কিছুই ভাল লাগে না তাই তিনি ছট-ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন, একবার ঠাকুর ঘর আবার ক্ষণকাল পরে দালানে। কেন এত মন চঞ্চল হচ্ছে, শোকের বারি চোখ হ'তে ঝরে পড়ছে। সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর গুপ্ত শিষ্য সিদ্ধ মহাপুরুষ সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজ কুম্ভমেলায় গোদাবরী নদীতে জল সমাধিতে দেহ রক্ষা করেছেন তাই মহারাজের মন মেজাজ খারাপ হয়েছে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি অদ্ভুত সম্বন্ধ বিদ্যমান। একের অভাবে অপরের খেদ, এবং পাপ-পুণ্যেও পরস্পরের সম্বন্ধ আংশিকতায় ভোগ্য। শিষ্যের পুণ্যে গুরুর উচ্চস্থানাধিকার এবং পাপে অধঃস্থান অপরিহার্য্য। তবে প্রকৃত তাপস গুরু অধিক সময় যিনি যোগে লিপ্ত থাকেন তিনিই একমাত্র হন না ফলভোগী পাপ-পূণ্য ইতর বিশেষ।

পৌরাণিক তথ্য সম্বলিত কুম্ভমেলা, স্কন্দ পুরাণে লিপি বদ্ধ রয়েছে বিশদভাবে। স্বর্গে যখন ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থন হয় তখন মন্দার পর্ব্বত মন্থন দণ্ড, বাসুকী সর্প রজ্জু, মহাকূর্ম্ম মন্থন পীঠ এবং শ্রীবিষ্ণুর বাহুদ্বয়কে মানদণ্ড

হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ বাসুকীর পশ্চাৎ ভাগ এবং সম্মুখ ভাগ ধারণ করে, বলি প্রভৃতি দৈত্যগণ। বাসুকীর মুখ হ'তে কালকূট নির্গত হওয়ায় তার উগ্র গন্ধে দেববৃন্দ এবং দৈত্যগণ মূৰ্চ্ছিত হলেন। পাছে মন্থন কার্য্য বন্ধ হ'য়ে যায় সেই কারণে দেবাদিদেব মহাদেব সেই কালকূট পান করেন। উগ্র বিষ-ক্রিয়ায় দেবাদিদেবের কণ্ঠ নীল হ'য়ে যায়, তাই তাঁর নাম হ'ল নীলকণ্ঠ। দেবাসুরের শক্তি প্রভাবে সমুদ্র মন্থনে পুষ্পকরথ (আকাশ যান), মণিময় রত্ন, ঐরাবত হস্তী, পারিজাতবৃক্ষ, বৃহৎ ধনু, পঞ্চ কামধেনু, (লক্ষ্মী, সুশীলা, সুরূপা, সুজনা ও সুরভি) উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, লক্ষ্মীদেবী, বিশ্বকর্ম্মা এবং ধন্বন্তরী উত্থিত হয়। ধন্বন্তরীর করে অমৃত কুম্ভ ধৃত ছিল। দেবতাদের ইঙ্গিতে, দৈত্যদের অমৃত হ'তে বঞ্চিত করবার জন্মে ইন্দ্রপুত্র বৈজয়ন্ত অমৃত কুম্ভ নিয়ে ছুটে পালালেন। দৈত্যকুল গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশে দৈত্যগণ বৈজয়ন্তের পিছু অনুসরণ করে। বৈজয়ন্ত দ্বাদশ দিন দিবারাত্র দশদিকে কুম্ভ নিয়ে ছুটাছুটী করেন। এই দ্বাদশ দিন দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলে এবং পরস্পর কাড়াকাড়িতে পৃথিবীতে চারিস্থানে চারিবার অমৃত কুম্ভ পতিত হয়। হরিদ্বার, নাসিক (গোদাবরী নদী), প্রয়াগ (গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে) এবং উজ্জয়িনী।

দেবতাদের দ্বাদশ দিন আমাদের দ্বাদশ বৎসর, তাই দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়।

শ্রীগুরু বাবার তিরোভাবে মহানন্দ গিরি মহারাজের স্বাস্থ্য ও মন ভেঙ্গে গেল। "এই তমোভাবাপন্ন পৃথিবী আর ভাল লাগে না। যিনি আপন হ'তেও আপন, অন্তরের অন্তর তাঁকে ছেড়ে কি ক'রে এই মোহময় জগতে থাকি? এমন ক'রে বুকে টেনে নিয়ে আর তো কেউ আঁধারে আলো দেখাবেনা। না—না এ জগতে আমার আর থাকা উচিত নয়।" এইসব নানা চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে, শোকার্ত্ত হৃদয়ে মহারাজ, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী হ'তে রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সহর নিবাসী তাঁর ভক্ত শ্রীপাপারাজুর বাড়ীতে উঠলেন। মহারাজের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ দেখে, ভক্ত পাপাজুর তাঁকে সন্তোষ দেবার জন্মে সেবায় তৎপর হলেন। মন একবার ভেঙ্গে গেলে তাকে জোড়া দেওয়া খুবই কঠিন। যদিও কর্ম্মময় জগৎ, একটির পর একটি, স্তরে স্তরে ভগ্নস্থানকে আবৃত করে কিন্তু, ক্ষত ঠিকই থাকে অনুপাতে কম বা বেশী। মহারাজ গুরুশোকে কাতর হ'লেও তাঁর নির্দ্দেশ, ভক্তি সহকারে পালন করেন নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। শ্রীগুরু বাবা দেহত্যাগ ক'রলেও তাঁর মৃত্যু নেই—তিনি

মৃত্যুঞ্জয়। গুরুর যদি মৃত্যু হয় তাহলে শিষ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রকৃত যাঁরা উচ্চমার্গের গুরু তাঁরা দেহত্যাগ ক'রলেও শিষ্যের মঙ্গল কামনায়, তাঁরা থাকেন সদাসর্ব্বদা শিষ্যের হৃদয় কন্দরে, সূক্ষ্মাবস্থায়।

নাহি তিরোভাব সদা আবির্ভাব
মৃত্যুরে করেছ জয়।
কালের কোলে তারা তারা বলে
অধর্ম্ম করিলে ক্ষয়॥
শান্ত গম্ভীর ধীর অতি স্থির
কায়া তব যোগময়।
বিশুদ্ধ নাম বিলালে ধরায়
নিরাকারে হ'লে লয়॥
সর্ব্বত্যাগী তুমি ওহে ত্রৈলঙ্গ নন্দন
তুমি মদন মোহন।
মদনারী হ'য়ে করে ত্রিশূল ল'য়ে
কর লয় প্রহসন॥
প্রেমের আধার এ সৃষ্টি তত্ত্ব
সৃজনে প্রয়াস পাও।
অবতার রূপে অবতীর্ণ হ'লে
তারাগুণ গান গাও॥
অতি দীন হীন কত শত পাপী
তরালে নামের জোরে।
মুখরিত হ'ল এ পবিত্র ভারত
তারা নামে প্রতিঘরে॥
তব প্রেমলীলা সমানে সমানে
অসমতা নাহি মানে।
কিছু নাহি চাও ভক্তের কাছে
শুধু চাও নাম গানে॥
প্রার্থনা এই মোদের ঠাকুর
রেখো ঐ চরণ তলে।
ওগো, পরম যোগী যোগাবতার
ঘোর এই কলি কালে॥

শ্রীগুরু সূর্য্যানন্দ গিরি মহারাজকে যেখানে জল সমাধি দেওয়া হয়েছিল, সেইখানে মহানন্দ গিরি মহারাজ স্নান ক'রে কিছু শান্তি লাভ ক'রলেন। কয়েকদিন ভক্তগৃহে অবস্থানের পর তিনি ঐ পবিত্র ভূমি ত্যাগ ক'রলেন।

(১১)

শ্রীগুরু বাবার নির্দ্দেশ, তারামাতেশ্বরীর পবিত্র নাম প্রচার ক'রতে হবে। বেশ তাই হবে, তাঁর আশীর্ব্বাদে সবই সম্ভব হবে। নিজে নামাস্বাদন পেয়ে একা আনন্দ ভোগ ক'রলে চলবে না, সবাইকে উপভোগ করাতে হবে তবেই হবে সাধনা সফল। এই কাজে সফলতা লাভ ক'রতে হ'লে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে, কামনা-বাসনা জয় ক'রে, নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ ক'রতে হবে, তবে পাঁচজনে মানবে এবং নামের মাহাত্ম্যে, নাম অমৃত স্বরূপ প্রচার হবে। তীর্থ পর্য্যটন, সাধু-সঙ্গ, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং কঠোর তপস্যাই হ'ল নৈতিক মহৎ চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান।

বহুতীর্থ পর্য্যটন ক'রে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরিদ্বারের অনতিদূরে, অরণ্যাবৃত নির্জ্জন গুহায় মৌনভাব অবলম্বন ক'রে, যোগ সাধনায় রত হ'লেন। কিছুকাল পরে তিনি গুহা ত্যাগ ক'রে বদরীনারায়ণ অভিমুখে যাত্রা করলেন। হরিদ্বার হ'তে বদরীনারায়ণ প্রায় ৯১ ক্রোশ দূরে পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত। সমতল ভূমি হ'তে বদরীনারায়ণ প্রায় ৩,৬৬১ গজ দূরে পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত। বাবা বদরীনারায়ণের মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১৫ গজ। পর্ব্বত শিখরে আজও এই মন্দির সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে কালের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে নারায়ণ, কুবের, গণেশ, ঋষি নারদ ও গড়ুরের মূর্ত্তি আদিম যুগের হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কৃষ্টি, নিষ্ঠা, ভক্তি, ত্যাগ ও শিল্পকলার চাতুর্য্যের প্রতীক স্বরূপ কাল প্রবাহে মূর্ত্ত রয়েছে। শান্ত গুরু গম্ভীর ধবল তাপস হিমাচলের অংশ বিশেষ এই পবিত্র বদরীকাশ্রম সর্ব্বত্যাগী সনাতন আর্য্য ঋষিদের তপঃস্থান। কর্ম্ম চঞ্চল সংসারের হিংসা-দ্বেষ ঘৃণা-লজ্জা ও ভয়ের কলুষ স্পর্শ হ'তে মুক্ত এই বিরাট তপঃভূমি এক উদাসী প্রেমিকের স্বপ্নরাজ্য। এখানে নাই আমি—আমার প্রেরণা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, রিপুর উত্তেজনা, পরশ্রী কাতরতা, লোলতা, বা কপটতা। মুক্ত প্রাণে প্রচারে এখানে, বেদের মহিমা গান, বহু যুগ যুগান্তর হ'তে। নদীর কল্লোল তান গেয়ে যায় অবিরাম, আমি কিছু নয়, সবই তুমি, আমার আমি সদাই তোমাতে প্রয়াণ। শীতল উদাসী বায়ুর স্পর্শে দেহের জড়ত্ব ভাব

বেশ জানিয়ে দেয়, এ জড়দেহ কিছু নয়—অলীক স্বপ্নমাত্র শুধু মায়ার আধার।

সাংসারিক কলুষ আব-হাওয়া পিছনে ফেলে রেখে, এগিয়ে চলেছেন মহারাজ উদাসমন ও মুক্ত প্রাণে। নিশায় ঝিঁঝির ঢং ঢং শব্দ, জানিয়ে দেয় ভক্তদের ভগবানের আগমন, সর্ব্বত্র বিচরণ। হে, আমার ভক্তবৃন্দ আলস্য ত্যাগ কর, দিবা অন্তে আঁধার এল, বাস্তব সুখ ক্ষণস্থায়ী তাই মোহ ত্যাগ ক'রে কর্ম্মী হও। সুখ দুঃখের অতীত সেই চিদানন্দময় আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন এই পবিত্র পর্ব্বতে। তাঁকে ডাক, প্রাণ ভরে ডাক, আবেগে আরত্তি কর। বাজাও চিত্তরূপ ঘণ্টা মনোরূপ মুদগরে দৃঢ় সংকল্পে। ভেসে উঠুক সপ্ত-লোকের সপ্তসুর সমৈস্বরে ওঁ-ওঁ-ওঁ। ভ'রে যাক্ আকাশ বাতাস ওঁকার নাদে এই ঘন আঁধারে। অরাতিকে নাশ ক'রে সেই চিদ-ঘন পরমাত্মাকে জীবাত্মা স্বরূপ প্রদীপ কলিকা দিয়ে সাদরে আরত্তি কর। সারা-রাত্র চল্‌লো আরত্তির ঢং ঢং শব্দ বিস্তীর্ণ পর্ব্বত-মালায়। মাঝে মাঝে ভেসে আসে প্রচ্ছন্ন গুহা হ'তে গুরু গম্ভীর আবেগ ভরা নাদ, ওঁ-ওঁ-ওঁ। কর্ম্মময় জগৎ, কর্ম্ম ক'রে যেতে হবে, চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে না। সেই অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্যকে চিন্তায় আবদ্ধ রাখতে হবে, তবে হবে মনুষ্য জীবন সফল। তিনি গরীয়ান্ হলেও ভক্তাধীন তাই তিনি ভক্তের কাছে অতি ক্ষুদ্র, ভক্ত বৎসল। গঙ্গার দক্ষিণ তটে হরিদ্বার হ'তে ৭ ক্রোশ দূরে পার্ব্বত্য সমতল ভূমির উপর দিয়ে চলেছেন মহারাজ ঋষিকেশ অভিমুখে। পথ শ্রান্তি নিরসন হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও ভাব গভীরতায়। রাত্রে চটীতে বিশ্রাম এবং প্রভাত হ'তে পথ চলা ; এই হ'ল নিত্য নিয়মিত তাঁর তীর্থ ভ্রমণ। ঋষিকেশ হ'তে দেড় ক্রোশ দূরে লছমন ঝুলায় উপস্থিত হ'য়ে তিনি লক্ষ্মীমা ও ধ্রুবের মূর্ত্তি দর্শন ক'রে কেদার-নাথ অভিমুখে যাত্রা করলেন। হরিদ্বার হ'তে কেদারনাথ ১৫৩ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বত শিখরে কেদারনাথকে দর্শন ক'রে মহারাজ, বিপজ্জনক পিচ্ছিল পথে বদরিকাশ্রম অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। হরিদ্বার হ'তে এই পবিত্র স্থান প্রায় ১৮২½ মাইল দূরে পর্ব্বত শিখরে বিরাজমান।

মুক্ত আকাশ এবং উদাস বায়ুর স্পর্শ পেয়ে মহারাজের সাধন লিপ্সা বেড়ে গেল। অদূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নির্জ্জন নিস্তব্ধ এক গুহায় তিনি আসন স্থাপন ক'রলেন। যেখানে ভগবান সেইখানেই ভগবতীর অবস্থিতি লীলায় অভিব্যক্তি। হর ও পার্ব্বতীর পদার্পণে এই বিরাট হিমাচল তপস্যার

এক তাপস মূর্ত্তিতে শোভিত। ভক্তির আব-হাওয়া মণ্ডিত এই পবিত্র স্থানে স্বতই মন ও প্রাণ ছুটে চলে যায় উদাসী হ'য়ে ভগবৎ চরণে, সীমা লঙ্ঘন করে।

কৃচ্ছ্র সাধনায় কি ভাবে, কি ক'রে যে সময় অতিবাহিত হয় তা তিনি নিজেই জানেন না। কত দিন, কত রাত যে, কি ভাবে কেটে গেল সে হুঁস তাঁর একেবারে নেই। যোগীর সাধনায় আঁধার-আলো, দিবা-রাত সবই সমান। মহামায়া মাকে দর্শন ক'রতে হবে, তাঁর অলক্তক রাগ রঞ্জিত চরণ যুগল স্পর্শ ক'রতে হবে, তার শক্তিতে শক্তিবন্ত হ'য়ে পরম পিতার কাছে অগ্রসর হ'তে হবে, তবেই হবে চরম সিদ্ধিলাভ। বেদান্ত বলেন ধ্যান-ধারণা ও সমাধিতে দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদন পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই তিনটি সাধন পথ ত্রিগুণে গুণান্বিত প্রত্যক্ষে মায়া, পরোক্ষ ও তাই কিন্তু, একমাত্র অপরোক্ষ সাধনাতে হয় মায়া জয়, বৃত্তির বিনাশ ও সন্দেহের অবসান। অপরোক্ষ সাধনায় সিদ্ধিলাভই হ'ল, 'সোঽহং জ্ঞানলাভ", আমি—আমার বিনাশ বৃত্তির সংহার 'আমি' অর্থে এখানে অহংকার। প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ব'লতেন, 'কাঁচা আমি ও পাকা আমি।" দেহাত্মবোধ জড়িত 'আমি' হ'ল কাঁচা আর দেহাত্ম্য বোধহীন 'আমি' হল পাকা, অর্থাৎ আত্মা। এই পাকা আমি বোধই হ'ল 'সোঽহং" জ্ঞানলাভ। অলীক আমি বা আমাতে যে অহংকার বা দেহাত্ম বোধ তাই হ'ল মায়ার লীলাবস্থা।

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন
সাধনের বসে।
ব্রহ্ম—আত্মা ভগবান
ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

কোনদিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কেটে যায় মহারাজের দিন কৃচ্ছ্র সাধনে। মায়ের দর্শন প্রতীক্ষায়, মহারাজ অতিবাহিত ক'রছেন দিনের পর দিন আগ্রহ সহকারে। আঁধার ছায়ায় আলোর চাকচিক্য রূপ দেখে কখন মা-মা ব'লে চিৎকার করে ছুটে যান মাকে ধরবার জন্যে, আবার ফিরে আসেন মর্ম্মাহত হ'য়ে দৃষ্টির বঞ্চনায়। মনের একাগ্রতায়—কাল্পনিক ভাব মূর্ত্তি ফুটে উঠে তাঁর চিত্তে ভাব গভীরতায় এবং সমাধীস্থ থাকেন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবলুপ্ত চেতনায়। "বাহিরেও যিনি অভ্যন্তরেও তিনি, এক ব্যতীত যখন দুই কিছু নেই, তবে কেন বৃথা বাহিরে খুঁজে মরি?" অখণ্ড যে সত্ত্বা

চরাচরে সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্যাপ্ত রয়েছেন, সেই একই সত্ত্বা রয়েছেন অভ্যন্তরে চিদানন্দরূপে চিত্তে সাম্য অবস্থায়। তাই অভ্যন্তরে না খুঁজে বাহিরে খোঁজা বৃথাই হবে। ভক্তির উচ্ছ্বাস, ভাবে প্রত্যয় এবং জ্ঞানের বিকাশই হ'ল ভাব মুর্ত্তির প্রকাশ।

"না-না, বাহিরে আর মনঃস্থাপন ক'রবো না। এই তো রয়েছেন তিনি, হৃদয় জুড়ে পরমা বৈষ্ণবী মা মাহেশ্বরী। মা-মা, চাইনা বাহ্যিক দেখতে তোমার রূপের ছটা, সৌন্দর্য্য বিকাশ। মাগো তোমার কত রূপ, কত ভাব, দিবা-রাত্রই তো বাহিরে দেখাচ্ছ কিন্তু, মা দেখতে পাচ্ছেনা আমার এ অন্ধ মন অন্ত প্রদেশ। পবিত্র স্নেহ ও দাবী, মা ও ছেলে এই পবিত্র সম্পর্কের কাছে রূপ সৌন্দর্য্যের কোন মূল্য নেই। মা ও ছেলে এই নিবিড় সম্বন্ধের কাছে কোন প্রয়োজন নেই নামে ধামে বা তন্ত্র-মন্ত্রে। মা শব্দ উচ্চারণে যখন সুখ শান্তি পাই, ত্রিভুবন ভুলে যাই, সেই মহামন্ত্রে মা বুলি অক্ষয় হ'য়ে থাকুক আমার রসনা ও অন্তরে।" ছেলে কি কখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের রূপ সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করতে পারে? না তা কখনই হ'তে পারে না; কারণ বিচার বুদ্ধি, জ্ঞান, যুক্তি এ সবই তো মায়ের দান। তাই এসব থাক্ মায়ের গর্ভেই নিহিত কালের বুকে। নদ-নদী যতই বড় ও প্রবল হোক্না কেন, তথাপি উৎসের প্রাধান্য চিরকালই স্বীকার্য্য। উৎসই তার আধার এবং এই আধারেই নদ-নদী সীমাবদ্ধ। এক অভিন্ন প্রাণ শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে বহুর প্রকাশ এবং বহুতে অগমন তাই মায়ের বহু সন্তান। কাজ নেই ওসব বিচারে শুধু মা বুলিই থাক্ অস্তিমের সাথী হ'য়ে।

অচিরেই মহারাজের মন চিত্তে সমাহিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহাত্মবোধ একেবারে লোপ পেল। গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র জিহ্বায় আর সরে না। অর্দ্ধনিমীলিত নয়নের মণিদ্বয় ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হল গভীর প্রকোষ্ঠে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, গাঢ় নিপাত ধ্যানে কি যে হ'ল, কতক্ষণ যে, তাঁর ঐ ভাবে কেটে গেল, তা কে জানে তাঁর ধ্যান ধারণা সবই স্তব্ধ হল নিশ্চেষ্ট মনের জড়তায়। এ যেন দেহ মনের সঞ্জ্ঞাহীন অবস্থা। এই হল শাস্ত্র মতে সহজাবস্থা।

"দুর্ল্লভো বিষয়ো ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্ব দর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা॥"

বিষয় পরিত্যাগে সামর্থ্য এবং অপরোক্ষ আত্ম সাক্ষাৎকার ও সহজভাব

(সমাধি) প্রাপ্তি, এ সকল দুর্লভ ব্যাপার। শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতিরেকে এই সকল লাভ হয় না।

মায়ের কোল পাবার জন্যে শিশু হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদে কিন্তু, যেই কোল পায় তখন তার থাকে না উদ্বেগ বা অস্থিরতা। বেশ শান্তিতে তখন সে ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোল জোড়া হ'য়ে। মহারাজেরও কি এই অবস্থা হ'ল? কি জানি কার মধ্যে কি আছে। নিজেকেই যখন নিজে চিনি না তখন অন্যের বিষয় জানতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। একমাত্র যাঁর ঐ অবস্থা হয়েছে তিনিই বলতে পারেন মহারাজ এখন কি অবস্থায় রয়েছেন। ধীর-স্থির নিশ্চল দেহে হঠাৎ মহারাজের সাড় ফিরে এল, তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর দু-চক্ষুর মণি দুটি গভীর প্রকোষ্ঠ হ'তে উল্টে বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন ক'রে তিনি দেখলেন গুহা নাই, নাই পর্ব্বতমালা বন জঙ্গলে পরিবৃত। আসনে উপবিষ্ট থেকেও তিনি লক্ষ্য করলেন আগ্রহে, নাই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা, দিবা রাত্রির প্রহরা। সেথা আছে শুধু শূন্য মহাশূন্য, কেবল নীলির খেলা। অধঃ উর্দ্ধ যে দিকে তাঁর দৃষ্টি যায়, শুধু শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। মহাশূন্যে সমাসীন অবস্থায় মহারাজ, উদাস আনন্দে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ ক'রে আপন মনে বল্লেন, "সব শূন্য," বা বেশ মজা। তাঁর দেহাত্মবোধ লোপ পেয়েছে ব'লে পূর্ব্বস্মৃতিও বিলুপ্ত হয়েছে, তাই তিনি তাঁর নিজ হস্ত-পদ লক্ষ্য ক'রে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি ওটা কি? আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়?"

"তস্মৈ হোচুঃ প্রাণ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্মেতি।"

(ছা ৪।১০।৩)

হে যোগিন। তোমার ঐ প্রাণই অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম, তোমার হৃদয়ে উপলব্ধ আনন্দই ব্রহ্ম। তোমার হৃদাকাশ আর ঐ অপরিমিত ব্যোম উভয়ই ব্রহ্ম।

কিছু সময় ঐভাবে অতিবাহিত হবার পর মহারাজের হৃদয় কন্দরে এক গুরুগম্ভীর নাদ উত্থিত হল, "সোঽহং, সোঽহং সোঽহং" উদাস হাসি হেসে আপন মনে তিনি বল্লেন, "ওঃ আমি,—দেহ-মন বা ইন্দ্রিয় নয়; আমিই সেই অনন্তব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্ম সত্বা। বা—এতো বেশ মজা, এই বিস্তীর্ণ মহাকাশই আমার লীলা বিলাসের একমাত্র আধার। সব শূন্য মহাশূন্য বা বা কি মজা। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ভাব ভেঙ্গে গেল, উন্মীলিত আঁখিদ্বয় বন্ধ হয়ে গেল এবং মণিদ্বয় কোঠার মধ্যে সোজা হ'য়ে দেহাত্মবোধ এনে দিল। মহারাজের পূর্ব্ব

স্মৃতি ফিরে এল, তিনি চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন ক'রে দেখলেন, গুহা, গিরিমালা সব কিছু পূর্ব্ববৎ ঠিকই রয়েছে, "তাইতো আমি কোথায় ছিলাম? যেখানে ছিলাম, সেখান হ'তে কেন ফিরে এলাম?" ব্যাকুল হ'য়ে তিনি পুনরায় মহাশূন্যে অবস্থানের জন্য চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করলেন। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও তিনি আর মহাশূন্যে অগ্রসর হতে পারলেন না। উদাসী মন চঞ্চল হয়ে উঠলো, আসন ত্যাগ ক'রে তিনি গুহার বাহিরে এলেন।

বেলা হয়েছে, অদূরবর্তী তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে ভগবানের অপরূপ রূপের মহিমা বিকাশ ক'রছে। ছোট ছোট কুঞ্জে ব'সে গাইছে মধুর গান নানা রংয়ের পাখী। ছল-ছল আঁখি নিয়ে দেখছেন মহারাজ বৈচিত্রময়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাধুরী অবাক হ'য়ে। বৃক্ষ-লতা, বন-উপবন যেন, নবচেতনায় প্রস্ফুটন। ধন্য তুমি স্রষ্টা, আধার আমার তারামাতেশ্বরী, ধন্য এই রসময় রহস্যলীলা। শীতল বায়ুর স্পর্শে কাঁপছে তরুর পাতা, দুলছে লতার কোমল ডগা; ঢ'লে পড়ছে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে প্রেমপরশে। ফ্যাল—ফ্যাল ক'রে দেখছেন মহারাজ, প্রাকৃতিক এই নিষ্কাম লীলা, মনোমুগ্ধকর অপার সৌন্দর্য্য। আপন হারা এ আনন্দ, স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত। মাগো! তোমার কত রূপ, স্থূলে-সূক্ষ্মে, নভোমণ্ডলে, তোমারই মহিমা প্রচার ক'রছে। আনন্দ, কেবলই আনন্দ, আনন্দের অফুরন্ত উৎস বহে যাচ্ছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে। আনন্দ স্রোতের টানে ভাসমান সাধকের মুখে-চোখে বিশুদ্ধ আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আনন্দই যেন প্রাকৃতিক লীলা তাই লীলাই আনন্দ, আনন্দই লীলা।

আনন্দময়ীর আনন্দ লীলা
কে নিবিরে আয়।
আয় ছুটে আয়-আয়রে ত্বরা
প্রেমে গাঁথা তায়॥
বন উপবন বৃক্ষলতা
পরস্পরে আছে গাঁথা
প্রেম পরশে নীলি হাসে
পড়ে ঢলে গায়।
নির্ঝরিণী ধবলগিরি
সূক্ষ্মহস্তের কারিগরী

উঠে তপন রাঙিয়ে বসন
রাঙ্গা ছুটি পায় ॥
ভোগ বাসনা ছুদিন পরে
দিবেরে ব্যথা কতই তোরে
ডুববে তরী করলে দেরী
মাঝ দরিয়ায়।
(তোরা) আয় আয় আয়
আয় ছুটে আয় ॥

প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে মহারাজ মহামায়া মায়ের অস্তিত্ব অনুভব ক'রে প্রকৃতির কোলে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। ভুক্ত, ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুর মধ্যেও যখন একই সত্বা বিদ্যমান তখন মাগো! তুমিই আনন্দময়ি, আমি তোমারই সন্তান। প্রফুল্লচিত্তে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান মহারাজ গিরি-মালায় বন উপবনে। ভয় নাই, ভাবনা নাই, নাই তাঁর দেহ ও মনে অবসাদ এবং দুঃখ। সদা প্রফুল্ল তাঁর মন, উপভোগ করে প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য্য, তন্মাত্রার বৈশিষ্ট্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ বিশ্বমাতার স্নেহ অবদানে। এত আনন্দ কেন, কোথা তার উৎস? চোখে-মুখে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে, তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অব্যক্ত বিশুদ্ধ আনন্দ প্রবাহিত। মহারাজ কি মদ্যপানে মাতোয়ারা হয়েছেন? বাংলার মহাসিদ্ধ সাধক শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছিলেন :—

"সুরাপান করিনে আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে।"

এই মহাসিদ্ধ সাধকই কন্যারূপী মহামায়া মাকে নিয়ে হালিসহরে বেড়া বেঁধেছিলেন এবং কাশীপুরে সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের মন্দির গান গেয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও সেই মহাসাধক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছেন তথাপি সেই অতীত কাহিনী আজও জীবিত আছে বাঙ্গলার প্রতি ঘরে ঘরে। সন ১১২৯ সালের মধ্যবর্তী কালে এই মহামাতৃসাধক হালিসহরে এক প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন :

"সোমধারাক্ষরেদ যা তু
ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পিত্বা নন্দময়ি স্থাং
য স এব মদ্যসাধকঃ ॥" (তন্ত্রসার)

মস্তকের অভ্যন্তরে সহস্রার পদ্ম হ'তে যে সুধাক্ষরণ হয় সেই সুধা যে পান করতে পারে সেই মদ্যসাধক।

এই মদ্যপানে পা টলে না, বুদ্ধির ভ্রম হয় না এবং যকৃতের ব্যাধি ভোগ ক'রতে হয় না। এ মদ বোতলে ভরা পচাই জল নয়। যোগীরা সমাধি অবস্থায় ঐ সুধা পান ক'রে অখণ্ড আনন্দের অধিকারী হন। দেবাদি-দেবের বাণী হ'ল তন্ত্র এবং তার আচার হ'ল যোগের অঙ্গবিশেষ। সেই আচার আভ্যন্তরীন ব্যবহার না ক'রে বাহ্যিক ব্যবহার ক'রলে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই ঘটে।

বেশ নির্ভাবনায় মহারাজের দিন অতিবাহিত হচ্ছে আভ্যন্তরীন সুরাপানে। মহামায়া মা যেন অলক্ষ্যে অভিসারে তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করছেন। অনুভূতিতে চিত্তে আনন্দময়ী মায়ের মোহিনী মূর্তি ফুটে উঠলেও তিনি চাক্ষুষ দর্শনে বঞ্চিত রয়েছেন। যত দিন যায় সাধকের অনুভূতিও তত গাঢ় হয়। তাঁর দেহাভ্যন্তরে সুকোমল, স্নিগ্ধ কমল প্রস্ফুটিত হয়েছে, তার অনুরাগ ও মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে অভ্যন্তর হ'তে বাহিরে, তাই তিনি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ছটফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন বন উপবনে কস্তুরী মৃগের মত। মহামায়া মাকে ধরি-ধরি ক'রে ধ'রতে না পেরে তাঁর আকুতি আরো বেড়ে গেল। হতাশার মধ্যে তাঁর প্রত্যাশা যেন দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রলো। "পাবো, মায়ের দর্শন পাবো, নিশ্চয়ই পাবো। কেন পাবো না,—নিশ্চয়ই পাবো, আমি যে তাঁরই সন্তান।"

এক জ্যোৎস্না-স্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রাতে মহারাজ যখন আপন মনে, আপন ভাবে, পর্ব্বত শিখরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় সহসা এক বিরাট ছায়ামূর্ত্তি তাঁর সাথে পাশে পাশে ঘুরতে দেখা গেল। অলক্তকরাগ রঞ্জিত তাঁর চরণযুগল সর্পভূষণে অলংকৃত; স্থূল উদর দীর্ঘ ও পুরুষোচিত। পরণে ব্যাঘ্রজিন; দক্ষিণ করে ত্রিশূল এবং বাম করে কপালপাত্র ধৃতা; দেবীর গলে মহাশঙ্খ ও রুদ্রাক্ষমালা দোদুল্যমানা, স্মিতহাস্য তাঁর আননে; শিরে সর্পফণার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিদর্শন স্বরূপ; তাঁর ত্রি-নয়ন স্নেহ-বাৎসল্য ও শাসন ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট রহেছে। স্নিগ্ধ জ্যোতিস্নাত শ্যামবর্ণা দেবীর শান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল করুণামাখা। দেবীর হাব-ভাবে ও পদ্ম-পলাশলোচনের ইঙ্গিতে মনে হয়, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সুস্পষ্ট পরিচয়ে তিনি আবির্ভূতা। আড়ে আড়ে দেখেও মহারাজের দেখার তৃপ্তি হ'ল না। মহামায়া মায়ের চরণ যুগল স্পর্শ করবার তীব্র ইচ্ছা থাকলেও তিনি পাছে মাকে হারিয়ে ফেলেন সেই

ভয়ে স্পর্শ করতে সাহস পেলেন না। কাছে পেয়েও যদি মাকে হারাতে হয় এর চেয়েও দুঃখের আর কি হতে পারে। এই ভাবে কয়েক রাত্র অতি বাহিত হবার পর এক গভীর রাত্রে মহারাজ যখন গুহার মধ্যে ধ্যান ধারণায় সমাহিত সেই সময় সহসা তাঁর বক্ষ হ'তে পুঞ্জীভূত উজ্জ্বল নীলজ্যোতি উৎসের ন্যায় বহির্গত হ'য়ে সমস্ত চরাচর উদ্ভাসিত ক'রলো। অবাক হ'য়ে দেখলেন তিনি জ্যোতির খেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে। মহামায়া মায়ের কি রহস্যলীলা, জ্যোতি দর্শনে মহারাজের দেহ, মন-প্রাণ আনন্দ-হিল্লোলে দোদুল্যমান্ হ'ল। কিছুক্ষণ পরে জ্যোতি মিলিয়ে গেল কিন্তু, আসন ত্যাগ না করে তিনি, ভাবে ভাব-গভীরতায় সমাহিত রইলেন। প্রভাতী আলো দেখা দিল তাঁর ভাব ভেঙ্গে গেল পক্ষী কলরবে। আসন ত্যাগ ক'রে তিনি স্নানে গেলেন। অলকনন্দার শীতল জলে স্নান করে তিনি নিত্যক্রিয়ায় মনোযোগ দিলেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর তিনি বদরিকাশ্রম ত্যাগ করে হরিদ্বারে ফিরে এলেন।

* হরিদ্বার তীর্থ বহু প্রাচীন নামে অভিহিত। কপিলা, গঙ্গাদ্বার, ও মায়াপুর। প্রাচীনকালে বহুযুগ পূর্ব্বে সনাতন আর্য্যঋষিরা এই পবিত্র স্থানে শ্রীহরির দর্শনলাভ করেছিলেন ব'লে হরিদ্বার বলা হয়। কপিলমুনি এই পবিত্র স্থানে ভগবৎ দর্শন লাভ করেছিলেন ব'লে কপিলা বলা হয়। গঙ্গা এই পবিত্র স্থান হ'তে প্রবাহিতা ব'লে গঙ্গাদ্বার নামে অভিহিত। এই স্থানের নৈসর্গিক মনোরম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং নাম রেখেছিলেন, "মো-ইউ-লো", অর্থাৎ মায়াপুরী।

* A turists guide to Haridwar, Resikesh Published by Haribhanjan Singha & Sons.

(১২)

আত্মদর্শন লাভ করবার পর মহারাজের বাহ্যিক কোন ঝামেলা ভাল লাগেনা। নিরিবিলির পরিবেশে মাকে পাবো, তাঁর রক্তাভ চরণ দুখানি পূজা ক'রবো, মনের মত বনফুলে সাজাবো, মহামন্ত্র মা বুলি ঘন-ঘন উচ্চারণ ক'রে মন-প্রাণ শীতল ক'রবো তবেই হবে জীবন সার্থক। এই সব নানা চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে মহারাজ, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখবার জন্যে ১৯১১ খৃঃ ২০শে জুলাই হিমালয়ের অন্তর্গত স্বাধীন রাজ্য নেপালে উপস্থিত

হলেন। নেপালরাজের সুব্যবস্থায় তিনি পশুপতি নাথ ও মুক্তিনাথ দর্শন ক'রে নেপাল জঙ্গলে তপস্যা করবার মনস্থ ক'রলেন। তাঁর সাধনার জন্যে নেপালরাজ জঙ্গলের মধ্যে একটি কুটীর তৈয়ারী ক'রে দিলেন। যাতে তাঁর তপস্যা এবং সেবার ত্রুটি না হয় সেই কারণে নেপালরাজ নিজ সেনাপতিকে তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। ঐ সময় নেপালের রাণী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু দক্ষিণা স্বরূপ এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে লাভ করবার জন্যে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁর কাছে বিপুল অর্থ-সম্পদ অকিঞ্চিৎকর ও বেদনাদায়ক। অর্থ ঘটায় অনর্থ এবং সাধন ভজনে পরিপন্থী ব'লে, তিনি এই দক্ষিণা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ব'লতেন, "আমি কাকা গুরুর (শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) সঙ্গলাভ করেছি এবং তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করি"। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর মহারাজ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নির্দ্দেশমত "কাম-কাঞ্চন" ত্যাগ করেছিলেন। অর্থের প্রতি মহারাজের অনাসক্তি দেখে নেপালের রাণী খুবই প্রীত হ'লেন। গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তিনি দিলেন মহারাজকে তিনছড়া হরগৌরী রুদ্রাক্ষ মালা ও একটি বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। নেপালের অরণ্যময় পর্ব্বত উপত্যকায় মহারাজ কঠোর তপস্যার জন্যে আসন স্থাপন ক'রলেন। তাঁর পরমগুরু সচলশিব শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী এই শ্বাপদ-সঙ্কুলপূর্ণ অরণ্যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন সুদীর্ঘকাল। অলৌকিক তাঁর বিভূতি এবং অলৌকিকত্বে পূর্ণ তাঁর জীবন কাহিনী। কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

* হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সব জয় ক'রে ত্রৈলঙ্গস্বামী, নেপালের গভীর জঙ্গলে, গিরিগুহায় যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেই সময় নেপালরাজ স-সৈন্যে ঐ জঙ্গলে শিকার ক'রতে এলেন। এক বৃহৎ ব্যাঘ্রকে দেখে সেনাপতি তার পিছু অনুসরণ করেন। আততায়ীকে আক্রমণ না ক'রে ব্যাঘ্রটি ভীত হ'য়ে গভীর জঙ্গলে যে গুহায় সচলশিব ধ্যানমগ্ন রয়েছেন সেই গুহায় প্রবেশ ক'রে ভীষণ আর্ত্তনাদে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিলে। পোষা কুকুরের ন্যায় ব্যাঘ্রটিকে তিনি কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রে সান্ত্বনা দিলেন। অনতিদূরে বন্দুকহস্তে দণ্ডায়মান সেনাপতি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ওটা কি আপনার পোষা বাঘ?" সেনাপতির বাণী শুনে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বামিজি উত্তর দিলেন, "ঐ পাপ যন্ত্রটা ফেলে

* মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীর-জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দিয়ে হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ ক'রে কাছে এসে দেখ ও তোমারও পোষা। যে প্রাণ তুমি দিতে পারনা, সে প্রাণ কেন তুমি নিতে এসেছো?" কত কথাই সেনাপতির মনে উদয় হ'ল, বিবেক বৈরাগ্যের আঘাতে তাঁর নিষ্ঠুর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। গূঢ় রহস্যাবৃত এই ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত হ'লেন। মহামানবের আকর্ষণী-শক্তির প্রভাবে তিনি বন্দুক ত্যাগ ক'রে গুহার নিকটে উপস্থিত হলেন। কে কার শত্রু? কেউ কারো শত্রু নয়, নিজেরাই নিজেদের শত্রু। হিংসা দ্বেষহীন সমজ্ঞানী মহামানবের সংস্পর্শে এসে সেনাপতির জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তিনি অনুশোচনায় ক্ষুব্ধ হ'লেন। রাজার কাছে ফিরে গিয়ে সেনাপতি এই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করলেন। সেনাপতির মুখে এই অলৌকিক ঘটনা শুনে, নেপালরাজ মহামানবকে দর্শন করবার আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। বহুমূল্য উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে নেপালরাজ স-সৈন্যে একদিন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে গুহা সমীপে উপস্থিত হ'য়ে মহামানবের শ্রীচরণে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। সর্ব্বত্যাগী তপস্বীর কাছে একমাত্র ভগবান লাভ ব্যতীত বহুমূল্য দ্রব্য যে, অতিতুচ্ছ ও পরিত্যজ্য সেই উপদেশ দিয়ে স্বামিজি মূল্যবান দ্রব্যগুলি রাজাকে প্রত্যার্পণ করলেন। এই ঘটনার পর পাছে কেউ বিরক্ত করে সেইজন্য স্বামিজি নেপাল ত্যাগ করে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিব্বতে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি মানস সরোবরে প্রস্থান করলেন।

ভেঙেছে ঘুম জেগেছে জেগেছে।
অচেতনে তাই চেতন ফিরেছে॥
ছিল আচ্ছাদনে নিশ্চিন্ত শয়ানে।
কুণ্ড মধ্যে গুপ্ত মায়া আবরণে॥
সহসা জাগিল ঘুম ভেঙ্গে গেল।
চমকে চমকে তাই বিজুলী খেলিছে॥
ইড়াপিঙ্গলা শুষুম্না রেবতী,
কাঁপে চারিতার গুঞ্জরি উঠি,
ব্রহ্মনাড়ী খেলে বিজুলীর ছলে
ত্রিলিঙ্গ ভেদিছে॥
চারি সরোবরে হংস ঘুরেফিরে।
হংসী সাথে কেলি করে নানা স্বরে॥

কমলে বেড়িয়া যৌবনে মাতিয়া
ডুবে উঠে কত আনন্দ সাগরে ॥
উড়িছে ভ্রমর, ভ্রমরা সাথে।
পিয়ে মধু তারা হরষে মাথে ॥
নাহি ভেদা-ভেদ কোনই প্রভেদ।
পুরুষ প্রকৃতি বিভেদ ॥
মিশেছে তারা হয়ে আত্মহারা,
অনন্তে গড়া ভেঙ্গেছে কারা,
অসীম আকাশে মুক্ত বাতাসে
ওঁকার নাদ উঠে বারেবার।
গুরুগম্ভীর ভীষণ নিনাদে,
অ, উ, ময়ে যবে বাদ সাধে
তবুও অন্তর কাঁপে না অনন্তে,
সিন্ধুর বিন্দু করিছে বিহার ॥
লহরী আঘাতে যদি ভেঙ্গে যায়
সিন্ধুর বিন্দু সিন্ধুতে মিলায়।
নাহি কোন খেদ বিভেদে প্রভেদ
একেই অনন্ত, একে লয় পায় ॥
কাল প্রবাহে কালেই কাল হয়
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যের ক্ষয়,
কালেই কাল করিছে হরণ
মহাশূন্যে শূন্য মিশিছে ॥

(১৩)

১ নং পত্র

পত্রের উত্তরে, মহারাজ এক ভক্তকে উপদেশ দিয়ে লিখলেন :—বাবা, মায়ায় গড়া এ সংসারে থেকে যে মায়া জয় ক'রতে পারে সে-ই বীর সাধক। যেমন সাপ ও কেঁচো, মাটির মধ্যে থাকে কিন্তু, তাদের গায়ে মাটির দাগ লাগে না ; ঠিক ঐভাবে সংসারে বাস ক'রতে হয়। সংসারে থেকে লজ্জা ঘৃণা ও ভয় ত্যাগ করবার চেষ্টা কর। ক্রোধ: ত্যাগ ক'রবে, যে সময় ক্রোধ

আসে সেই সময় দক্ষিণ নাক চেপে কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ রাখবে এবং সেই স্থান ত্যাগ ক'রবে। মনে মনে সকল বস্তু ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। সর্ব্বদা এই চিন্তা ক'রবে যে, আমি আমার প্রভুর দাস; আমি সবার চরণের ধূলিকণা। প্রাণায়াম বা স্তুক সকলের সহ্য হয় না তাই অনেকে ব্যাধিগ্রস্থ হ'য়ে পড়ে।

২ নং পত্র

বাবা, আমি কিছুই জানি না, আমার কিছুই নাই, কেবল শ্রীগুরু মহারাজের দেওয়া নামরূপ মন্ত্র জানি; শুধু নামই আছে। বীজের মধ্যে গাছ আছে কিন্তু, দেখা যায় না। বীজ পুঁতলে গাছ বেরোয়, তেমনি নাম জপলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। এই আমার শ্রীগুরু বাবার বচন। এই বাক্যই আমার কাছে বেদবাক্য, আমি আর কোন শাস্ত্রই জানি না ও মানি না। আমার শ্রীগুরু বাবার বাক্য রূপ এই বেদের মতে চলি এবং অন্যকেও বলি। গুরুই ঈশ্বর, গুরুকে মনুষ্যরূপ দেখতে নেই। আমার গুরুদেবের উপদেশ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র থাকতে ফকির (সন্ন্যাসী) হবে না। যখন গুরুদেবের ইচ্ছা হবে তখন তিনি নিজেই এই চারিকে (পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র) কেড়ে নিয়ে গৃহস্থ লাইন হ'তে ফকিরী লাইনে নিয়ে যাবেন। যেমন কেউ ভাল কাজ ক'রলে সাহেব সন্তোষ হ'য়ে তাকে ভাল স্থানে বেতন বৃদ্ধিসহ বদলী করে, সাধন লাইনও তাই। সবই গুরুদেবের সন্তোষের উপর নির্ভর করে। আমার শ্রীগুরুবাবার হুকুম আছে যে, যাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র আছে তাদের ফকির ক'রবে না। যে ভক্ত সংসারে মায়ার বরফি খেয়ে ভগবানে প্রাণ অর্পণ ক'রে তাঁকে সন্তোষ ক'রতে পেরেছে এবং যে ত্যাগের পথে (কাম-কাঞ্চন ত্যাগ) থেকে আজীবন কাল তাঁর ব্রত রক্ষা করতে পারে; গুরু উপদেশকে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ গুরুর হুকুম যে পালন করে তাকেই গ্রহণ ক'রবে। কাকাগুরু (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব) বলতেন "লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়।" আর গুরুদেব বলতেন, "সরম্, মিজাজ খিন ডর ইসে ছোড়্তো, ভগবানকি সেবা কর্।" লজ্জ-ঘৃণা-গর্ব্ব, ও ভয় যদি ছাড়তে পার তবে ভগবানের সেবা কর। বাবা, প্রথমে সংসারে থেকে আখড়াই (তালিম) দাও, পরে আসরে নামবে। যখন লোকে হাসবে, ঠাট্টা ক'রবে সেই সময় ভাববে, আমি নাই, আমি মরিয়া গিয়াছি, এই হাড়-মাংস, রক্ত-পুঁজ জড়ানো দেহটাকে ওরা ব'লছে তাতে আমার কি? রাগ-অভিমান সেই সময় দূর করবার চেষ্টা ক'রবে, তাহলে নিশ্চই হবে। এই সব তালিম না দিয়ে বাহিরে এলে নানা রকমের লোক আছে; কেউ হাসবে, কেউ ঠাট্টা

ক'রবে, গায়ে ধূলা দিবে, ইঁট ছুঁড়ে মারবে, কখন প্রশংসা ক'রবে, নিন্দা ক'রবে বা গালি দিবে। এছাড়া কখন হয়তো মিথ্যা মকর্দ্দমায় সাবুদ ক'রে হাজতে থানায় দিবে। যদি সংসারে থেকে এই সব হাসি, ঠাট্টা, অপমান, অপবাদ, ভণ্ডামি, ইত্যাদি বলা সহ্য ক'রতে না পার তাহলে বাহিরে সংসারে বনে বা জঙ্গলে যেখানেই যাও, সেইখানেই হাসি, ঠাট্টা এবং জন্তু জানোয়ারে দাঁত খিঁচোবে ও হিংসা করবে। ভগবানের এই পরীক্ষায় কোথাও শান্তি পাবে না। শান্তি কেবল মনে। ভগবান বহুরূপী এবং তাঁর ভাবের দরজা বহু; যার যে ভাবে ইচ্ছা, সে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। শান্তি ভাবে,—ভাবের উদয়ে; অভাবে শান্তি ক্ষুণ্ণ হয় বলেই জীব অশান্তিতে হাহুতাশ করে।

শান্তিই এনেছে ক্লান্তি
নিখিল ভুবন ভরিয়া।
শান্তির লোভে যায় ছুটে সবে
আশার ছলনে পড়িয়া॥
উত্তপ্ত মরুর মাঝারে যেমতি
মরীচিকা শোভে অদূরে।
ক্লান্তির মাঝে তেমতি শান্তি
বিরাজে ভ্রান্তির আকারে॥
সুখের লাগিয়া দুখী যেই জন
কাটে কাল তার শোকেতে জীবন
কভু নাহি পায় সে তৃষ্ণায় জল
মরীচিকায় মরে ছুটিয়া।
আঁধার আলোকে ভুবন পুলকে
গাহে পাখী মধুর গান।
প্রকৃতির বুকে থাকে তারা সুখে
বিলায়ে দিয়াছে প্রাণ॥

৩নং পত্র

কর না কর, পার না পার তোমার ইচ্ছা। পাঁচমিনিট সময় কি তাঁর নাম ক'রতে পার না? আমি যাঁকে গুরু বলে মানি, তাঁর আদেশও পালন করি। গুরু ড্রাইভার, শিষ্য ইঞ্জিন। ড্রাইভার ইঞ্জিনকে যে ভাবে চালাবে

ইঞ্জিনও সেই ভাবে চলবে। তুমি লিখেছ, "মন যা চায়না, তা আমি কি করে করি।" এর উত্তর হ'ল এই যে, যখন মন চাইবে তখন ক'রবে। আরো তুমি লিখেছ যে, "ও গুলো যেন লোক দেখান।" লোক দেখান কাজ ক'রবে কেন?" ঘরে খিল দিয়ে করনা। চাঁদমারীতে না গেলে কি, লড়ায়ে যাওয়া যায় না? প্রথমে অ, আ ইত্যাদি প্রথম ভাগে পড়তে হয় তবে রামায়ণ পড়া যায়। প্রথমে সাকার পরে নিরাকার। একেবারে নিরাকারে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজের নকল ক'রতে ক'রতে আপনা আপনি আসলে পৌছান যায়। পোষা পাখীকে যা পড়াও তাই—সে পড়ে; অন্য কথাকি সে কইতে পারে? বাবা, আমার শ্রীগুরু বাবা, যা পড়িয়েছেন আমি, তাই পড়েছি এবং অন্যকেও ঐ পড়া বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমরা যাঁকে গুরু পদে বরণ করেছি তাঁকে মনুষ্যরূপে না দেখে ঈশ্বররূপে দেখে থাকি। তিনি যা বলেন তাই ঠিক, আর আমার মনে যা আসে তা ঠিক নয়। যদি আমি ভাবি, আমার ধারণাই ঠিক তাহলে আমার ঈশ্বরে শরণ হবার আবশ্যক কি? আমার মনই যদি ঈশ্বর হয় তাহলে আমি আমার গুরুকে ঈশ্বর রূপে কি করে দেখবো? দেখ বাবা, বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভগবানকে লাভ করা যায়। এক শিষ্যের গুরু যে মূর্খ ছিল, শিষ্য তা জানতো না। একদিন শিষ্য গুরুকে বল্লে, "হে-গুরুদেব! আমায় পরমাত্মা দর্শন করান্।" তন্ত্র, মন্ত্র, গুরু কিছুই জানে না।কিন্তু, ব্যবসা খাতিরে গুরু বল্লে, "যাও নির্জ্জন ঘরের মধ্যে মাটির শিব গ'ড়ে ফুল ও বেলপাতা দিয়ে এই মন্ত্র ব'লে পূজা করবে," "আযা বক্‌রা আযা, মেরা ফুল পাতা খা যা।" (আয় ছাগল আয়, আমার ফুল পাতা খেয়ে যা)। গুরুর নির্দ্দেশ মত রুদ্ধ ঘরে শিষ্য বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে মাটির শিব গ'ড়ে এক মনে ঐ মন্ত্র ব'লে ফুল ও বেলপাতা শিবের মাথায় চাপাতে লাগলো; কিছুক্ষণ পরে এক ছাগল এসে তার দেওয়া ফুল ও বেলপাতা খেতে লাগলো। রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে শিষ্য ছাগ-রূপী ভগবানকে দেখে অপার আনন্দ লাভ ক'রলেন।

বাবা, বিশ্বাসে তাঁকে পাওয়া যায় কিন্তু, সন্দেহ বা বাদ বিচারে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্কুলে যে ছেলে পড়ে তার মাষ্টারের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাঁর কথা যদি তার মনে না লাগে, তাহলে সে ছেলের কি ক'রে লেখা-পড়া হয়? আমার কাকাগুরু লেখা-পড়া বিশেষ কিছু জানতেন না, স্বামী বিবেকানন্দ বি. এ. পাশ ছিলেন কিন্তু, তিনি কাকাগুরুকে ঈশ্বর ভাবতেন তাই স্বামী বিবেকানন্দ নাম প্রচার ক'রতে পেরেছিলেন। কাকাগুরু বলেছিলেন,

"বাহাদুরী কাঠের কথা।" আমি যখন আমার গুরুরূপ বাহাদুরী কাঠ ধ'রে ভেসে যাচ্ছি তখন আমাকেও যে ধ'রে থাকবে সেও ভেসে যাবে।" বাবা! দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মনকে বশে আনবার চেষ্টা কর। আর তোমার মন যাতে বশে আসে তার জন্যে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি। তোমার মনের ঐ সব অসৎভাবগুলি শক্তিদেবীর শক্তির দ্বারা দূর হবে। বাবা! যদি তুমি তাঁকে চাও তাহলে আমার নির্দ্দেশ মত কাজ ক'রে যাও। ঠিক মত নির্দ্দেশ পালন ক'রলে তুমি তাঁকে নিশ্চয়ই পাবে। তিনি সদা সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা প্রণয় ক'রতে চেষ্টা কর তাহলে আমিও সর্ব্বদা তোমার মনের সঙ্গে থাকবো জেনো।

৬ নং পত্র

"বাবা! তোমার চিঠিতে লিখেছ যে, আমার গুরুমন্দির, গিরি আশ্রম যেন বজায় থাকে।" বাবা, মন্দির কি কখন অটুট থাকে? জীর্ণ হলেই চূণ সুরকী খসে যায়। ভক্তের সেবার দ্বারা প্রেম-ভক্তি রূপ চূণ ও সুরকী লাগালে তবে নূতনের মত হয়। সেবা (কার্য্য), সেবক (রাজমিস্ত্রী), চূণ (প্রেম) এবং সুরকী (ভক্তি) এরাই মন্দির সংস্কার করে।

৭ নং পত্র

বাবা! আমি তোমায় হুকুম দিচ্ছি তুমি শীঘ্র বিবাহ কর। তোমার গুরুজন, মামা ও মা, যার সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং যাতে তারা সন্তোষ লাভ করে তাই কর। সর্ব্বদা মন শ্রীগুরু চরণে রেখে সংসারে হাতে ও পায়ে কর্ম্ম ক'রে পরিবারবর্গকে প্রতিপালন কর। তুমি এই আদেশ পালন ক'রলে আমি অলক্ষ্যে তোমার সাথে সাথী হব। যখন ঠিক ঠিক কাজ ক'রবে তখন সকল বন্ধন কাটিয়ে ঈশ্বরের সাধন কাজে তোমায় ফকির করাব। যা তুমি চাও তাই পাবে, তবে এখন সময় হয়নি, গৃহস্থ বর্‌ফি খেয়ে নাও।

৮ নং পত্র

বাবা! তোমার পত্রখানি সব পাঠ ক'রে হেসে ফেল্লাম। এ হাসিটুকু, নিজের যখন বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল সেই সময় বড় ভাই পুনরায় আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন, তখনকার হাস। আমরা পূর্ব্বে বিবাহ ক'রে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ক'রেছিলাম, গৃহস্থ বর্‌ফি খেয়েছিলাম। এ বর্‌ফি না

খেলে তাঁর সংসার কি ক'রে হবে? যখন তোমার উপর, তাঁর কৃপা আছে তখন তাঁর চরণে ভজন দান ক'রবে। তোমরা তাঁর তপ্তঘিয়ের কড়ার কাছে এসে নেচি হ'য়ে থাকবে। লুচি হতে কি চাও না? লুচি হ'য়ে তাঁর ব্রহ্মাণ্ড-রূপ উদর গুহার ভিতর কি যেতে চাও না? তা হলে তিনি পাঠিয়েছেন কেন? বয়স বাড়ছে কি কমছে? এগ্রিমেণ্টও ফুরিয়ে আসছে। তাঁর কূলে মায়ের পেটে জন্ম নিয়েছ, পিতা-মাতার সেবা ক'রবে, পরে বিবাহ ক'রে আত্মীয় স্বজন প্রতি পালন করবে। তারপর তিনি যখন সন্তুষ্ট হয়ে সব কেড়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত ক'রবেন তখন তাঁর কাজ ক'রে বেড়াবে। আমি তোমায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে ব'লছিনা, সে কথা বলি কাদের যাদের ছোট সন্তান ও বুড়ো মা আছে, তাদের।

যে ভক্তের সঙ্গে মহারাজের পত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল সেই ভক্ত দৈবের লিখনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ ক'রতে বাধ্য হন। প্রায় দশ বৎসর কাল সাংসারিক জীবন যাপন করার পর তাঁর পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। পত্নী বিয়োগের পর তিনি, মহারাজের আসনাভিষিক্ত প্রিয়শিষ্য শ্রীশ্রীভবানন্দ-গিরি মহারাজের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই পত্রগুলির অনুলিপি শ্রীশ্রীমহানন্দগিরি মহারাজের প্রিয় এক গৃহীশিষ্য নাম শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মিত্র, বর্ত্তমান ঠিকানা চিত্তরঞ্জন, আমাকে প্রদান করে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি লেখক।

(১৩)

প্রজাপতি দক্ষরাজের রাজধানী, কংখলের কলুষ মাটি ধৌত ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন সর্ব্বপাপ নাশিনী ভাগীরথী নদী, খরস্রোতে হরিদ্বার অতিক্রম ক'রে বহু দেশ দেশান্তর হয়ে অসীম সাগরে। এই পবিত্র নদী, ভাগীরথীর তীরে কংখলে তারামালকি বাহারের নিকটে শ্রীজগন্নাথ প্রসাদের বাগান বাড়ীতে মহারাজের পদার্পণে আজ আনন্দ মুখরা হয়েছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যে উদার চেতা জগন্নাথ প্রসাদ, শ্রীগুরু মহানন্দগিরি মহারাজের শ্রীপাদ-পদ্মে এই মনোরম বাগানবাড়ী আজ নিবেদন ক'রে,নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রলেন। যারা আশ্রয়হীন, ধার্ম্মিক ও বিদ্যার্থী তাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে। শাস্ত্রানুশীলন, সৎভাবে জীবন যাপন, পরোপকার,

সাধন, ভজন, প্রাণী মাত্রেই কৃপা প্রদর্শন, নৈতিক চরিত্র গঠন, ঘৃণা-দ্বেষ বর্জ্জন, ধর্ম্মপ্রচার ইত্যাদি নীতিগত আদর্শ ও নিষ্ঠা পালনই হ'ল আশ্রম বাসীদের কর্ত্তব্য পালন।

কংখলে জগন্নাথ প্রসাদের বাগান বাড়ীতে মহারাজের আগমনে, ভক্ত ও শিষ্যদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ ডিসেম্বর মাসে আশ্রমে উপস্থিত হ'লেন সিমলা শৈলের হোম ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারী পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা সিংহ, তিন পুত্র (সত্যেন্দ্রনাথ, অজিত ও ফণীন্দ্রনাথ) ও এক কন্যা (তারাকিরণ) সহ মহারাজের সেবার জন্যে। বেশ আনন্দেই তাঁরা দিন অতিবাহিত ক'রছেন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে। মহারাজের সেবার কোন ঝঞ্ঝাট নেই, পূজা পাঠ সেরে অপরাহ্নকালে তিনি মায়ের চরণামৃত পান ক'রে সেবা করেন বেলপাতা থেঁতো করে বা লেমনগ্রাস সিদ্ধ জল। রাত্রে মায়ের পূজা অন্তে কিছু চিনাবাদাম গুঁড়া এবং আলুসিদ্ধ জল পান ক'রে তিনি ধ্যান ধারণায় সমাহিত থাকেন। দুগ্ধ, ছানা, মিষ্টি, তৈল-ঘৃত, অন্ন বা রুটী লুচি তিনি স্পর্শ ক'রতেন না। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী স্বল্পাহারী কঠোর তপস্বী। ভগবানের নামাস্বাদন ব্যতীত খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদন তার ভাল লাগতো না। শরীর রক্ষার্থে একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য ছিল তাঁর, সামান্য চিনাবাদাম গুঁড়া। গৃহীর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু, শাস্ত্র নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মুনি-ঋষিগণ খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যক্ত ক'রেছেন। নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্যের হানি হয় বলেই তাঁরা ধর্ম্মের নামে দোহাই দিয়ে গ্রহণে বাধা দিয়েছেন।

ভাঁড়ারে যা চিনাবাদাম ছিল আজ তা শেষ হ'য়ে গেল। আগামী কাল মহারাজের সেবার কি হবে, এই চিন্তায় এক ভক্ত অস্থির হ'য়ে প'ড়লেন। বাড়ীর পশ্চাৎ সংলগ্ন মহারাজের বিশ্রাম ঘর। পূজা পাঠ সেরে ঠাকুর ঘরের কবাট বন্ধ করে মহারাজ যখন বিশ্রাম ঘরে একাকী ব'সে আছেন সেই সময় ভক্তটি ব্যগ্রতার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্লেন, "বাবা! চীনাবাদাম আর নেই, এখানে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না।" ভক্তের বাণী শুনে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মহারাজ এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি খুবই চিন্তিত হয়েছেন তুচ্ছ সামগ্রী চীনাবাদামের জন্যে। কিছু নির্দ্দেশ পাবার আশায়, ভক্তটি মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে রুদ্ধদুয়ার ঠাকুর ঘর হ'তে খট্‌খট্ শব্দ তাঁদের কানে এল। মহারাজ দ্রুত আসন ত্যাগ

ক'রে ঠাকুর ঘরের কবাটে কান পেতে, আগ্রহ সহকারে শুনতে লাগলেন দৈব ইঙ্গিত। মা ও ছেলের মধ্যে ভাষার আদান প্রদান হ'ল টেলিগ্রামের মত খট্‌খট্ শব্দে ভক্তের নিকটে উপস্থিত হয়ে মহারাজ জানালেন ইশারায়, "হরিদ্বার ষ্টেশনে যাও, এক ভক্ত পার্শেলে চীনাবাদাম পাঠিয়েছে।" সাধকের অহং ভাব নাশ হ'য়ে যখন আত্মনির্ভরতা আসে তখন আত্মশক্তি সাধকের সব অভাব মিটিয়ে দেন। এই আত্মশক্তিই হলেন কালী বা তারা এবং আত্মা হলেন সগুণ ব্রহ্ম বা শিব।

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেমাধি গচ্ছতি ॥" ৯ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা)

সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, নিরহঙ্কার ও স্পৃহারহিত ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

আশ্রমের সম্মুখভাগে পর পর সংলগ্ন তিনখানি পাকা ঘর এবং ঘরের সম্মুখে চওড়া দালান, খড়ের ছাউনি। একখানি ঘরে সুখে বাস করছেন শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সিংহ তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে। এত আনন্দের মাঝে হঠাৎ ঘটে গেল এক দুপুরে বেলা একটার সময় এক মর্ম্মান্তিক ঘটনা। দালানে চালায় আগুন লেগেছে তার লেলিহান শিখা আকাশে ভেসে উঠেছে। আশ্রমের বাহিরে হৈ-চৈ লেগে গিয়েছে শুনে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ছুটে ঘরের বাহিরে এসে পুত্র কন্যাদের সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। সব পুত্র কন্যাদের তিনি খুঁজে পেলেন কিন্তু পেলেন না কোন সন্ধান কনিষ্ঠপুত্র ফণিন্দ্রের। ধূম ও অগ্নিতে আচ্ছন্ন হ'ল দালান ঘরগুলি। সবাই যখন জল—জল ব'লে ছুটা-ছুটী ক'রছে সেই সময় পাগলিনীর ন্যায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন লাবণ্যপ্রভা সন্তান সন্ধানে। ক্রমশঃ অগ্নি এমন ভাবে উগ্রভাব ধারণ ক'রলো কার্ সাধ্য আর ঘরে প্রবেশ করে। পাশের খালি ঘরে নিশ্চয়ই ফণীন্দ্র জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে এই ধারণায় মাতা পুত্রশোকে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন। ফট্-ফট্ শব্দে ফাটছে চালার বাঁশ দগ্ধ হ'য়ে। কোথাও বা ছিট্‌কে পড়ছে জলন্ত অঙ্গার ধব ধব শব্দ ক'রে। সোঁ সোঁ, শাঁ শাঁ শব্দে দাউ দাউ ক'রে জলছে চালা প্রবল বায়ুর চাপে। রুদ্রাণী মা ক্ষেপেছেন, দেখাচ্ছেন ভয় সন্তানদের কণা মাত্র শক্তির বিকাশে। সন্দেহের অবকাশে আমাদের কলুষ ত্রুটীর ফলে ঘটে যত অঘটন নিমেষে। এই সব দৈব দুর্ব্বিপাকে

আকস্মিক বিপদে প'ড়ে মানুষ পায় পরিচয় রুদ্রাণী মায়ের অপরিসীম শক্তির নিদর্শন বহুরূপে বহুভাবে প্রকারান্তরে।

অতি ধীর, স্থির, সৌম্য মূর্ত্তিতে, জটা-জুটধারী শিব প্রতিম মহারাজ, অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। রুদ্রাণী মায়ের রক্তোমাখা বুভুক্ষু রূপ দেখে মৌন ভঙ্গ ক'রে মহারাজ আবেগে বল্লেন, "তারা মাতেশ্বরী। "পুত্রের কোন সংবাদ না পেয়ে লাবণ্যপ্রভা অশ্রুসিক্ত লোচনে মহারাজের পদ-যুগল স্পর্শ ক'রে কাতর কণ্ঠে বল্লেন, "বাবা ! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল ছোট ছেলে ফণী ঐ ঘরে পুড়ে মারা গেল।" গম্ভীরভাবে শিষ্যাকে আশ্বাস দিয়ে মহারাজ, জ্বলন্ত অগ্নির মধ্য দিয়ে ফণীর সন্ধানে পর পর তিনখানি ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। চারিদিকে ধ্বনি উঠলো, "মহারাজ মাৎ যাইয়ে, জান যাগা।" ধন্য মহারাজের সাধনা, ধন্য তাঁর গুরুভক্তি, অক্ষত শরীরে তিনি ফিরে এসে শিষ্যাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "মা, তোমার কোন ভয় নেই, তারামাতেশ্বরীর কৃপায় তোমার ছেলেকে সুস্থ শরীরে ফিরে পাবে।" মহারাজের কান্তিময় দেহে একটুও দগ্ধের চিহ্ন নেই। কেনই বা থাকবে ? যে সাধক দেহ-মন-প্রাণ অকাতরে শ্রীপাদ-পদ্মে উৎসর্গ ক'রতে সক্ষম হয়েছেন তাঁকে মা কখনই দগ্ধ ক'রতে পারেন না। এ যে পবিত্র স্নেহ ও দাবীর সম্মিলন। মা, সন্তানের প্রতি যতই রুষ্ট হ'ন না কেন, তথাপি সন্তান যদি একবার বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে সরল প্রাণে মা বলে ডাকে, তাহলে মায়ের সব ক্রোধ উপশম হয় এবং মা তখন বিগলিত স্নেহে নিজেই হাবুডুবু খান। কি পবিত্র এ সম্বন্ধ, কত মধুর এ আকর্ষণ, একবার মা, ব'লে ডাকলে স্বর্গীয় সুধা ক্ষরে অন্তর বাহিরে !

আগুনের খেলা শেষ হ'য়ে এল, ভেঙ্গে পড়লো জ্বলন্ত চালা দালানে। ফণীন্দ্রনাথকে সুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেল বাগানের এক প্রান্ত হ'তে। মহারাজ বলতেন, "শ্রদ্ধার দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, শ্রদ্ধার দ্বারা (যজ্ঞ) ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয় ; শ্রদ্ধা ঐশ্বর্য্যেরও উপরে অবস্থিত। শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও বায়ুর শুদ্ধি কারক ; শ্রদ্ধা প্রজাদের রক্ষক। সকলেই শ্রদ্ধাকে সম্মান করে। শ্রদ্ধা মনুষ্য হৃদয়ে শুদ্ধ সংকল্প দান করে এবং শ্রদ্ধা হ'তে যাবতীয় মঙ্গল লাভ হয়। আমি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধে ! তুমি আমাকে শ্রদ্ধাবান কর।"

আগুনের খেলা নিত্য এ মেলা
জ্বলিছে আগুন অন্তর বাহিরে।
জন্ম হতে মৃত্যু আগুনের খেলা।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ে নাহি কভু হেলা
আকাশে বাতাসে বিকাশে আগুন
আদি হ'তে অন্ত আলোকে আঁধারে ॥
আগুনেই জল আগুনেই স্থল
ক্ষণস্থায়ী তাই এই ভূ-মণ্ডল
চন্দ্রসূর্য্য তারা প্রলয়েতে হারা
আঁধারে মিলায় তারা নিরাকারে।
নয়নে-ভাষণে-শ্রবণে আগুন
কার্য্য-কারণে ঐ মানসে দ্বিগুন
ঐ আগুনের চিতা জ্বলিছে হেথা
সদা-সর্ব্বদা হৃদয় কন্দরে ॥

এই আগুনই সগুণ ব্রহ্ম, যখনই দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় তখনই প্রলয় ঘটে। এই অবস্থায় তখন থাকে শূন্য— মহাশূন্য। এই অবস্থাই হ'ল নিগু'ন নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্ম।

মূলতঃ অগ্নি চার প্রকার —

১। "তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি সহস্র—
রশ্মিভিঃ পরিবৃত একর্ষিভূত্বামুর্দ্ধি তিষ্ঠতি যস্মাদুক্তঃ।"

তন্মধ্যে সূর্য্যনামক অগ্নি সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট সহস্র কিরণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একমাত্র ঋষি মস্তকে অবস্থান করে; তাহার কারণ বেদে সূর্য্যকে সহস্রদলের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে।

২। "দর্শনাগ্নির্নাম চতুরাকৃতি রাহবনীয়ো ভূত্বা মুখে তিষ্ঠতি।"

যে অগ্নি চতুষ্কোণাকার ও আহবনীয় নাম ধারণ করিয়া মুখে অবস্থান করিতেছে তাহার নাম দর্শনাগ্নি।

৩। "শারীরোঽগ্নির্নাম জরাপ্রণুদা হবি রবিস্কন্ধত্যর্দ্ধ
চন্দ্রাকৃতির্দ্দাক্ষিনাগ্নি ভূত্বা হৃদয়ে তিষ্ঠতি।"

যে জরা নাশ করে, ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করে, যাহার অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ও যে দক্ষিনাগ্নি হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে।

৪। "তত্র কোষ্ঠাগ্নির্নামাশিত পীত লীঢ় খাদিতানি
সম্যক শ্রপয়িত্বা গার্হপত্যোভূত্বানাভ্যাং তিষ্ঠতি
প্রায়শ্চিত্তীয় স্তধস্তাৎস্ত্রিয়স্ত্রিস্রঃ। হিমাংশুপ্রভঃ প্রজনকর্ম্মা।"

তন্মধ্যে যে অগ্নি চর্ব্ব, চোষ্য লেহ্য ও পেয় বস্তু সমূহের সম্যকরূপে

পরিপাক জন্মাইয়া গার্হপত্য নাম ধারণ করত নাভিতে অবস্থান করে, তাহাই কোষ্ঠাগ্নি। প্রায়শ্চিত্তীয় নাম অগ্নি, নাভির অধদেশে থাকে ; তাহার ইড়া পিঙ্গলা ও সুষম্না নাম্নী তিনটি স্ত্রী বিদ্যমান। তাহাদের বর্ণ চন্দ্রতুল্য এবং তাহারা সন্তানোৎপত্তি কার্য্য সম্পাদন করে। অগ্নির মূল উৎপত্তি সূর্য্যহতে।

লাবণ্যপ্রভার স্বামী পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয় মহারাজের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। শ্রীগুরুর পবিত্র সঙ্গলাভ করবার জন্যে তিনি অবসর মত প্রায়ই কংখলে যাতায়াত ক'রতেন। তিনি এত গুরু-ভক্ত ছিলেন যে, শ্রীগুরুর নির্দ্দেশমত জীবন যাপন ক'রতেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষের আদি জন্মস্থান হ'ল মুর্শীদাবাদ, কাঁদি সাব্‌ডিভিসন্, রূপপুর গ্রামে। পিতা ৺গুরুপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় যখন কুচবিহারে পুলিশ বিভাগে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সেই সময় সন ১২৮৬ সাল (ইং ১৮৭৯ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয় কুচবিহারে জন্মগ্রহণ করেন। সন ১৩০৭ সালে কুচবিহার কলেজ হ'তে বি,এ ডিগ্রী লাভ ক'রে তিনি ক'লকাতায় হোম ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী সুরু করেন। ক্রমশঃ তিনি হোম মেম্বারের পি,এ, পোষ্ট, এ উন্নীত হন। সন ১৩০৯ সালে কাঁদিতে জমিদার মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অবসর গ্রহণ করবার দু-বৎসর পূর্ব্বে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয় দিল্লী রিফরম্ অফিসে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন যেমন ধার্ম্মিক তেমনি সত্যবাদী ও দয়ালু ব্যক্তি। পূর্ব্বে তিনি মিষ্টদ্রব্য আহার ও ধূমপানে খুবই অনুরক্ত ছিলেন। কংখল আশ্রমে যখনই তিনি মিষ্টদ্রব্য আহার বা ধূমপানে রত হতেন কি জানি কি কারণে মহারাজ ঠিক ঐ সময় অন্য ভক্তের দ্বারা তাঁকে ডাকতে পাঠাতেন। এইভাবে বারে বার বাধা পাওয়ায় পুরুষোত্তম বাবু মিষ্টদ্রব্য ও ধূমপান ত্যাগ ক'রলেন। কিছুকাল পরে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হ'য়ে খুবই কষ্ট পান। শ্রীগুরুর অসীম কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হন। সন ১৩৪৪ সালে (ইং ১৯৩৭ খৃঃ) উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন এবং ২১শে শ্রাবণ শ্রীগুরুর শ্রীপাদ-পদ্ম স্মরণ ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেন। পুরুষোত্তম বাবুর সুযোগ্য মধ্যম পুত্র শ্রীঅজিত কুমার সিংহ, মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হ'তে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ ক'রে তিনি

---

* এই ঘটনা অজিতবাবু সরবরাহ ক'রে আমায় সাহায্য করেছেন ব'লে তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি লেখক

দক্ষিণেশ্বর উইম্‌কো ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি ১২৩।১ মহারাজ নন্দকুমার রোড, সাউথ, কলিকাতা-৩৬ নিজ বাড়ীতে বসবাস করেন।

(১৪)

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে সাধু-সন্ন্যাসী, নাগা ও বহু ভাষা-ভাষী ভক্তবৃন্দের আগমনে হরিদ্বার হ'তে কংখল অবধি জনতায় পূর্ণ হ'ল। অনাড়ম্বর, চিত্তাকর্ষক এই পবিত্র মেলায় প্রায় ৬।৭ লক্ষ ভক্তবৃন্দের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে গেল। কোথাও রয়েছে টাঙ্গানো তাঁবুর পর তাঁবু আবার কোথাও বংশছত্র বা কঞ্চির কুটীরে অবস্থান ক'রছেন নানা পন্থীর সাধু-সন্ন্যাসীরা। কেউ জটাধারী আবার কারো মস্তক মুণ্ডন শিখামাত্র সার, পন্থীর নিদর্শন। তুলসী রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক বা মহাশঙ্খ মালায় তাঁরা ভূষিত। পন্থী অনুযায়ী লেংটী, গৈরিক, রক্ত বা শ্বেত বসনে কেউ সজ্জিত আবার কেউ দিগম্বর ও ভস্মরাগে আবৃত। উগ্রপন্থী নাগাদের রয়েছে বিভিন্ন আখড়া, লোকালয় হ'তে কিছুদূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর জঙ্গলে। খরস্রোতা ভাগিরথীর উভয়তীরে চলেছে অহরহ বেদগান, রামনাম, হরি-সংকীর্ত্তন বা চণ্ডীপাঠ। খোল করতাল ও মৃদঙ্গের গুঞ্জন ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, ওঁকার নাদ বা হর-হর শব্দ, গুরুগম্ভীর স্বরে। বিভিন্ন শব্দের একত্র সমাবেশে মুখরিত হ'ল হরিদ্বার গম্ভীর রসে কুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে। কাতর প্রার্থনা, আবেগ ভরা আহ্বান, গুরু গম্ভীর নাদ ও ভক্তের আঁখিনীরে আজ শ্রীহরির দ্বার সিক্ত। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ প্রতীক্ষায় থাকার পর আজ ভক্তবৃন্দ কেউ স্তব-স্তুতি, দান-ধ্যান বা নামে মত্ত। আহা, কি পূণ্যদিন, ঐতো আভিসারে আদর ক'রে ডাকছেন শ্রীহরি, "ওরে অমৃতস্যপুত্রাঃ, আমার প্রিয় কোটি কোটি সন্তান, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয় ছুটে আয়, আজ এই মহান্ শুভদিনে নামরূপ অমৃত একটু আস্বাদ করে যা।" মধুর এ আহ্বান মোহান্ধ সন্তানদের প্রতি শ্রীভগবানের অসীম করুণার দান। দেহ গরল, আত্মা অমৃত, রিপু-দানব-দৈত্য।

"বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেব পুরোহিতে।
গঙ্গাদ্বারে চ কুম্ভাখ্যাঃ সুধা মেতি নরোয়তঃ॥"

বসন্তকালে বৃহস্পতি যখন বিষুব সংক্রান্তিতে (মেষ রাশিতে রবির সংক্রমণ কালে) কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করেন তখন গঙ্গাদ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়।

"মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগ : কুম্ভ্যাখ্যস্তীর্থ নায়কে ॥"
(স্কন্দপুরাণ)

মেষ রাশিতে বৃহস্পতি, মকর রাশিতে চন্দ্র ও রবি এবং অমাবস্যা তিথি হইলে প্রয়াগতীর্থে অমৃত কুম্ভ হয়।

"কর্কেগুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্র ক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভো জায়তেহবনী মণ্ডলে ॥"
(স্কন্দপুরাণ)

কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি, রবি ও চন্দ্র অবস্থান করিলে এবং অমাবস্যা যোগ হইলে গোদাবরী নদীর তীরে (নাসিকে) মুক্তিদায়ক কুম্ভযোগ হয়।

"ঘটে সূরি শশিসূর্য্যা দামোদরে স্থিতা যদা।
ধারায়াং চ তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥"
(স্কন্দপুরাণ)

তুলা রাশিতে রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতির সংযোগ এবং অমাবস্যা তিথি হইলে উজ্জয়িনীতে সুধা কুম্ভ যোগ হয়।

দেহাভ্যন্তরে সহস্রার পদ্মে (মস্তকে) ক্ষিরোদ সমুদ্র বিরাজিত এই সমুদ্রে অমৃত (আত্মা) নিহিত রয়েছেন। দুগ্ধকে আলোড়ন ক'রলে যেমন মাখন ভেসে উঠে তেমনি এই ক্ষিরোদ সমুদ্রকে মন্থন ক'রলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ সুধা পাওয়া যায়। সুধা হ'ল বিশুদ্ধ জ্ঞান বা আনন্দ। এই মন্থন কার্য্যে প্রয়োজন হয় মন্দার পর্ব্বত রূপ সুদৃঢ় মন, দণ্ড ; বাসুকী সর্পের ন্যায় সংযম রূপ রজ্জু ; ধৈর্য্যরূপ মহাকূর্ম্ম পীঠ বা আধারে যদি মন্থন করা যায় তবে মোহ-রূপ কালকূট ভেদ ক'রে অমৃত বা অমরত্ব লাভ হয় এই অমৃত আমাদের তমোগুণ বিশিষ্ট দেহ ঘটে বা কুম্ভে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে অহং ভাব নিয়ে আবদ্ধ রয়েছেন। রিপুগণ এক একটি দানব বা দৈত্য এবং ইন্দ্রিয় সকল তাদের অনাচার ক্ষেত্র। আত্মা অজর-অমর তাঁর মৃত্যু নাই তাই তিনি অমৃত।

আধ্যাত্মিক বিচারে সত্বঃ, রজো ও তমোগুণ সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন ওত-প্রোত-ভাবে সাম্য অবস্থায় বিদ্যমান ছিল ঐ অবস্থাই হ'ল ক্ষিরোদ সমুদ্র। ওঁ, কার শব্দের আলোড়নে যেমন ত্রয়ী ধর্ম্ম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিবের আবির্ভাব হয় তেমনি ত্রিগুণাত্মিকা এই পরাপ্রকৃতি হুঁকার শব্দের দ্বারা মন্থন হ'য়ে অমৃত কণা (সত্বগুণ) প্রকাশ পায়। এই অমৃত কণাই হল জীবাত্মা এবং রজো ও তমোগুণ যুক্ত পঞ্চভূতময় গরল দেহই হ'ল কুম্ভ বা ঘট, জীবাত্মার আধার অর্থাৎ মায়ামন্ত্র

দেহ। মন্থনই হ'ল সাধনা বা মন্ত্রজপ, মন্থন দণ্ড হ'ল মন। ক্ষিরোদ সমুদ্র অর্থে চিত্তে সৎ'এর ভাবনা এবং এই ভাবনায় লাভ হয় বিশুদ্ধ অখণ্ড আনন্দ বা অমৃত।

মহানন্দ গিরি মহারাজের নির্দ্দেশ মত, ১০ই এপ্রিল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুর হ'তে গাড়ী বদলের জন্য নামলেন ভক্ত, লুধিয়ানাতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র মহাশয় বৈকাল পাঁচটার সময়। পরের পর অনেক গাড়ী চলে গেল কিন্তু, অত্যাধিক ভীড়ের জন্যে রাত্র ১১টা অবধি তিনি কোন গাড়ীতেই উঠতে পারলেন না। হতাশায় তাঁর বুক ভরে গেল। ভাবীগুরু মহানন্দ মহারাজের নির্দ্দেশ তিনি পালন করতে পারলেন না, এ জীবন তাঁর বিফলেই গেল। মর্ম্মান্তিক এই বেদনায় তিনি কাতর হ'য়ে প্ল্যাটফর্ম্মের এক কোণে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। বড় আশা ক'রে পথে বেরিয়েও তাঁর হরিদ্বার যাওয়া হ'ল না। হতাশপূর্ণ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তিনি ভাবী গুরুকে স্মরণ ক'রতে লাগলেন। আকুলি বিকুলি প্রাণের ব্যাথা একমাত্র গুরু ছাড়া এ মর জগতে কে আর বুঝবে? গুরু বড় কঠিন তত্ব, বিচার ও বুদ্ধির বহির্ভূত এই তত্ত্বে নাই আদি ও অন্ত। পরীক্ষার অজুহাতে অন্তরালে রাখেন গুরু নিজেকে গোপন, শাসনাধীন শিষ্যের মঙ্গল কামনায়। গুরুর কৃপা ও ইচ্ছায় লাভ করে শিষ্য ইষ্টকে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে। অন্তরে অন্তর্দ্ধান ও বাহিরে প্রকাশমান হলেও গুরু তুচ্ছ নর বা নারী নন। বহিপ্রকাশ হ'তে শ্রীগুরুর চরণ যুগল অভ্যন্তরে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল প্রধান কর্ত্তব্য ও সাধনা।

"তাই তো কি করি, পর পর তিনখানি ট্রেন চলে গেল, ভীড়ের জন্যে একখানিতেও উঠতে পারলাম না। গুরুদেব কৃপা করুন।" এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে প্রফুল্লবাবু ছট্-ফট্ ক'রতে লাগলেন। মন ছুটে চলে যায় দূরে বহুদূরে গম্য-অগম্য স্থানে কাল্পনিক চিন্তায় কিন্তু, যেতে পারেনা মনের আধার এ স্থূল দেহ মনের সাথে, তাই এত চিন্তা আসে মানব জীবনে। দেহ-মন ও প্রাণকে এক করাই হল সাধনা। স্থূল ভূতকে সুক্ষ্মতত্বে মিশিয়ে দেওয়াই হ'ল সাধনা। স্থূল ভূতকে সুক্ষ্মতত্ত্বে মিশিয়ে দেওয়াই হ'ল যোগ বা সংসিদ্ধিলাভ। এই অবস্থায় সাধকদের কাছে অসম্ভব ব'লে কিছুই থাকেনা।

কিছুক্ষণ পরে আর একখানি ট্রেণ এসে থামলো ষ্টেশনে। ছোট পুঁটলীটি হাতে নিয়ে ছুটলেন প্রফুল্লবাবু ভীড় ঠেলে। প্রতি কামরাটি যাত্রীতে পূর্ণ, ট্রেনের শেষ দিকে চাকরদের ছোট একটি কামরায় তিনি জোর করে উঠলেন। কামরাটি এত ছোট যে একটি মাত্র বেঞ্চিতে ছয়জন নিম্ন শ্রেণীর

রেল কর্ম্মচারী ঠেসা-ঠেসি ক'রে ব'সে আছে। শ্রীগুরু বাবার কি অসীম কৃপা, দু-জন কর্ম্মচারী প্রফুল্ল বাবুকে আসন ছেড়ে দিয়ে নিয়ে ব'সলো। গাড়ী ছাড়লো প্রফুল্ল বাবুর ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। তিনি বেশ আরামেই ব'সে যেতে লাগলেন। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল বাবুর শ্রান্ত দেহে ঘুম এসে গেল, তিনি ব'সে ব'সে ঢুলতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে অন্য কর্ম্মচারীরা বেঞ্চি খালি ক'রে দিয়ে নীচে ব'সলো। সারারাত্র তিনি বেশ আরামে নিদ্রা গেলেন। প্রভাতে যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো তখন তিনি দেখে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন যে বহুলোক, কামরার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু, কেউই তাঁকে বিশ্রামে বিরক্ত করেনি। বেলা ৯টার সময় ট্রেন যখন হরিদ্বারে পৌছল তখন ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমটি যাত্রীর ভীড়ে পূর্ণ। পথে, ঘাটে, মাঠে চতুর্দ্দিকেই বহুযাত্রীর সমাবেশে কোলাহলে সরগরম রয়েছে। এই জন সমুদ্র ভেদ ক'রে তাঁকে যেতে হবে কংখলে। অজানা এদেশ, কংখল যে কোনদিকে এবং ভাবী গুরুর আশ্রমই বা কোথায় তা তিনি জানেন না। বহুলোকের সমাবেশ হয়েছে, যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত, কে কার খোঁজ রাখে। কোন্ দিকে যাই এবং কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, এই ভাব মনে পোষণ ক'রে যখন তিনি ইতস্ততঃ ক'রছেন সেই সময় একজন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তাঁর হাত হ'তে পুঁটলীটি নিয়ে বল্লে, "আমি কংখলের পথ চিনি, আমার সঙ্গে চলুন।" সামান্য পয়সার লোভে বালক বেশ যত্ন সহকারে কংখলে নিয়ে গেল। কংখলে পৌছে মহারাজের আশ্রম খুঁজে না পাওয়ায় প্রায় ২ ঘণ্টা বিলম্ব হ'ল। এক সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করায় সে মহারাজের আশ্রম দেখিয়ে দিল। বালকের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেবার পর যখন প্রফুল্লবাবু ভারামল বাগান বাড়ীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন সেই কুটীরের অন্তঃপুর হ'তে এক ভদ্রলোক ফটকের কাছে উপস্থিত হ'য়ে, বেশ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ফিরোজপুর হ'তে আসছেন?" "আজ্ঞে হ্যাঁ", উত্তর দিলেন প্রফুল্ল বাবু। "ভিতরে আসুন দেরী ক'রবেন না, পিতাজী আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন। এই কথা ব'লে প্রফুল্লবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভদ্রলোক ভিতরে প্রবেশ ক'রলেন।

ভাবী গুরুর দর্শন লাভ ক'রে প্রফুল্লবাবু খুবই আনন্দিত হ'লেন। ভক্তিভরে শ্রীগুরুকে প্রণাম ক'রে তিনি ট্রেনে ভীড়ের কথা বললেন। তাতে মৃদু হেসে মহারাজ বল্লেন, "ভীড় হলে কি হবে, তুমি তো বাবা, সারারাত সুখে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ।" ভাবী গুরুর মুখে এই কথা শুনে প্রফুল্লবাবু স্তম্ভিত

হলেন। "তা হলে ত ইনি সাধারণ মানুষ নন, নিশ্চই অন্তর্যামী।" এই কথাই তাঁর মনে বারংবার উত্থিত হ'তে লাগলো। সে দিনটা কেটে গেল তাঁর বিশ্রামে। পরদিন প্রভাতে তাঁর নবজীবন লাভ হবে মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণে। সাংসারিক আবহাওয়ার কলুষ স্পর্শে, ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে তখন সে খোঁজে যে কোন অবলম্বন শান্তি পাবার আশায়। অশান্ত জীবনে সে পায় একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ শান্তির প্রতীক গুরুকে। যে গুরু সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে পেয়েছেন শান্তিময়ের সন্ধান একমাত্র তিনিই পারেন শিষ্যকে শান্তি দান ক'রতে। ত্যাগে শান্তি, ভোগে দুঃখ এই হ'ল গুরু স্থানীয় মহাপুরুষদের উক্তি। তাই একমাত্র ত্যাগী গুরুই পারেন শিষ্যের চিত্তে ত্যাগের বীজ রোপন ক'রে শান্তির পথ দেখাতে। এই চির শান্তির একমাত্র উৎস হ'লেন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। শিব-শক্তি, সীতা-রাম, কৃষ্ণ-রাধা যে কোন দেব-দেবীই হোন না কেন, মূলতঃ ঐ একই উৎসের অবদান। গুরুতে গুরুত্ব বোধই হল সাধনার প্রধান সোপান। গুরুভক্তি না থাকলে দেবতার কৃপা লাভ করা যায় না। গুরুই ইষ্ট, গুরুই ব্রহ্ম যাঁর এই বোধ মজ্জাগত হয়েছে, তাঁর কাছে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই।

সারারাত কেটে গেল কিন্তু, প্রফুল্লবাবুর ভাল ঘুম হ'ল না। শুভ কাজে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাই যতক্ষণ না পর্য্যন্ত শুভ কাজ শেষ হয় ততক্ষণ মানুষ বিচলিত থাকে। অতি প্রত্যূষে প্রফুল্লবাবু শয্যা ত্যাগ ক'রে, হাত মুখ ধুয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নান করে ফিরে এসে তিনি ঠাকুর ঘরে পূজার আয়োজনে মন দিলেন। পূজার আয়োজন শেষ হলে মহারাজ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করলেন। প্রফুল্লবাবু ঘরের বাহিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহারাজ মায়ের পূজা শেষ করে যখন দ্বার খুললেন তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। মহারাজের ইঙ্গিতে প্রফুল্লবাবু ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন। মহারাজের অসীম কৃপায় আজ প্রফুল্লবাবু পুণ্য জীবন লাভ করলেন। দীক্ষার পর গুরুদক্ষিণা দিতে হয় কিন্তু, যে গুরু দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ রাশি নিজে গ্রহণ করেন, সেই গুরুকে শিষ্যের এমন কি সম্পদ থাকতে পারে যে তীব্র ভক্তি ব্যতীত, গুরুকে দক্ষিণা দিতে পারেন? তন্ত্রে পঞ্চোপচারে দক্ষিণার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু সে দক্ষিণা, স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র খণ্ড নয়।

"আলিঙ্গনাৎ ভবেন্ন্যাস
শ্চুম্বনম্ ধ্যান মিরিতং,

আবহনাৎ শীৎকার,
নৈবেদ্যং অম্লুলেপনং
জপনং রমণং প্রোক্তং
রেতপাতঞ্চ দক্ষিণা
সর্ব্বথৈব ময়া গোপ্যং
মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে ॥”
(তন্ত্রসার)

এই পঞ্চোপচার বীর সাধনার অন্তর্ভূক্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুকে জয় করার আচারই হ'ল বীরাচার। এই আচারে প্রয়োজন নেই বিশ্বাস, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যুক্তি। এই আচারে নিহিত আছে তীব্র ব্যাকুলতা, আহ্বান, ও আবেগ ভরা শিশুর মত সরলতা।

১। সরল শিশুর ন্যায় আবেগ ভবে মা-মা শব্দে কাঁদাই হল ন্যাস।

২। শিশু যেমন মায়ের গলা জড়িয়ে চুম্বন দেয় ও খায় এই অবস্থাই হল ধ্যান

৩। আবেগে শিশু যখন মা-মা শব্দে অস্থির হ'য়ে চিৎকার করে তাই হল আহ্বান।

৪। কাছে পেয়ে শিশু আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে, এই ভাব হল নৈবেদ্য।

৫। মায়ের কোল পেয়ে হাত পা ছুঁড়ে শিশুর খেলা করাই হ'ল রমণ বা জপ।

৬। মায়ের কোলে খেলায় মত্ত শিশুর মল মূত্র ত্যাগ ও লালা ঝরে, এই হ'ল রেতঃ পাৎ বা দক্ষিণা। সরলভাবের উদয়ে, স্নেহ বিগলিত বাৎসল্যে সন্তানের দাবীর অধিকারে প্রাধ্যান্য বিস্তার ক'রে। এই তত্ত্ব তন্ত্রের নিগূঢ় সত্ত্ব এবং কঠিন তত্ত্ব। নিষ্কাম সরল শিশুর ন্যায় দাবী ও স্নেহের মিলনে সাধক সহজে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হন। আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীকে হর এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

ডাকার মত ডাকলে পরে
মা কি কভু থাকেন সরে
এই মা বুলি যে মহামন্ত্র,
নয় কো শ্রেষ্ঠ পুরাণ তন্ত্র

যে ডাকে সরল মনে
মা-মা বলে মুক্ত প্রাণে,
আসেন মা কৈলাস ছেড়ে
সদা ব্যস্ত সন্তান তরে॥

অপরাহ্ন কাল, হাতে একটি চিমটা নিয়ে অগ্রসর হ'লেন মহারাজ সাধু দর্শনে নূতন শিষ্য প্রফুল্লবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। পথে মহারাজ যেখানেই সাধু দেখেন সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন কর যোড়ে। তাঁরাও প্রতিবাদন দেন স্মিতহাস্যে মহারাজকে। কোথাও ধুনি জ্বলছে, কোথাও চলছে মালা জপ, কেউ ধ্যানস্থ, আবার কেউ নাম গানে মত্ত। শান্ত গম্ভীর উদাস ভাবে হরিদ্বার আজ ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। কোথাও সুপক্ক জটাজুট গুম্ফ ও বিলম্বিত শ্মশ্রুধারী অতি প্রাচীন সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ রয়েছেন আবার কোথাও হট্-যোগী বাহু উত্তোলন করে বা এক-পদে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। যে যার পঙক্তি অনুযায়ী নিম্নে মস্তক, ঊর্দ্ধে পদ-দ্বয়, বা বিভিন্ন আসনে সমাসীন আবার কেউ কুম্ভক বায়ু রোধ ক'রে গর্ত্তের মধ্যে উপবিষ্ট। বহুমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহারে প্রকৃত সাধু ও সন্ন্যাসীরা সাধনায় রত। অপূর্ব্ব এই দৃশ্য, শ্রদ্ধায় নত হয় মস্তক দর্শন-স্পর্শন ও আস্বাদনে। বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু ও সন্ন্যাসীদের দর্শন ক'রে ফিরে এলেন মহারাজ, শিষ্যসহ নিজ আশ্রমে। শুভ ১৪ই এপ্রিল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হ'ল অমৃত কুম্ভের স্নান সকাল ৮টা হ'তে। প্রথমে স্নান ক'রলেন ভাগীরথীর পবিত্র শীতল জলে নাগাদল, তারপর অন্যান্য সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ ভাবে। মহারাজও তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্নান ক'রলেন ব্রহ্মকুণ্ডে। ব্রহ্মকুণ্ড অর্থে ব্রহ্মযোনি, যেখান হ'তে জীব-জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। স্নানের পর হরিদ্বার খালি হ'য়ে গেল। সাধু সন্ন্যাসীরা চলে গেলেন যে যাঁর ডেরায়, বনে জঙ্গলে বা গিরি গুহায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গায় স্নান সেরে মহারাজ ভক্তদের নিয়ে কংখল আশ্রমে ফিরে এলেন।

(১৫)

* অমৃতসরের হিন্দুসভা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীদ্বারিকানাথ (পাঞ্জাবী) আর্য্যসমাজের গোঁড়া সভ্য। দৈববিড়ম্বনায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। কুম্ভযোগে মৃতা পত্নীর ভস্ম পবিত্র গঙ্গানীরে বিসর্জ্জন দেবার জন্য তিনি তাঁর ভ্রাতৃ-বধূকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে এসেছেন কুম্ভযোগের

* এই তথ্য সরবরাহ ক'রেছেন মহারাজের শিষ্য শ্রীদ্বারিকানাথ (পাঞ্জাবী)।

দু-একদিন পূর্ব্বে। ভ্রাতৃ-বধু অতিশয় শোক-সন্তপ্তা, তিনি ৮টি সন্তানের মাতা হ'য়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ সব কয়টি সন্তানকে হারিয়েছেন। কিছু শান্তি পাবার আশায় তিনি এসেছেন তাঁর ভাসুরের সঙ্গে হরিদ্বারে। মেলা ভেঙ্গে যাবার পর ভ্রাতৃ-বধু সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁর কাছে ছুটে যান এবং নিজ দুঃখ কাহিনী ব্যক্ত করেন। মান-মর্য্যাদা এবং অর্থ সম্পদের কোন মূল্য নেই, যে বংশে সন্তান না থাকে। নারীতত্ত্বে মাতৃত্ব সত্তাই বাৎসল্যের প্রধান উপাদান। মা হওয়া এবং মা, বুলি শোনার তীব্র বাসনা থাকে, নারী জাতির হৃদয়ে গুপ্ত।

সৃষ্টি ও স্থিতির সংবিধানে মঙ্গলময় ভগবান কোমল প্রাণ দিয়েছেন নারীজাতিকে স্নেহ ও বাৎসল্য দানে।

একদিন অপরাহ্ন কালে চশমা চোখে, এক চক্ষুহীন সন্ন্যাসীকে গঙ্গার পুলের উপর উপবিষ্ট দেখে দ্বারকানাথ বাবুর ভ্রাতৃ-বধু তাঁর পদযুগল স্পর্শ ক'রে, চোখের জলে নিজ দুঃখ কাহিনী ব্যক্ত ক'রলেন। তাতে সন্ন্যাসী সমবেদনা জানিয়ে বল্লেন, "মা, আমার এমন শক্তি নেই যে, আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করি। বর্ত্তমানে হরিদ্বারে এমন কোন সন্ন্যাসী আছেন ব'লে মনে হয় না, যিনি আপনার দুঃখের লাঘব করতে পারেন। তবে কংখল হ'তে অতি প্রত্যূষে প্রত্যহ প্রচ্ছন্নভাবে গঙ্গাস্নানে এক মুনি আসেন, তাঁকে যদি ধ'রতে পারেন তাহলে আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হ'তে পারে।" সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় নিয়ে তিনি ধর্ম্মশালায় ফিরে এলেন। পরদিন প্রত্যূষে যখন মহারাজ গঙ্গাস্নানে এলেন সেই সময় দ্বারিকানাথ বাবুর ভ্রাতৃ-বধু তাঁর পদযুগল জড়িয়ে ধরে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানালেন। শোকাতুরা জননীর কাতর প্রার্থনায় মহারাজ সন্তুষ্ট হ'য়ে গঙ্গাগর্ভ হ'ত একটি নুড়ি পাথর তুলে তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই নাও মা তোমার পুত্র, এই নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। দশ মাস অবধি ভক্তিভরে শিবজ্ঞানে প্রতিদিন পূজা ও আরতি ক'রো, যেন কোনদিন অবজ্ঞা ক'রো না। নয় মাস পরে পুত্র সন্তান লাভ হ'লে ঐ পাথরটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিও।" মহারাজ আর কোন কথা না বলে, গঙ্গাস্নান সেরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ ক'রলেন! এই ঘটনার পর ভাসুর ও ভ্রাতৃবধু হরিদ্বার ত্যাগ ক'রে বাড়ী ফিরে গেলেন।

হরিদ্বার হ'তে বাড়ী ফিরে, দ্বারিকানাথ বাবু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথের কাছে সাধু প্রদত্ত নুড়ি ও আশীষের বিষয় জানালেন, তাতে দীননাথ সাধুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে বল্লেন, "ও সব আমি বিশ্বাস করি না।" দ্বারিকানাথ বাবু আর ও বিষয়ে কোন আলোচনা না ক'রে অন্য আলোচনা

আরম্ভ ক'রলেন। যাই হোক দীননাথ, সাধু সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রলেও তাঁর পত্নী শ্রদ্ধা সহকারে সাধুর নির্দ্দেশ পালন ক'রতে লাগলেন। দশ মাসের মধ্যেই তিনি এক হৃষ্ট-পুষ্ট পুত্র প্রসব ক'রলেন। পুত্র সন্তান লাভ করায় দীননাথের সাধুর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় হ'ল। তিনি সাধুর নির্দ্দেশ মত সেই নুড়ি পাথরটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। যে সময় তিনি নুড়ীটি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেন সেই সময় দৈবক্রমে মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরস্পর আলোচনায়, ইনিই যে সেই শক্তিধর সাধু তা জানতে পেরে দীননাথ সাধুর চরণ যুগল স্পর্শ করে প্রার্থনা জানালেন, "পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে আপনি কৃপা ক'রে একবার আমার লুধিয়ানার বাড়ীতে পদধূলি দিন।" তাঁর অনুরোধ অবজ্ঞা না ক'রে মহারাজ বল্লেন, "আমি আমার সুবিধামত তোমার লুধিয়ানা বাড়ীতে যাবো এবং তোমার পুত্রকে আশীষ দিয়ে আসবো কিন্তু, এখন যেতে পারবো না।" এই কথা বলে মহারাজ কংখল অভিমুখে অগ্রসর হ'লেন। দীননাথ হরিদ্বার ত্যাগ ক'রে লুধিয়ানা অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন।

কি অদ্ভুত, অলৌকিক অঘটন ঘ'টে গেল দীননাথের বাড়ীতে, তাঁর ফিরে আসার পূর্ব্বরাত্রে যখন তাঁর পত্নী দ্বিতল ঘরের মধ্যে শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াচ্ছেন সেই সময় মহারাজ যোগ শক্তি প্রভাবে শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর সেই সুক্ষ্মাকৃতি স্থূলের ন্যায় পরিলক্ষিত হলেও স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত এবং ভাব গভীরতায় পূর্ণ। তাঁর করুণামাখা শিব-নেত্রদ্বয় ভাবে ঢুলু-ঢুলু। মায়ের কোল হ'তে আদর করে বুকে তুলে নিয়ে তিনি শিশুকে আশীষ দিয়ে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন। জননী শিশুপুত্রকে শয্যায় স্থাপন ক'রে মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে ভাসুরকে মহারাজের আগমন বার্ত্তা জানাতে গেলেন। দ্বারিকানাথ বাবু এই সংবাদ পেয়ে সানন্দে ভ্রাতৃবধূর ঘরে প্রবেশ ক'রে মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রলেন। দীননাথের সঙ্গে মহারাজ এসেছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে দ্বারিকানাথ বাবু নীচে একতলায় নেমে এলেন দীননাথের সন্ধানে। "কি আশ্চর্য্য! নীচে সদর দরজায় অর্গল দেওয়া রয়েছে। নীচের ঘরগুলি সব তালাবন্ধ থাকায় দীননাথ কি ক'রে এল এবং কোথায় গেল? বিস্মিত হ'য়ে তিনি ভ্রাতৃ-বধুকে ডাকলেন, ভ্রাতৃবধূ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "দীননাথ কোথায় গেল, সদর দরজা তো বন্ধ রয়েছে!" তাঁর কথা শুনে ভ্রাতৃবধু অবাক হ'য়ে উত্তর দিলেন, 'তাত জানিনা, তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয় নি।" পরস্পর পরস্পরের

মুখের দিকে অবাক হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দুজনে উপরে মহারাজের সেবার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। যখন তাঁরা ঘরে প্রবেশ ক'রলেন তখন শিশুপুত্রটি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত এবং মহারাজ অদৃশ্য হয়েছেন। পরদিন প্রভাতে যখন দীননাথ হরিদ্বার হ'তে বাড়ী ফিরে এলেন তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পত্নীর মুখে এই অলৌকিক কাহিনী শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। পবিত্র এই ভারতে যোগী মহাপুরুষদের কাছে এরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কর্ম্মানুযায়ী এই মানুষই ভগবান পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে। এই দৈব ঘটনার পর দ্বারিকানাথ বাবু ও দীননাথ বাবু সপরিবারে মহারাজের কাছে দীক্ষিত হন।

(১৬)

উত্তাল তরঙ্গময় বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করবার জন্যে পায়চারী ক'রছেন আহিরীটোলা নিবাসী ধনী ব্যক্তি, ভূতনাথ মিত্র এবং পণ্ডিত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা শ্রীক্ষেত্রে পুরীধামে অতি প্রত্যূষে। রক্তবর্ণ রবি ধীরে ধীরে উঁকি মারলেন দিগ্‌হীন বিস্তীর্ণ জলরাশি ভেদ ক'রে। দৃষ্টির বহির্ভূত পর-পার মিশেছে দিক চক্রবালে, উজ্জল রক্তিম আভায়। হাসে বিস্তীর্ণ নীল আকাশ পুলকে। আনন্দে নৃত্য ক'রে উদিত হলেন রবি মহাশূন্যে কাঞ্চন প্রভায়। স্পর্শ ক'রলো সপ্তরশ্মি, কোলাহল পূর্ণ বিস্তীর্ণ জলরাশি, পীতাভ ছটায়। সুপ্ত পৃথিবীর সদ্য জাগরণে ডাকে জলজ পাখী নানা স্বরে। সানাই, মৃদঙ্গ ও কাঁসর বাজতে সুরু ক'রলো মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের বিরাট মন্দিরে। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে সদ্য জাগরণে, নানা শব্দে কর্ম্ম চঞ্চল হ'ল সদ্যজাগ্রত পৃথিবী। একের উদয়ে, বহুর জাগরণ আলস্য হরণে আঁধার অপসারণ। শান্ত ধীর গম্ভীর সে আননে দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো সহস্রাংশু লোচনে। কনক বরণে, কাননে কাননে পুষ্প চয়নে, ঘোরে বালক ও বালা, করে সাজি লয়ে, পট্ট বস্ত্র পরিধানে। সদ্য স্নাত উদিত তপন ক্রমশঃ বিস্ফারিত নেত্রে প্রকট হ'য়ে উঠলেন উগ্র মেজাজে। শীতল বায়ু উত্তপ্ত হ'ল কিছুক্ষণ পরে। প্রাকৃতিক এ লীলা বিচিত্রভাবে স্বভাবের বৈচিত্রময় খেলা। যে যায় সে আর ফিরে আসে না স্বরূপে, মর এ জগতে কিন্তু, আসে ফিরে স্বরূপে, নিত্য নিয়মিতভাবে, কালের বুকে প্রাকৃতিক নিয়ম নিষ্ঠায় আঁধার ও আলো।

হঠাৎ ভূতনাথ বাবু বল্লেন জয়গোপালবাবুকে, "দাদা! পিতাজী মহানন্দগিরি মহারাজ কংখলে তারা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রবেন, চলুন আমরাও এই

উৎসবে যোগদান করি।" এই শুনে জয়গোপালবাবু বল্লেন, "এতো খুব আনন্দের কথা, চল আজই যাত্রা করা যাক্।" ভূতনাথবাবু পুরীধামে নিজের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে মাঝে মাঝে আসেন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে। আজই তাঁরা হরিদ্বার যাত্রা ক'রবেন বলে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে জিনিষপত্র গোছগাছ ক'রে ফেললেন। আহারাদি শেষ ক'রে তাঁরা দুপুরের ট্রেনে যাত্রা ক'রলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরিদ্বার পৌঁছে তাঁরা পৌরাণিক তথ্য জড়িত কংখল অভিমুখে টাঙ্গায় যাত্রা ক'রলেন। মনোমুগ্ধকর এই পবিত্র স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে বল্লেন জয়গোপালবাবু, "ভগবানের কত রূপ, জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্রই তাঁর বহুরূপ, বহুভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।" চলেছে টাঙ্গা গাড়ী টুং-টুং শব্দ ক'রে কংখলে। কিছুক্ষণ পরে টাঙ্গা এসে থামলো কংখলে ভারামল বাগের সামনে।

এই কংখল অতীত যুগে, প্রজাপতি মহারাজ দক্ষের রাজধানী ছিল। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ সোপান শ্রেণী আজও বিধৌত হচ্ছে পবিত্র গঙ্গানীরে। মহারাজ দক্ষের মন্দির এবং সতীকুণ্ড, কালের বুকে এখন সাক্ষ্য দিচ্ছে বিস্মৃতির মর্ম্মস্থলে। শিবহীন যজ্ঞ এবং পতিনিন্দা করার জন্যে পিতা দক্ষের কু-ব্যবহারে মর্ম্মাহত হ'য়ে সতীদেবী যে কুণ্ডে ঝম্প প্রদান ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন সেই কুণ্ডই সতীকুণ্ড নামে খ্যাত ও পূজিত হয়। সতীদেবীর দেহত্যাগে ভূতনাথ ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে মহারাজ দক্ষকে বধ করেন এবং সতীদেবীর নিষ্প্রাণ দেহ স্কন্ধে ধারণ ক'রে তাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তোলেন। শঙ্করের তাণ্ডব নৃত্যে পাছে ত্রি-ভুবন লয় পায় সেই আশঙ্কায় দেব-বৃন্দ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ক'রেন। দেববৃন্দের আরাধনায় প্রীত হ'য়ে শ্রীবিষ্ণু চক্রের দ্বারা সতীদেবীর পবিত্র দেহ খণ্ড বিখণ্ড করেন। এই পবিত্র দেহ বিষ্ণু চক্রের আঘাতে ৫১টি অংশে বিভক্ত হ'য়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এই কারণে মোট একান্নটি পীঠ জানা যায়।

শব্দ ব্রহ্ম নিত্য, এক ব্যতীত দুই নয়। ওঁকার প্রতীকের মস্তকে যে বিন্দু চিহ্ন রয়েছে তাই হ'ল নির্গুণ ব্রহ্মের চিহ্ন। বিন্দুর নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র, শব্দের প্রতীক। ওঁকার গজ কুম্ভের ন্যায় আকার যাহার তাই হ'ল ওকার। গজ হ'তে পুরাণ এবং কুম্ভ হ'তে বেদান্তের ঘটাকাশ বুঝায়। ওঁকারের মুখে যে, চক্রাকার পুঁটলি রয়েছে তাই হলেন ব্রহ্মা। চক্র অর্থে সীমাবদ্ধ বুঝায়। অর্থাৎ ব্রহ্মাও সীমাবদ্ধ, তিনি সৃষ্টি ব্যতীত স্থিতি বা লয়ের কর্তা নন। ওঁ-কারের মধ্যকার চক্র বা পুঁটলি হ'ল বিষ্ণুর স্থান, তিনিও সীমাবদ্ধ, শুধু স্থিতি-

কারক—সৃষ্টি বা লয়ের কর্ত্তা নন। ওঁকারের প্রান্তভাগ গজশুণ্ডের ন্যায় উর্দ্ধে চলে গিয়েছে ইনি হলেন মহাদেব, যিনি সীমাবদ্ধ নন, তাই দেবাদিদেব নামে অভিহিত। ইনি সীমাবদ্ধ ভাব হ'তে সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কে যেখানে উৎপত্তি হয় সেইখানেই নিবৃত্তি করেন ব'লে এঁর আর এক নাম হল আশুতোষ। শব্দ ব্রহ্ম নিত্য হ'তে বর্ণ ও ভাষার উৎপত্তি হ'য়েছে। জীবের কপালে ভ্রূযুগলের সন্ধি-স্থলে শব্দ ব্রহ্মের স্থান। এই স্থান হ'তে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং এই শব্দ ব্রহ্ম হ'তে অনুলোম ও বিলোম ৫১টি অক্ষর বা বর্ণ পাওয়া যায় যেমন, অং আং ইং ঈং ইত্যাদি। এই এক একটি অক্ষর পীঠ বা পবিত্র অংশ। তাই ৫১টি অক্ষর একান্ন পীঠের নামান্তর। ব্রহ্মের তিনটি ধর্ম্ম যথা সৎ-চিৎ ও আনন্দ। সৎ অর্থে যাহা পূর্ব্বে ছিল এখন আছে এবং পরেও থাকবে। এই সৎ-এর আদ্যাশক্তি হলেন সতী, সতীর কখনও নাশ হয় না তবে মায়া কল্পিত দেহ ধারণে দেহের নাশ আছে। সতী হলেন ব্রহ্ম-জ্যোতি, কালী, তারা ইত্যাদি। সৎ ও অসৎ নিয়ে চলেছে ভগবৎ লীলা যুগ যুগান্তর ধ'রে। অসৎ অর্থে মিথ্যা কল্পিত বস্তু। যেখানে অসৎ সেইখানেই অহংকার জড়িত। মহারাজ দক্ষ হ'ল অসৎ তাই তিনি অহংকারে মত্ত ছিলেন।

বর্হিসত্তাকে দেহাভ্যন্তরে এবং দেহাভ্যন্তরকে বাহিরে প্রকাশ করাই হ'ল যোগীর আত্মদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। অন্তর বাহির এক করাই হ'ল ব্রহ্ম উপাসনা। এক চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় এই জানার জন্যে যোগ সাধনার প্রয়োজন হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভই হ'ল "সোহহং" জ্ঞান লাভ।

জগন্নাথ প্রসাদের ভারামল বাগে মহারাজ ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে অবস্থান ক'রছেন। জয়পুর ষ্টেটের রাজমন্ত্রী, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সেন মহাশয় (মহারাজের ভক্ত) তারামায়ের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আগামীকাল মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হবে তাই ভক্তবৃন্দ রয়েছেন ব্যস্ত উৎসব আয়োজনে। ভূতনাথ বাবু ও জয়গোপাল বাবুর আগমনে মহারাজ খুবই প্রীত হলেন। সন ১৩২২ সাল শুভ ৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ ২০ শে মে, ত্রিতাপ নাশিনী তারামায়ের মূর্ত্তি মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভাত হ'তে বিশেষভাবে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোমযজ্ঞ শেষ হবার পর মহারাজ জয়গোপাল বাবুকে বল্লেন, "তুমি এইবার বেদ পাঠ আরম্ভ কর।" যদিও জয়গোপাল বাবু পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু, তিনি ইতি পূর্ব্বে কখনও বেদ পাঠ করেননি। মহারাজের নির্দ্দেশ পাছে অবমাননা করা হয় সেই কারণে তিনি মহারাজকে ভক্তিভরে স্মরণ ক'রে সামবেদ পাঠ আরম্ভ ক'রলেন।

"ওঁ অগ্নি আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥"

হে সর্ব্ব প্রকাশক পরমাত্মা, সর্ব্ব পদার্থের দাতা আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের উপাসনায় বিরাজমান হও।

মহারাজের কৃপা ও প্রেরণায় জয়গোপাল বাবু উদাত্ত কণ্ঠে সামবেদ পাঠ ক'রে শ্রোতাদের বিমোহিত করলেন। বেদ পাঠে বৈষ্ণবী মায়ের মূর্ত্তি যেন সজীব হয়ে উঠলো। জয়গোপাল বাবুর স্পষ্ট উচ্চারণ, ভাব ও ভাষা এবং সুলোলিত সুর ও ছন্দে বিমোহিত শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেদ গান শ্রবণ ক'রলেন। ভাবাবেগে ভূতনাথ বাবু চিৎকার করে বল্লেন, "ধন্য তুমি দাদা, ধন্য তোমার জীবন। তুমিই প্রকৃত সাধু।" নির্ব্বাক নিস্পন্দ পরিবেশে যখন বেদ পাঠ সাঙ্গ হ'ল তখন মহারাজ ভাব গদ-গদ চিত্তে, আদর ক'রে জয়গোপাল বাবুকে বুকে টেনে নিয়ে আশীষ দিয়ে বল্লেন, "তোমার গোপাল নাম সার্থক হয়েছে, আজ তুমি সকলের অন্তর জয় করেছো, তুমি আনন্দময় পুরুষ।" একজোড়া মূল্যবান কাশ্মীর শাল জয়গোপাল বাবুর করে অর্পণ ক'রে বল্লেন মহারাজ, "এই তোমার দক্ষিণা।" ভক্তিভরে মহারাজকে প্রণাম ক'রে জয়-গোপাল বাবু মায়ের প্রসাদ গ্রহণ ক'রলেন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে।

তারামায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় জলসা উৎসব বেশ শ্রদ্ধাসহকারে উদ্‌যাপিত হল। বহু আতুর দরিদ্র, সাধু, সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃন্দ মায়ের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হলেন। আকাশ বাতাস মুখরিত হ'ল জয় তারা শব্দে। বেদ পাঠের জন্য জয়পোপাল বাবু মহারাজের কাছে স্নেহধন্য হ'লেন। মহারাজের মধুর ও নৈকট্যপূর্ণ ব্যবহারে তিনি মহারাজের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে জয়গোপাল বাবু ও ভূতনাথ বাবু, মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে কংখস হতে ক'লকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ সাবডিভিসনে মায়াপুর-রসুলপুর গ্রামে ১২ই বৈশাখ ১২৫১ সালে (ইং ১৮৪৪ খৃঃ) জয়গোপাল বাবুর জন্ম হয়। পিতা ৺রামতারক বন্দোপ্যধ্যায় এবং মাতা দয়াময়ী দেবী। ৺রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক'লকাতা কুমারটুলিতে এক শিষ্য ছিলেন তাঁর পেশা ছিল পৌরহিত্য। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি যখন 'অন্তিমশয্যায় শায়িত হন সেই সময় সন ১২৬২ সালে তাঁর গুরুদেব ৺রামতারক বাবু নাবালক পুত্র. জয়গোপাল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ক'লকাতায় শিষ্যকে দেখতে এলেন এবং সক্ ষ্ট্রীটে এক ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করেন। শিষ্যের অনেক

সমৃদ্ধিশালী যজমান রয়েছেন ক'লকাতায়। তাঁদের বাড়ীর পূজা পার্ব্বনের ভার গ্রহণ করবার জন্যে শিষ্য গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালেন। শিষ্যের প্রার্থনায় গুরুদেব অরাজী হলেন না, বরং সানন্দেই রাজী হলেন। দু-একদিনের মধ্যেই শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে দেহ রক্ষা ক'রলেন। শিষ্যের যজমানদের বজায় রাখবার জন্যে রামতারকবাবু সপরিবারে ক'লকাতাবাসী হ'লেন। তখনকার দিনে ক'লকাতার ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হ'তো সখ সৌখীনতা এবং অর্থ সম্পত্তির মাধ্যমে। তখনকার দিনে লোকমুখে শোনা যেতো নানা ছড়া ও কবিতা।

"জগৎ শেঠের কড়ি,
আমির চাঁদের দাড়ি,
বনমালি সরকারের বাড়ী, (কুমারটুলির শ্যামসুন্দরের বাড়ী)
অভয় মিত্রের ছড়ি॥"

এই অভয় মিত্র হ'লেন রামতারক বাবুর ধনী যজমান। তাঁর বাড়ীতে ৺কালীপূজার সময় এক বৃহৎ থালায় দশ মন চালের নৈবেদ্য দেওয়া হ'তো এবং পূজার পর সেই নৈবেদ্য আটজন লোকের মাথায় পুরোহিতের বাড়ী পাঠান হ'তো। এই নৈবেদ্যের জন্য রামতারক বাবুর বাড়ীর সদর দরজা বড় করান হয়।

বিধির কি বিধান কয়েক মাস পরে একমাত্র নাবালক পুত্র জয়গোপাল ও বিধবা পত্নী দয়াময়ী দেবীকে রেখে রামতারক বাবু ইহলোক ত্যাগ ক'রলেন। এই দৈবদুর্ব্বিপাকে প'ড়ে একমাত্র নাবালক পুত্রকে নিয়ে দয়াময়ী দেবী খুবই বিব্রত হ'য়ে প'ড়লেন। যজমানদের বাড়ী পূজা করবার জন্যে নবকুমার নামে এক পুরোহিতকে বেতন দিয়ে রাখা হ'ল। সম্ভ্রান্ত যজমানদের সাহায্যে দয়াময়ীর সংসার বেশ ভাল ভাবেই চলে যেতে লাগলো। বাল্যকাল হ'তে জয়গোপাল বাবু খুবই মেধাবী ছিলেন। তের বৎসর বয়সে তাঁর উপনয়ন হবার পর সংস্কৃত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার জন্যে তাঁকে স্থানীয় টোলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। একুশ বৎসর বয়সে তিনি কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় তিনি আদি মেট্রোপালিটন বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে মেট্রো-

এই তথ্য ৺প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে

পলিটন কলেজে তিনি অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীটে নিজস্ব পাকাবাড়ী ক'রে সাঁতরাগাছি নিবাসী উমাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রতনমণীকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী এবং জয়গোপাল বাবুর পিতামহী উভয়ে সম্পর্কীয়া ভাগিনী ছিলেন। এই সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় জয়গোপাল বাবুর আত্মীয় ছিলেন। জয়গোপাল বাবুর তিন পুত্র, ভোলানথ (অমূল্য), শম্ভুনাথ (অপূর্ব্ব), ত্র্যম্বকনাথ (প্রফুল্ল) এবং দুই কন্যা অন্নপূর্ণা ও দুর্গেশনন্দিনী। জয়গোপাল বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র (ত্র্যম্বকনাথ) ৺প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কসপের মালিক ছিলেন। তিনি কারখানার পাশে ২৪১ নং মহারাজ নন্দকুমার রোড সাউথ, বরাহনগর কলিকাতা-৩৬, সপরিবারে বাস করতেন। এই পরিবারবর্গ মহানন্দ গিরি মহারাজের অনুগত ভক্ত।

(১৭)

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ ও চার ধাম দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই ভাব মহারাজের মনে উদয় হওয়া মাত্র তিনি বালকের ন্যায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তীর্থ ভ্রমণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিনা টিকিটে রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে বহু সাধু সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করেন কিন্তু, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অধর্ম্ম করা মহারাজ অন্যায় বিবেচনা করেন। তাহলে উপায় কি হবে? অর্থ তো চাই। তারা মাতেশ্বরী ইচ্ছাময়ী তাঁর কৃপা হ'লে পঙ্গুও পাহাড় ডিঙ্গোতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসে মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এবং অবিচলিত। ভক্ত সন্তানের প্রতি তারামায়ের কি টান, কত করুণা; দু-তিন দিনের মধ্যে কংখল আশ্রমে উপস্থিত হলেন দুই শিষ্য আহিরীটোলার ধনী ব্যক্তি ভুতনাথ মিত্র এবং শ্যামবাজার নীলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীটের প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফরেন পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারী) মহাশয়েরা। হঠাৎ তাঁদের আগমনে মহারাজের খুব আনন্দ হ'ল। তাঁদের কাছে মহারাজ তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন। শ্রীগুরুর বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে ভুতনাথ বাবু ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিসার্ভ ক'রে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী তাঁরা মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা ক'রলেন। প্রথমে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিগ্রহ দর্শন ক'রে জয়পুর অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। জয়পুরে গোবিন্দজিকে দর্শন ক'রে উজ্জয়িনীতে গেলেন। উজ্জয়িনীতে মহাকালম্ (জ্যোর্তিলিঙ্গ) দর্শন করেন।

মোরটাক্কা ষ্টেশন হতে শিবালয়মে ঘৃষ্ণিশ্বর (জ্যোতির্লিঙ্গ); নাসিক রোড ষ্টেশন হতে গৌতমীতটে ত্র্যম্বকেশ্বরে ত্র্যম্বক নাথ (জ্যোতির্লিঙ্গ) দর্শন ক'রে তাঁরা বোম্বাই সহরে উপস্থিত হলেন। ভুতনাথ বাবু ও প্রবোধ বাবুর তত্ত্বাবধানে মহারাজ বেশ আনন্দেই তীর্থ ভ্রমণ ক'রতে লাগলেন। বোম্বাই বন্দর হ'তে জাহাজে তাঁরা ভেরাতল বন্দরে উপস্থিত হ'য়ে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ (জ্যোতির্লিঙ্গ), দ্বারকায় দ্বারকাধীশ এবং দ্বারকা বনে নাগনাথ দর্শন ক'রে পুনরায় তাঁরা জাহাজে বোম্বাই সহরে ফিরে এলেন। দু-একদিন বিশ্রামের পর তাঁরা বোম্বাই হ'তে পুণা যাত্রা ক'রলেন। পুণা ষ্টেশনে কিছু জলযোগের পর তাঁরা ডাকিন্যাসে ভীম শঙ্করম এবং কর্ণুল ষ্টেশন হ'তে শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্ এবং তির্পত্তি হ'তে বালজি দর্শন ক'রে মাদ্রাজে উপস্থিত হ'লেন। মাদ্রাজ হ'তে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ দর্শন ক'রে তাঁরা পুনরায় মাদ্রাজে ফিরে এসে কাঞ্চিপুরম্ অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। সেখানে শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি দর্শন ক'রে তাঁরা পুরীধামে উপস্থিত হ'লেন। পুরীধামে দুই, তিন দিন বিশ্রাম ক'রে জগন্নাথ ও বিমলা দেবীকে দর্শন ক'রে তাঁরা ক'লকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। ট্রেন যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছল সেই সময় মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র মহাশয় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভক্তিভরে মহারাজকে প্রণাম ক'রে বিষন্ন বদনে বল্লেন, "আপনাকে একবার আমার বাড়ী চন্দন নগরে যেতে হবে। মায়ের খুব অসুখ, বাঁচবার আর কোন আশা নেই। তাঁর শেষ ইচ্ছা আপনাকে একবার দর্শন ক'রে, আপনার চরণামৃত পান করেন।" তাঁর বাণী শুনে মহারাজ মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমি যেতে পারবো না, তুমি এখানে অযথা বিলম্ব না ক'রে বাড়ী ফিরে গিয়ে মায়ের সেবা কর।" মহারাজ আর কোন কথা না ব'লে হাওড়া ষ্টেশনের বাহিরে এসে ভুতনাথবাবু ও প্রবোধবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন। চললো গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে মহারাজের প্রিয় শিষ্যা রাধামায়ের বাড়ী। মহারাজকে রাধামায়ের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ভুতনাথবাবু ও প্রবোধবাবু, যে যাঁর নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন। শ্রীগুরুর প্রত্যাখ্যানে প্রফুল্লবাবু খুবই মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলেন। জন্ম-জন্মান্তরের যিনি ত্রাণকর্ত্তা, শিষ্যের অবস্থা জ্ঞাত হয়েও যদি এত নির্ম্মম হন তাহলে তো শিষ্যের বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা মাত্র। আসে মনে অভিমান, বিভিন্ন শিষ্য-শিষ্যার প্রতি গুরুর ইতর বিশেষ ব্যবহার দেখলে। "পিতাজী যখন কৃপা ক'রলেন না তখন বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখবো মা, আমার আর ইহ জগতে নেই।" এই সব অশুভ চিন্তায়

হতাশ ও ব্যথিত হ'য়ে প্রফুল্লবাবু চন্দননগর ট্রেনে উঠলেন। যখন তিনি বাড়ী এসে পৌছলেন তখন তিনি দেখে বিস্মিত হ'লেন, তাঁর রুগ্না মা শয্যার উপর সুস্থ দেহে উপবিষ্টা রয়েছেন। "মা, কেমন আছ?" জিজ্ঞাসা করায় মা, পুত্রকে তিরস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুই কোথায় ছিলি?" পিতাজী এসে আমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন, আমি তোদের কত চিৎকার ক'রে ডাকলুম, তোরা কেউ এলিনা, তোদের বিবেচনা কিছু নেই।" মায়ের মুখে এই কথা শুনে প্রফুল্লবাবু স্তম্ভিত হলেন। নিশ্চল নির্ব্বাক তাঁর অবয়ব, ছল-ছল নেত্রে, অবাক হ'য়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, "আমি অজ্ঞ, অপদার্থ, ভক্তিহীন তাই, তোমার এত কৃপা থাকলেও তোমায় ভুল বুঝেছি। নরাকারে তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ তা এখন বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রছি। প্রভু! এ দাসানুদাসকে তুমি ক্ষমা ক'রে এ পাপ মন হ'তে মুক্ত কর।" নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, সংযত ভাবে পুত্র, মাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "মা, এখন তুমি পূর্ব্বের চেয়েও ভাল আছ ত?" একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে মা, আগ্রহসহকারে উত্তর দিলেন, "পিতাজীর আশীর্ব্বাদে আমার রোগ সেরে গিয়েছে তবে একটু দুর্ব্বল হ'য়ে গেছি।" কয়েকদিনের মধ্যে মহারাজের অসীম কৃপা এবং আশীর্ব্বাদে প্রফুল্লবাবুর মাতা ঠাকুরাণী সবল সুস্থ দেহ লাভ ক'রলেন।

এই তথ্য সরবরাহ করছেন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র মহাশয়।

১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসের শেষ দিকে মহারাজ রাধামায়ের বাড়ী ত্যাগ ক'রে বৈদ্যনাথ ধাম অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ক'রে সেই দিনই তিনি কাশীধাম যাত্রা ক'রলেন। কাশীধামে পৌঁছে গঙ্গায় স্নান ক'রে, বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী দেবী (সতীদেবীর অক্ষী) ও দুর্গাবাড়ী দর্শন ক'রে দুই একদিন কাশীধামে অবস্থান ক'রে তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। দিল্লী হ'তে ৩০শে মার্চ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হরিদ্বারে গেলেন। এই তীর্থ পর্য্যটনে প্রায় দু-মাস কাল অতিবাহিত হয়।

(১৮)

১৯১৭ খৃঃ এপ্রিল মাসের শেষ দিকে যখন মহারাজ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান ক'রেন সেই সময় বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি তাঁকে দর্শন ক'রতে আসতেন। বিখ্যাত পাইন কুটীর হ'তে অনেকেই আসতেন

মহারাজের কাছে তাঁর অমৃতময় আধ্যাত্মিক বাণী শোনবার জন্যে। বর্ত্তমানে যিনি মহানন্দ মিশনে, "পিতাজী ভবানন্দ গিরি", নামে খ্যাত ও পূজিত হন, যাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীভবানীপ্রসন্ন পাইন, তিনি পূর্ব্বে ছিলেন সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি বীতস্পৃহ। গেরুয়া বসন পরিহিত জটা-জুটধারী সাধু-সন্ন্যাসীরা সব ভণ্ড এবং বিনাপুঁজীর চতুর কারবারী এই ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। কয়লার মধ্যেই যে বহুমূল্য ঝক্‌ঝকে হীরে পাওয়া যায় সে ধারণা তাঁর একেবারেই ছিল না। ভবানীবাবুর আত্মীয় স্বজনেরা মহারাজের কাছে ঘন-ঘন যাতায়াত করেন এবং তাঁদের মুখে মহারাজের অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করেও ভবানীবাবুর স্বভাবের একটুও পরিবর্ত্তন হ'লনা বরং মহারাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগলো। এই নাস্তিক ব্যবসায়ী ভবানীবাবু, মহারাজের প্রতি এত বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন যে, তিনি মনস্থ কর'লেন, এই সাধুকে অপমান ক'রে বেনারস ছাড়া ক'রবো। মহারাজকে অপমান ও লাঞ্ছিত করবার জন্যে তিনি ফিকির খুঁজতে লাগলেন। লোকমুখে তিনি, মহারাজের যত প্রশংসা শোনেন ততই তাঁর ক্রোধ বেড়ে যায়।

ভগবানের কি সুক্ষ্ম বিচার, ভক্তের প্রতি কত টান, কত অনুরাগ, হঠাৎ ভাবানীবাবু এক জটিল মামলায় জড়িয়ে প'ড়লেন। প্রকৃত এক সাধু ব্যক্তিকে অপমান ক'রতে গিয়ে নিজেই অপমানিত হ'তে ব'সেছেন। এই মামলা হ'তে যদি তিনি অব্যাহতি না পান তাহলে তাঁর বল-বিক্রম, মান-মর্য্যাদা সবই চিরতরে লোপ পাবে এবং জেল হাজতে বাস করতে হবে সুদীর্ঘকাল ধরে। অযথা পরের ক্ষতি ক'রতে গেলে নিজেরই ক্ষতি হয় বেশী। যাই হোক্ প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ক'রতে গিয়ে এখন ভবানীবাবুর সময়ে আহার নেই, রাত্রে ঘুম নেই, মনে একটুও শান্তি নেই। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিবা-রাত্র মামলার চিন্তায় তিনি পাগলের ন্যায় ছট্‌ফট ক'রে বেড়াচ্ছেন। একদিন কারবার হ'তে বাড়ী ফেরবার পথে মামলার বিষয় চিন্তা ক'রতে ক'রতে যখন তিনি মহারাজের আশ্রমের নিকট উপস্থিত হলেন. সেই সময় মহারাজ দ্বিতল ঘরের গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "ভবানী। আমার কাছে এসো।" কি জানি, কি এক সম্মোহিনী শক্তির আকর্ষণে বিমোহিত হ'য়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভবানীবাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী প্রবেশ ক'রতে বাধ্য হলেন। যখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠেছেন সেই সময় মহারাজ তাঁর কাছে নেমে এসে, মামলার রায়, বিচারপতি কি দেবেন, সে কথা সব

তিনি বলেদিলেন। লজ্জা ও ক্ষোভে ভবানীবাবুর চোখে জল দেখা দিল। অহংকারে পূর্ণ তাঁর উচ্চশির, শ্রদ্ধায় মহারাজের শ্রীপাদ-পদ্মে নত হ'য়ে প'ড়লো।

*"মেরেছো কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দিব না? মেরেছো বেশ ক'রেছো; একবার হরি ব'লে নাচ দেখি ভাই।" এই ভাব নিয়ে মহারাজ ভবানীবাবুকে বুকে টেনে নিয়ে আশীষ দিয়ে বল্লেন, "কোন ভয় নেই বাবা, তারামাতেশ্বরীর কৃপায় তোমার সব পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। কাল এসো, তোমার জন্যে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কলাপ ক'রবো তাহলেই সব বিপদ হ'তে উদ্ধার পাবে।" অনুশোচনায় ক্ষুব্ধ ভবানীবাবুর মুখ দিয়ে একটি কথাও স'রলোনা শুধু নিঃসাড়ে ঝ'রে প'ড়তে লাগলো চোখের জল। ভেকধারী সাধু-সন্ন্যাসী এবং পাগলের মধ্যে কত যে, ত্যাগী মহাপুরুষ আত্মগোপন ক'রে থাকেন তা কে জানে। মানুষ হ'য়ে কোন মানুষকেই হেয় জ্ঞান বা অনাদর করা উচিত নয়। স্বভাবের দোষে আমরা অপরের দোষ ত্রুটি ধরি এবং সমালোচনা করি কিন্তু, নিজের দোষ ত্রুটির সমালোচনা করি না। এই স্বভাবের দোষ নীচ মনোভাবের পরিচায়ক। যে চিত্তে দেবতার অধিষ্ঠান হয় সেই ক্ষেত্রে কলুষ চিন্তা বা শত্রুকে স্থান দিলে চিত্ত কলঙ্কিত হয় এবং পশ্চাৎ বিষময় ফল হয় মানসিক উত্তেজনায়। তাই সুচিন্তা ছাড়া কুচিন্তা আনা উচিত নয়।

পরদিন প্রভাতে মহারাজের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে ভবানীবাবু ভবিষ্যতে সকল বিপদ হ'তে ত্রাণ পেলেন। এই ঘটনার পর ভবানীবাবু মহারাজের খুবই অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়লেন। যতদিন মহারাজ কাশীধামে ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন, ভাবনীবাবুও তত দিন নিত্য মহারাজকে দর্শন ক'রতে যেতেন এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন।

বরুণা ও অসি নদী হ'তে কাশীধামের আর এক নাম হয়েছে বারাণসী। এই স্বর্গরাজ্য কাশীধামে একদিন ভিক্ষা মেগে খেয়েছিলেন তীর্থরাজ বাবা বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। আদ্যাশক্তি মহামায়া মায়ের শক্তিতে শক্তিবন্ত শিব, শক্তিহারা হ'য়ে শবে পরিণত হ'য়েছিলেন দুটি অন্নের জন্যে। তাই তিনি অন্নপূর্ণাদেবীর মুখপানে চেয়ে আছেন হতাশভাবে কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে। উত্তর বাহিনী জ্ঞান গঙ্গার তীর হ'তে অদূরে দেখা যাচ্ছে অচল শিব, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরচূড়া ঐ ধাঁধা লাগা অলি গলির মধ্যে। এ বিশ্বসংসারই অলিগলিতে পূর্ণ, ধাঁধা ও নানা বাধায় জীবন লীলায়িত। মা অন্নপূর্ণার কি অপরিসীম দান, কেউ এক মুঠো অন্নের জন্যে হা-অন্ন, হা-অন্ন ক'রে উপবাসী হ'য়ে জীবন

* শ্রীচৈতন্যলীলা—৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

ত্যাগ ক'রছে আবার কেউ থালা থালা অন্ন খাওয়াচ্ছে শিবা, কুকুর বা ছাগল গরুকে। এক গলিতে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাথ এই শিবলিঙ্গ অচল হ'য়ে জড়ের মত চুপ ক'রে ব'সে ঝিমোচ্ছেন তেমনি আবার বিপরীত গলিতে রয়েছেন তাঁর শক্তি, সতীর অংশ অক্ষী ড্যাব ড্যাবে চোখ বার ক'রে। এই বিশাল অক্ষী হ'তে নাম হয়েছে শক্তির বিশালাক্ষী দেবী। সতীদেবীর অক্ষী (চক্ষু) পতিত হয়েছিল কাশীধামে। বিশালাক্ষী দেবীর ভৈরব হলেন বাবা বিশ্বনাথ।

এই সেই কাশীধাম, একদিন এখানে ছিলেন এই পবিত্র ধামে সচলশিব, মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গস্বামী। জ্ঞান গঙ্গার তীরে সমাধীস্থ বা পবিত্র নীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিমজ্জিত অথবা স্রোতের বিপরীতে ভাসমান থাকতেন শবের মত। শিবের অনেক ভাব, শক্তির কাছে শব, পাপীর কাছে রুদ্র, ভক্তের কাছে ভগবান, জ্ঞান বিচারে জড় কঠিন পস্তর ; বিশ্বাসে বিশ্বনাথ, মঙ্গলে আশুতোষ এবং অহংভাবে আত্মভোলা জীবাত্মা বা ভোলানাথ। অহংভাবে মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে জীবাত্মা হয়েছেন শবে পরিণত, তাই সংসারের হলাহল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়ে ত্রাহী মধুসুদন বলে ছটফট ক'রছেন। তুমি শিব-শম্ভু, কৃষ্ণ, রাম যেই হওনা কেন, বাসুকীর এই সংসার গরল একটু পান করলেই সঙ্গে সঙ্গে তার উগ্রফল নাক, মুখ. চোখ দিয়ে ফুটে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। কাশী-ধামের অচল শিব বাবা বিশ্বনাথ এবং সচল শিব ত্রৈলঙ্গধর একই কথা। যুগকাল হিসাবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একই বহু হ'য়ে কখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে, হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছেন জড়ের মত, আবার কখন সগুণ হ'য়ে তিনি ক্রিয়া ক'রছেন সচল ভাবে। অচলভাব হ'ল 'সোঽহং' এবং সচলভাব হ'ল "অহং ব্রহ্মোস্মি"। যখনই আত্মা দেহরূপ ধারণ করলেন তখনই প্রকাশ হ'ল অহং—চিত্ত—সংশয়—নিশ্চয় ও গর্ব্ব। এই পাঁচটি ভাবে ভাবান্বিত হ'য়ে আত্মা হ'লেন "অহং ব্রহ্মোস্মি।" আত্মা যখন সমাধি অবস্থায় পরমাত্মায় লীন হ'ন তখন ঐ পাঁচটি ভাবের লোপ পায়। তখন আমি দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছুই নয়, সবই তুমি, আমি তোমাতে প্রয়াণ। তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ কিছু নেই এই অবস্থাই হ'ল 'সোঽহং' জ্ঞান লাভ। এই গুপ্ত রহস্য লীলায় ব্যক্ত এবং লীলাবসানে অব্যক্ত তূরীয়।

* সন ১১৪৪ বঙ্গাব্দে, মাঘ মাসে প্রয়াগধাম ত্যাগ ক'রে এলেন সচল শিব ত্রৈলঙ্গধর স্বামী (দেহাভ্যন্তরে যাঁর মন ত্রিলিঙ্গ ভেদ ক'রতে পারে তিনিই

• মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন ও তত্ত্বোপদেশ শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত।

ত্রৈলঙ্গস্বামী) কাশীধামে অসিঘাটে ভক্ত তুলসী দাসের বাগানে। মাঝে মাঝে তিনি যাতায়াত ক'রতেন লোলার্ক কুণ্ডে আপন খেয়ালে। পথের ধারে একদিন আজমীঢ় নিবাসী ব্রজ সিংহ নামে এক গলিতকুষ্ঠ রোগীকে নিদ্রিত দেখে তিনি তার নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। সম্মুখে তেজঃদীপ্ত বিরাট পুরুষকে দেখে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব্রজসিংহ মহামানবের চরণযুগল স্পর্শ ক'রে রোগ মুক্ত হবার জন্য কাতর প্রার্থনা জনোলে। সাক্ষাৎ শিবপ্রতিম ত্রৈলঙ্গধর তার করে একখণ্ড বিল্বপত্র দিয়ে বল্‌লেন, "লোলার্ককুণ্ডে স্নান ক'রে এই বিল্বপত্র ধারণ ক'রবে তাহলেই এই কুৎসিত ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাবে।" আর কোন কথা না ব'লে সচল শিব অন্যত্র গমন করলেন। মহামানবের নির্দ্দেশমত ব্রজসিংহ বিল্বপত্র ধারণ ক'রে কয়েক দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হ'য়ে সচল শিবের সেবায় নিযুক্ত হ'ল। অলৌকিক শক্তির বলে স্বামীজী যে, কত দূরারোগ্য ব্যাধি, কুষ্ঠ, যক্ষা ইত্যাদি ভাল করেছেন তা অবর্ণনীয়। এই মহামানবের জীবনী পাঠ ক'রলে সাধারণের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সততই জাগে। সিদ্ধ যোগীদের কাছে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই, তাঁদের কাছে সবই সম্ভব যোগশক্তির প্রভাবে।

স্বামীজী ভক্তদের ব'লতেন, "অবাক হবার বা অবিশ্বাস করার কিছু নেই; এ শক্তি সবারই মধ্যে আছে। সাধারণ মানুষ সংসার সুখে মজে যায় তাই সে নিজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখে না ব'লে মায়ায় হাবু-ডুবু খায়। অনিত্য সংসার মায়ায় আকৃষ্ট হ'য়ে সে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে যে ভাবে প্রয়োগ ক'রে, তার শতাংশের এক অংশও যদি সে, ভগবৎ আরাধনায় প্রয়োগ করে তাহলে তার কাছে অসম্ভব ও অসাধ্য কিছু থাকে না।" লজ্জা-ঘৃণা-ভয় স্বামিজীর কিছুই ছিল না; শিশুর ন্যায় তিনি উলঙ্গ অবস্থায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। কে কি ব'লবে বা ভাববে সে ভাবনা তাঁর কোন দিনই ছিল না। সদা প্রসবিনী এই বিশ্বমাতা উলঙ্গিনী তাই তাঁর সন্তান—কোলের প্রিয় শিশু সন্তান দিগম্বর ছাড়া আর কি হবে? সাধন সম্বন্ধে একটি চলতি কথা আছে, "লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়।" এসব মায়ার বৃত্তি। যতদিন না পর্য্যন্ত এই সব বৃত্তি মন হ'তে অপসারিত হয় ততদিন পর্য্যন্ত সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সার কথা এই যে যখন পৃথিবীতে এসেছি উলঙ্গ অবস্থায় এবং যেতেও হবে তাই; তবে কেন বৃথা লজ্জা আবরণে দেহকে ঢেকে কালের নিয়মকে ফাঁকি দিই। যত আঁটা আঁটি সাধারণ জীবের মধ্যে, মূলতঃ সবই মায়ার ফাঁকি।

সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দিগম্বর অবস্থায় লোকালয়ে বেড়াতে দেখে

এক পুলিশ কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক তাঁকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে কাপড় পরতে আদেশ দিলেন কিন্তু, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ অমান্য ক'রে পূর্ব্বের মত তিনি দিগম্বর অবস্থায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই হেতু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কুপিত হয়ে পুলিশ কর্ম্মচারীদের হুকুম দিলেন, "ঐ ভণ্ডের হাতে হাত কড়া লাগিয়ে হাজতে আটকে রাখ।" যে সময়ে পুলিশ কর্ম্মচারীরা আসামীর হাতে হাতকড়া লাগাতে যায়, সেই সময় আসামী যে, কিভাবে অদৃশ্য হ'লেন কেউ ধারণা ক'রতে পারলো না। পুলিশ কর্ম্মচারীরা যখন চারিদিকে আসামীকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে পেল না সেই সময় দেখা গেল তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নির্ভিক ভাবে দণ্ডায়মান রয়েছেন। এই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনায় বিস্মিত হ'য়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিছুকাল পরে এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্যত্র বদলী হ'য়ে যাবার পর কাশীধামে উগ্র প্রকৃতির এক নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামীজীকে উলঙ্গ দেখে, পুলিশ কর্ম্মচারীদের দ্বারায় 'ভণ্ড উপস্বী বলে' জেল হাজতে তাঁকে আবদ্ধ রাখলেন। জেল হাজতে আবদ্ধ স্বামীজী এত মূত্র ত্যাগ ক'রলেন যে হাজত ঘর মূত্রে ভেসে গেল। পরদিন প্রভাতে ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েদীকে হাজতে দেখতে এলেন। "হাজতে আসামী নেই অথচ এত জল কোথা হ'তে এল?" পাহারাদার সিপাহীদের তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন। পাহারাদার সিপাহীরা কোন উত্তর না দিতে পেরে আত সঙ্কোচে ভয়ার্ত্ত চিত্তে অধোবদনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এযে বাজীকরের অদ্ভুতসম্মোহিনী বিদ্যা। আসামী পালিয়ে গিয়েছেন; নিশ্চয়ই সিপাহীরা তাঁকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে সাহেব উগ্রমেজাজে দ্বার রক্ষিদের আদেশ করলেন, "এখনই আসামীকে ধরে আনা চাই, তা না হ'লে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে।" আসামীর অন্বেষণে যখন সিপাহীরা ছুটাছুটি ক'রছে সেই সময় স্বামীজী সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কোথা হতে, কি ভাবে যে তিনি এলেন এ রহস্য সাহেবও ভেদ করতে পারলেন না। গম্ভীর মেজাজে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমায় চাবি খুলে দিয়েছিল? হাজতে এত জল কে ফেললো, শীঘ্র বল?" অবজ্ঞাব হাসি হেসে স্বামীজী বল্লেন, "কেউ চাবি খুলে দেয় নি, আমার বাহিরে যাবার যখনই ইচ্ছা হয় তখনই চাবি আপনি খুলে যায়। হাজতে ও জল নয় আমি মূত্র ত্যাগ করেছি।" স্বামিজীর কথায় সাহেব চটে গিয়ে বল্লেন, "মিথ্যা কথা।" একটুও ভীত না হয়ে স্বামীজী

গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "মিথ্যা কথ্যা একটুও নয়, সবই সত্য। দেখ। কেউ কারো জীবনকে আবদ্ধ রাখতে পারে না ; তা যদি পারতো তাহ্‌লে হাজতে আটকে রাখলে কেউ আর মরতো না। তোমার কোন শক্তি নেই তবু এত রাগ কেন ?" ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুনরায় আসামীকে কয়েদে আবদ্ধ রাখা হ'ল। কয়েদের চাবি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দেওয়া হ'ল কিন্তু, স্বামীজী মুহূর্ত্ত মধ্যে কয়েদের বাহিরে এ'সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দাঁড়ালেন। এই অলৌকিক ঘটনায় সাহেব ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে স্বামিজীকে মুক্তি দিলেন। মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে সচল শিব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বিষ্ণু অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীরাসমণির সুযোগ্য জামাতা মথুর বাবুর সঙ্গে যখন বেনারসে গিয়েছিলেন সেই সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিজ হস্তে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে পায়েস সেবা করিয়ে খুবই আনন্দ লাভ ক'রেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের কাছে বলেছিলেন, "দেখলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশ হয়েছেন।" ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য লাটু মহারাজ ব'লতেন, "ত্রৈলঙ্গ স্বামী কি অমনি হয় ? কত খাটুনি খেটে তবে অমনটা হ্য়েছে। তপস্যা চাই। শুধু ল্যাংটা হলেই কি ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয় ? ল্যাংটা হ'লেই আনন্দ লাভ হয় না। ওটা অভ্যাস করেও হতে পারে। ত্রৈলঙ্গ স্বামি যে কত কষ্ট (তপস্যা) করেছেন তা তোমরা কি বুঝবে ? তাঁকে যাঁরা ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে তাদের কল্যাণ হবেই।" ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আরো ব'লতেন, "ত্রৈলঙ্গ স্বামী সব্‌সে, পার, শরীর সাধারণের মত কিন্তু, কর্ম্ম মানুষের মত নয়, শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ৺বিশ্বনাথ আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী অভেদ।"

যে সময় সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর যোগৈশ্বর্য্যের নানা বিভূতি অজ্ঞাত-সারে প্রকাশ পায়. ঠিক সেই সময়ে আর এক পরম যোগীর আগমন হয় কাশীধামে। কি জানি কোন্ অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে এই যোগীবর সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বিস্তীর্ণ অন্তরে স্থান লাভ ক'রেছিলেন বিশুদ্ধ প্রেম পারাবারে। একদিকে যেমন সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় নানাদেশ দেশান্তর হ'তে বহু ভক্ত জনগণের আগমন হ'তে লাগলো তেমনি হ'তে লাগলো বহু ভক্তজনের আগমন এই যোগীবরের নিকট যখন তাঁর বিভূতি অজ্ঞাত সারে প্রকাশ পেতে লাগলো।

কানপুর জেলার অন্তর্গত মৈথেলপুর গ্রামে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মতিরামের

জন্ম হয় এক খ্যাতনামা ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতের গৃহে। পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁর নাম মিশ্রীলাল। উপনয়ন হবার পর পিতা, পুত্রকে পাঠালেন কাশীধামে শাস্ত্র শিক্ষার জন্যে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রশিক্ষা শেষ ক'রে মতিরাম বাড়ী ফিরে এলেন মৈথেলালপুর গ্রামে। তাঁর উদাস ভাব দেখে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পিতা এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে মতিরামের বিবাহ দেন। কি কারণে—কার টানে, জানিনা কোন্ অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে যে দিন মতিরামের পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সেই দিনই তিনি গৃহত্যাগ করেন। একই আধারে আনন্দ ও বিষাদ দেখা দিল পণ্ডিত মিশ্রীলালের গৃহে। তাইতো একি অঘটন ঘটলো—বিধির বিধানে এ যে নির্ম্মম কশাঘাত; বহু অনুসন্ধানেও মতিরামের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

বহু পথ ভ্রমণ ক'রে মতিরাম উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হ'লেন। মহাকালেশ্বর শিবকে দর্শন ক'বে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। বহু মন্দিরে সজ্জিত সিপ্রানদীর তীরে এই পবিত্র স্থান বিরাজিত। এই স্থানে মতিরাম কিছুকাল সাধনা করেন। এখানকার সাধনা শেষ ক'রে তিনি দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তিনি এক শাস্ত্রজ্ঞ পরিব্রাজকের নিকট প্রায় চার বৎসর কাল বেদান্ত শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে মতিরাম দাক্ষিণাত্যে বেদজ্ঞ মহাপুরুষ, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ সময় হ'তে গুরু প্রদত্ত শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতী নামে সর্ব্বসাধারণে তিনি পরিচিত হ'লেন। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর কাল ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ ক'রে শেষে তিনি পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হ'লেন। দেহকে নিগ্রহ করাই ছিল তাঁর সাধনা। দারুণ শীতে গঙ্গার পবিত্র নীরে তিনি কাষ্ঠের ন্যায় ভাসতেন আবার দারুণ গ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুচরে খর রৌদ্রে সুখে নিদ্রা যেতেন। তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী, সমজ্ঞানী, আনন্দময় মহাপুরুষ। অজ্ঞাতসারে যখন তাঁর বিভূতি প্রকাশ পেতে লাগলো সেই সময় বহু রাজা-মহারাজা, শোকার্ত্ত, ব্যাধিগ্রস্থ, দুস্থ তাঁর কৃপা লাভের জন্য নিয়ত যাতায়াত ক'রতে লাগলো। অত্যাধিক ভীড়ের চাপে প'ড়ে পাছে তাঁব যোগ সাধনায় বিঘ্ন ঘটে সেই কারণে তিনি আমেটির রাজার একান্ত প্রার্থনায় তাঁর আনন্দ বাগে ভূগর্ভস্থ প্রোকোষ্ঠে আসন স্থাপন ক'রলেন।

সোণা না পোড়ালে খাঁটি হয় না। লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ির ঘা না দিলে সিধে হয় না। তাই বোধ হয় মহাপুরুষদের ভাগ্যে ঘটে নানা পরীক্ষা ও উৎপাত। কৃচ্ছ সাধনায় দিবা-রাত্র যিনি ভগবৎ আরাধনায় ভূগর্ভে একাকী

সমাহিত সেই কঙ্কালসার কঠোর তপস্বীর ভাগ্যে ঘটে গেল এক উৎকট পরীক্ষা। স্বামীজির নৈতিক চরিত্র পরীক্ষার ছলে এক দুষ্ট প্রকৃতির রাজা চারিটি সুন্দরী বারবণিতাকে মোটা টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে পাঠালো নিভৃত ভূগর্ভস্থ প্রোকোষ্ঠে স্বামীজিকে ভ্রষ্ট করবার জন্যে। যে সময় বারবণিতারা স্বামীজির প্রোকোষ্ঠে উপস্থিত হয় সেই সময় তাঁর সমাধি ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর প্রোকোষ্ঠে স্ত্রীলোক দেখে কুপিত হ'য়ে তাদের চলে যেতে বল্লেন। তিনটি রমণী ভীতা হ'য়ে চলে গেল কিন্তু, একটি রমণী তাঁর বাণী অবজ্ঞা ক'রে সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সত্যের পথে স্বয়ং ভগবানই সহায়ক হন এবং দুষ্টের দমন করেন সময় সাপেক্ষে। কি অদ্ভুত ব্যাপার, সহসা কোথা হ'তে এল এক বৃহৎ অজগর এবং জড়িয়ে ধরলো সেই দুষ্টা রমণীর পদ-যুগল সরোষে। রমণীর বিকট চিৎকারে ছুটে এলেন অনেকেই কিন্তু, কেউই সাহস ক'রতে পারলেন না রমণীকে অজগরের কবল হ'তে রক্ষা ক'রতে। কৃপা পরবশ হ'য়ে স্বামীজি অজগরের কবল হ'তে তাকে রক্ষা ক'রলেন। কোথা হ'তে এল এই অজগর এবং কোথা অদৃশ্য হ'ল কেউই তা ধারণা ক'রতে পারলেন না। অজগর যে স্বামীজির বাহন ও দেহ রক্ষক এই চিন্তাই সবার মনে স্থান পেল। এই ঘটনার পর সেই রমণীর জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। স্বামীজির যোগ ঐশ্বর্য্যের কথা যখন লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো সেই সময় রোগগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, শোকাতুর প্রভৃতি বহু লোকের সমাগম হ'তে লাগলো আনন্দ বাগে ক্রমাগত। স্বামীজির আশিসে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত রোগী নিরাময় হয়েছে, বিপদগ্রস্ত বিপদ হ'তে উদ্ধার পেয়েছে এবং শোকাতুর পেয়েছে শান্তি শেষ জীবনে। রাশিয়ার রাজা জারের পুত্র নিকোলাস, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর উইলিয়ম লকহার্ট, খ্যাতনামা মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন এবং খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ডাঃ ফেয়ার বার্ণ স্বামীজিকে দর্শন ক'রে অপার আনন্দ লাভ করেন। বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, স্বামীজিকে বড়দা ব'লে সম্বোধন ক'রতেন। কাশীধামে থাকাকালীন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামীজিকে প্রায়ই দর্শন ক'রতেন ও আশীর্ব্বাদ চাইতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র কাশীধামে প্রায়ই যেতেন এবং স্বামীজিকে দর্শন ক'রে, শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করতেন। মর্ম্মান্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ২১শে আষাঢ় পরমযোগী ভাস্করানন্দ সরস্বতী সমাধীস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

(২০)

অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর অসুস্থ তাই তিনি ক'লকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ হতে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে বসে আছেন। ক'লকাতা কুমারটুলি নিবাসী খ্যাতনামা কবিরাজ বিজয় রত্ন সেন শর্ম্মা মহাশয় তাঁর চিকিৎসা ক'রছেন। কবিরাজ মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত জয়গোপালবাবু প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করেন। শরীর তাঁর খুবই দুর্ব্বল তাই কিছুই ভাল লাগে না। এদিকে আবার কংখল হ'তে মহানন্দগিরি মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন ২০শে মে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবী তারামায়ের দ্বিতীয় বৎসর জলসা উৎসব—"তোমার আসা চাই।" তাইতো কি করি, কেমনে যাই, দুর্ব্বল দেহ, শক্তি কমে গিয়েছে, মন যেতে চায় কিন্তু, সামর্থে কুলায় না।" এই সব পাঁচ সাত ভাবতে ভাবতে, অপরাহ্ন কালে, গঙ্গার তীর ধ'রে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলেছেন জয়গোপালবাবু আপন খেয়ালে। যখন তিনি হাওড়া কাঠের পোলের কাছে উপস্থিত হ'লেন তখন তাঁর হুস এল, "ভাইতোঁ, অনেকটা পথ চলে এসেছি।" কাঠের পোলের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি একটু বিশ্রাম ক'রতে লাগলেন।

বিদায় কালীন অস্তমিত তপনের রাঙ্গা রূপ, গেরুয়াধারিণী ভৈরবী গঙ্গাদেবীর জল আরো লাল ক'রে দিল। সব বর্ণই কালে কালোয় লয় পায় তাই কালো বর্ণই হ'ল পাকা-পোক্ত এবং মহাকালের করাল বদন। সৃষ্টিতত্ত্বে, সর্ব্বভূত, সর্ব্বপ্রাণী এবং সর্ব্বজীব চেতন অচেতন এই কালেই উৎপত্তি ব'লে কালেই লয় পায় তাই কালের রূপই হ'ল কাল বর্ণ। কাল্ হ'তে কাল বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে ব'লে আমরা আঁধারে ভয় পাই এবং আলো পেলে খুসী হই। সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার এবং জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই হ'ল সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যা, কান্তা ও ললিতা, গায়ত্রী দেবীর তিনটি ভগিনী, তিনটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পরিচায়িকা। দৈহিক ও মানসিক কর্ম্ম, জীব-জগতে স্বভাবের ধর্ম্ম। জন্ম হ'তে মৃত্যু অবধি এই কর্ম্ম অপরিহার্য্য। যোগীর ধর্ম্ম, বাহ্যিক তন্মাত্রা উপভোগ করা নয়, ত্যাগ হ'ল তাঁর চির শান্তির একমাত্র অবলম্বন। তাই তাঁদের থাকে না আঁধারে ভয় বা আলোকে উল্লাস। সমভাবাপন্ন জীবই পায় শিবত্ব, যোগাভ্যাসে যোগ সংসিদ্ধি লাভ। যোগ হ'তে যোগী কথার উৎপত্তি হয়েছে। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ করার ক্রিয়া কলাপই হ'ল যোগ। যোগের পূর্ব্ব লক্ষণ হ'ল মনের স্থিরতায় নিশ্চেষ্ট ভাব আনয়ন, মানষ ধর্ম্মের অবসান এবং ভাবাভাবের পরিসমাপ্তি।

যোগে আসে নিবৃত্তি এবং ভোগে বাড়ে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করাই হ'ল সাধনা।

ঢ'লে পড়া রাঙ্গা রবির ছটায় চিক-চিক করছে গঙ্গার জল, জানিয়ে দিচ্ছে জীবকে, রাঙ্গা দিন তোমার বয়ে যায়, দিনের অবসান, সন্ধ্যার আগমন। আবছা আলোর ক্ষীণ আড়ালে উঁকি মারছে কাল-রাত্রির কাল রূপ দিনকে গ্রাস করবার জন্যে। স্মরণে আসে কত কথা, কালের ভ্রূকুটী, করাল বদনা কালীর অট্টহাস্য, কালের বুকে তাঁর উদ্দাম-উলঙ্গ নৃত্য। শেষ বেশ কিছু নেই, শূন্যই পরিশেষ। শূন্য হস্তে এ ধরায় এসেছি আবার যেতেও হবে তাই। আলোক আঁধার অবদানে জীবের খেলা দুদিনেই শেষ। দেখারও শেষ নেই, শোনারও শেষ নেই, নেই শেষ ভাবনার। কর্ম্মের সমাবেশে ধর্ম্মের আবেশ, এ হ'ল জীবের স্বভাবগত অধিকার। ফাঁকির মাঝে থাকা, সবই আছে, তবু কিছু নেই, তাতেও ভাবি আমি—আমার। ভাবনার যখন শেষ নেই তখন ভবিরে ভাবাই শ্রেয়।

এসেছিলে যবে আঁধার হতে
না ছিল তখন বলিতে আপন।
তপন আলোকে স্নেহ ভালবাসায়
স্বজনে পরালো মায়ার বাঁধন॥
হেরিলে নয়নে স্নেহময়ি মাতা
লালন পালনে জন্মদাতা পিতা,
কত পরিজন করিল যতন
বুকে পিঠে লয়ে, মোহের নাচন।
এসেছিলে একা যেতে হবে একা
কালের এ নিয়ম নাহি কোন ঠেকা,
প্রকৃতির এ লীলা জন্ম-মৃত্যু খেলা
জীবের সৃষ্টি মৃত্যুরই কারণ॥
যতটুকু থাকা ততটুকু ফাঁকা
মহাশূন্যে মরীচিকা রেখা,
মুছে যাবে-নীরে, আমি চিরতরে
বিদায়কালীন ভাসিবে নয়ন।
বিধির এ বিধানে গমনাগমন
চক্রাকারে জীব ঘুরে অগণন,

কেহ অগ্রে যায় অন্যে পরে ধায়
কর্ম্মান্তরে ভোগ কালেতে নিধন ॥

নৈসর্গিক দৃশ্যে তন্ময় মন, ভাব তরঙ্গের আবর্ত্তনে প'ড়ে ভুলে গেল কর্ম্ম চঞ্চল সহরের কোলাহল। হঠাৎ একখানি ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো জয়গোপালবাবুর পাশে। ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন পটলডাঙ্গা নিবাসী প্রতাপচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়, "পণ্ডিতমশাই।" ভাব ভেঙ্গে গেল জয়গোপালবাবুর, ঐ ডাক শুনে। মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন, ডাকছেন পূর্ব্বপরিচিত প্রতাপবাবু। ভুতনাথবাবুর শ্বশুর মহাশয় সপরিবারে চলেছেন কংখলে, মহানন্দগিরি মহারাজের প্রতিষ্ঠিতা তারামায়ের দ্বিতীয় বৎসর জলসা উৎসব উপলক্ষে। "গাড়ীতে উঠুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন," বল্লেন প্রতাপবাবু, পণ্ডিত মহাশয়কে। কি জানি কোন্ শক্তির আকর্ষণে কোন কিছু চিন্তা না করেই পণ্ডিত মহাশয় গাড়ীতে উঠে ব'সলেন। ছুটলো গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। ক্ষণিক বৈরাগ্যে যদি মানুষ কিছুক্ষণের জন্যে সংসার ভুলে যায় তাহলে যার বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তার যে কি অবস্থা হয় তা কে জানে।

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"

যমাদি ক্রিয়ার অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের তীব্র ইচ্ছায় চঞ্চল চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল অথচ জয়গোপালবাবু এখনও বাড়ী ফিরলেন না, খুবই চিন্তার কারণ। ক'লকাতা সহর দিবা-রাত্র যান-বাহন চলাচল ক'রছে, কত পথচারী রাস্তা পার হ'তে গিয়ে, গাড়ী চাপা প'ড়ে জীবন হারায়, এরূপ অবস্থায় তিনি কোথা গেলেন, কি ঘটলো? এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে আত্মীয় স্বজনেরা ছুটলেন গঙ্গার তীরে জয়গোপালবাবুর সন্ধানে। বহু অন্বেষণে তাঁর কোন সংবাদ না পেয়ে তাঁরা হতাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এলেন। উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সারারাত্র আত্মীয়স্বজনদের। রোগী মানুষ কাউকে কিছু না ব'লে তিনি কোথায় গেলেন? মায়ায় গড়া সাধারণ মানুষের মন, অতি প্রিয় কেউ না ব'লে কোথাও গেলে আসে মনে অমঙ্গল চিন্তা। ক'লকাতা সহর চারিদিকে রয়েছে বিস্তীর্ণ বিপদ ও আপদ প্রতি-পদক্ষেপে। জানি কেউ কাউকে জোর করে ধ'রে রাখতে পারে না, যার যখন যাবার সময় হয়। তবু মন বোঝে না, শুনেও শোনেনা, জেনেও জানেনা তাই ফেলতে হয় চোখের জল ও ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস। এ হ'ল স্বভাবের ধারা, মায়ায় জড়ানো, হাসি-কান্নার

খেলা। এই অনন্ত মায়াকে গুটিয়ে নিয়ে যদি ভগবানের প্রতীক, ঘট-পট বা মূর্তিতে আরোপ করা যায়, তাহ'লে এই অনন্ত মায়ার কুটিল দংশন হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। এই হল দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। শূন্যময় জগতে মায়া হ'তে আত্মরক্ষা। দেব-দেবীর মূর্তি কাঠ, পাথর যাই হোক্ না কেন, বহির্মুখী ইন্দ্রিয় সাহায্যে মন যদি একবার মূর্তিতে আকৃষ্ট হয় তখন ঐ অনন্ত মায়াই মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে। এই হ'ল জড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

কে বলে মার প্রাণ নাই ?
পাথর মাটিতে গড়া
হোকনা খোদাই ॥
যে প্রাণ রয়েছে কাছে
হৃদয়ের পদ্ম মাঝে
প্রাণে মন ঢেলে দিয়ে
মায়ের প্রাণ দেখা চাই।
প্রাণের আছে অন্তর্দৃষ্টি
ভেদিবে রহস্য সৃষ্টি
মনঃ প্রাণে দেখ ভূতে
প্রাণের অন্ত নাই ॥

পরদিবস সন্ধ্যার সময় হরিদ্বার হ'তে এক আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম এল ১৩৭/১ নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীটে, জয়গোপালবাবুর বাড়ীতে, "Reached Kankhal don't worry." (কংখলে পৌছেছি ভেবোনা)। তারে সংবাদ পেয়ে বাড়ীর সকলে আশ্বস্ত হ'লেন। মহামায়া মায়ের ইচ্ছা ও মহারাজের আকর্ষণে জয়গোপালবাবু, কংখলে যেতে বাধ্য হলেন। একেই বলে ভবিতব্য। বেশ আড়ম্বর ও নিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ হ'ল বৈষ্ণবী তারামায়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী জলসা মহোৎসব কংখলে। বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃন্দের আগমনে ভ'রে উঠলো মায়ের মন্দির নব-চেতনায়। 'জয় মা তারা', নাদে মুখরিত হ'ল আকাশ-বাতাস, ভাব-উচ্ছ্বাসে। মায়ের বিশেষভাবে পূজা, চণ্ডী ও বেদ-পাঠ এবং হোম যজ্ঞ শেষ হবার পর চ'ললো প্রসাদ বিতরণ রাত্র অবধি। আনন্দের হাট ব'সে গেল মায়ের পূজা উপলক্ষে।

এই সেই পৌরাণিক তথ্যজড়িত কংখল। স্মরণে এখন শিহরণ জাগে, মহারাজ দক্ষের ধৃষ্টতা ও নিষ্ঠুর আচরণে। শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন

দক্ষ, জামাতাকে অপমান করবার জন্যে। শিবহীন যজ্ঞ যখন আরম্ভ হয় তখন সতীদেবী শিবেরই আলয়ে কৈলাস পর্ব্বতে ঘরণী হ'য়ে বাস করছেন। এই হীন কার্য্য হতে পিতাকে সাবধান করবার জন্যে শিবকে দশ মহাবিদ্যা রূপ দর্শন করিয়ে, শিবাজ্ঞা গ্রহণ করে সতীদেবী পিতৃগৃহে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞে বাধা দিলেন। মদোন্মত্ত মহারাজ দক্ষ, কন্যার বাধা অবজ্ঞা করে যজ্ঞানুষ্ঠানে কন্যা সতীদেবীর সম্মুখে শিবের নিন্দা করেন। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতীদেবী কুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে দেহত্যাগ করেন। সতীদেবীর দেহত্যাগে শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে মহারাজ দক্ষকে বধ করেন এবং সতীর দেহ স্কন্ধে ফেলে উদ্দাম নৃত্য করেন। শিবের নৃত্যে ত্রিভুবন কম্পিত হয়। পাছে প্রলয় ঘটে সেই ভয়ে ভীত হয়ে দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। শিবের রোষ উপশম করবার জন্যে শ্রীবিষ্ণু চক্রের দ্বারায় সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করেন। সতীদেবীর দেহ বিষ্ণুচক্রে ৫১টি অংশে বিভক্ত হয়ে ভারতে বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এই অংশ যেখানে পতিত হয় সেই স্থানই পীঠস্থান নামে অভিহিত। সতীদেবীর মর্ম্ম একমাত্র জেনেছিলেন শিব। কালী-তারা ইত্যাদি দশ ইন্দ্রিয় জয়ের দশমহাবিদ্যার রূপ দেখে শিব বুক পেতে দিয়েছিলেন শব হয়ে। সতীদেবী প্রথম রূপ ধারণ করেছিলেন কালীমূর্ত্তি। কলির জীবকে যিনি কলুষ স্পর্শ হতে রক্ষা করেন তিনিই কালী।

"ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥"

(পূজাপ্রদীপ)

তুমি পরা প্রকৃতি ব্রহ্ম শক্তি, তুমিই সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মস্বরূপা। তোমা হইতেই এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে তুমিই জগজ্জননী।

শিবের আত্মশক্তি হলেন কালিকা দেবী। এই আত্মশক্তি শিবের বক্ষ হ'তে যখন কালিকা রূপে প্রকট হন তখন শিবের বিরাট দেহ শবে পরিণত হয়। তাই শবের বুকে মহামায়া মা পদ দিয়ে দণ্ডায়মাণা রয়েছেন। শব অর্থে যা লয় পায় তাই হল শব। এই পৃথিবীই এক বিরাট শব। প্রকৃতি দেবী হ'লেন সত্ত্ব-রজো ও তমোগুণে গুণান্বিতা। শব অর্থে তমোগুণ। তমোগুণের বুকে মা, রজোমাখা (রজোগুণ) পদ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এই শাস্ত্র বাণী হ'তে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তমোগুণ নাশ ক'রতে হ'লে সদা-সর্ব্বদা বক্ষে মায়ের রজোমাখা চরণ যুগল চিন্তা করা প্রয়োজন। যখন

রজোমাখা চরণ চিন্তায় সাধকের দেহ মন ও প্রাণ রজোগুণময় হবে তখন সাধক মায়ের মুখপানে লক্ষ্য করবেন। মহামায়া মা, রজোমাখা জিহ্বাকে শ্বেতবর্ণ দন্তের (সত্ত্বগুণ) দ্বারা কর্ত্তন ক'রছেন অর্থাৎ সাধক সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হ'য়ে রজোগুণ নষ্ট ক'রবেন তাহলেই মহামায়া মা, চতুর্হস্তে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ প্রদান ক'রবেন। সাধক যদি তমো ও রজোগুণ নাশ ক'রতে না পারেন তাহ'লে মায়ের হস্তে খড়্গ ও গলে মুণ্ডমালা রয়েছে অর্থাৎ বারেবার চক্রাকারে জন্ম ও মৃত্যু ভোগ ক'রতে হবে। মায়ের তিনটি লোচন সৃষ্টির কারণে সূর্য্য-চন্দ্র ও অগ্নি এবং ভক্তের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য ও করুণায় মণ্ডিত। পাপীর কাছে ঐ ত্রিলোচন, হ'তে শাসন, কটাক্ষ ও ধ্বংস, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব, সূচনা করে। মায়ের এলোচুল অনন্ত মায়ার ফাঁস। যে মায়ায় প'ড়ে আমরা হাবু-ডুবু খাই।

শ্যামা মায়ের রূপ কথা বলিব আর কত।
নানারূপ বলেন শাস্ত্র না বুঝিগো মাহাত্ম্য॥
শ্যামবর্ণা মায়ের রূপ, যেন শ্যাম মূরলিধর।
জ্ঞানময় ঠাকুর তিনি, প্রেমেরই আকর॥
অন্তর মায়ের শ্রীরামচন্দ্র, ত্যাগে পরাকাষ্ঠা।
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তব্যই তাঁর নিষ্ঠা॥
সর্ব্ব-ত্যাগিনী শ্যামা মা বাৎসল্যে অপার।
পাপ নিধন তরে, করেন খড়্গ ব্যবহার॥
বুদ্ধিতত্ত্ব অন্য রূপ, তারা নিরাকারা।
ষোড়শী সুন্দরী স্বভাব, আনন্দেতে ভরা॥
লীলা তত্ত্ব ভুবনেশ্বরী মোহিনী সে রূপ।
সৃষ্টি-স্থিতি লয়ে মা, কভু হননা বিরূপ॥
কটাক্ষ মায়ের দৃষ্টি, দেবী ছিন্নমস্তা।
সন্তানে শাসন ইঙ্গিত, জানিও অবস্থা॥
সুপ্রসন্না হ'লে মাতা, হন প্রফুল্ল চিতা।
কমলা জানিও তাহা, বাৎসল্যে স্থিতা॥
বগলা অনন্ত শক্তি, ঐ চারিভুজে বিকাশ।
ভৈরবী নিবৃত্তিরূপ- মায়া মোহের বিনাশ॥
অধম গতি ধূমাবতি মা, হেরিলে সন্তানে।
লজ্জায় কাটেন জিহ্বা অতি বিষণ্ণ বদনে॥

মায়ের আত্মা সতীদেবী, দক্ষ কন্যা যিনি।
পরম যোগী মহাদেবের তিনি ঘরণী ॥
দক্ষ যজ্ঞ পণ্ড হ'ল, গেল দক্ষ ছারেখারে।
পতি নিন্দায় সতীর দেহ রহে ভবে প'ড়ে ॥
বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত হ'ল, পড়িল ধরায়।
একান্নপীঠ জানা যায়, শাস্ত্রের কথায় ॥

সৎ কথা হ'তে স্ত্রীলিঙ্গে সতী হয়েছে। সৎ অর্থে যা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকবে। অসৎ মিথ্যা কল্পিত অবিদ্যা যা এই আছে এই নেই, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এই পৃথিবী মায়া কল্পিত ক্ষণস্থায়ী, একদিন মহাপ্রলয়ে নিশ্চিহ্ন হবে তাই পৃথিবী অসৎ ও মায়া কল্পিত। সৎ হ'লেন স-গুণ ব্রহ্ম বা ভগবান। সতী তাঁর আদ্যাশক্তি ব'লে ভগবতী বা মহাশক্তি। এই ভগবতীর পবিত্র স্থূল দেহ, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হ'য়ে ৫১টি পবিত্র অংশে বিভক্ত হয়েছে অর্থাৎ অনুলোম ও বিলমে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ইত্যাদি বর্ণের সৃষ্টি হ'য়েছে। বর্ণের অনুলোমে কালী এবং বিলোমে (বিপরীত দিকে) তারার অধিষ্ঠান কল্পিত হয়েছে। এই একান্নটি পীঠ সাধকের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। শব্দ ব্রহ্ম যে নিত্য এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, সেই প্রমাণই বর্ণের অনুলোম বিলোমে পাওয়া যায়। পৃথিবী গোলাকার ব'লে বর্ণ সমষ্টি মাল্যাকারে গ্রথিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধতায় চক্রাকার হ'য়েছে।

মহানন্দগিরি মহারাজের আশীর্ব্বাদে জয়গোপালবাবু অচিরেই সুস্থ শরীর লাভ ক'রলেন। উৎসব মিটে যাবার পর তিনি প্রতাপ বসু মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে ক'লকাতা ফিরে এলেন।

(২১)

তারা মায়ের কি অদ্ভুত লীলা, শান্তিময় পবিত্র স্থান হরিদ্বার হ'তে কিছু দূরে, হঠাৎ আরম্ভ হ'ল দাঙ্গা হাঙ্গামা কার্ত্তারপুর গ্রামে। সামান্য কলহ হ'তে হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হয় এবং পরিণামে জনকয়েক মুসলমান প্রাণ হারায়। পুলিশের তৎপরতায় দাঙ্গা থেমে গেল এবং স্থানীয় কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু মাতব্বর এই দাঙ্গার দায়ে আসামীরূপে ফৌজদারী আদালতে সোপার্দ্দ হ'লেন। আদালতের বিচারে একজনের ফাঁসী এবং আর সকলের সুদীর্ঘকাল কারাদণ্ডাদেশ হয়। মহানন্দ গিরি মহারাজের ভক্ত কংখল নিবাসী জগন্নাথ প্রসাদের চোদ্দ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ভক্তের

সুদীর্ঘকাল কারাদণ্ড হ'য়েছে শ্রবণ ক'রে মহারাজ খুবই মর্ম্মাহত হ'লেন। যাই হোক মহারাজের প্রার্থনায় তারামা কৃপা ক'রেছেন তাই আপিলে ভক্তের দণ্ডাদেশ ৭ বৎসর কমে গেল। তারা মায়ের লীলা বোঝা দায়, কখন্ যে কার ঘাড়ে খড়্গ পড়ে তা কে জানে। তাঁর সূক্ষ্ম বিচারে সাধু-সন্ত, পাপী-তাপী কারো নিস্তার নেই; সবাই কর্ম্মফল ভোগ ক'রতে বাধ্য। এই পৃথিবীতে যে যতই সঙ্গতিসম্পন্ন হোক্‌না কেন, কারো রেহাই নেই।

কংখলে তারামলবাগে যদিও শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ নিজ বাগান বাড়ীতে মহারাজের জন্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আশ্রমে তারামায়ের মূর্ত্তির সেবার ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। মহারাজ কার্ত্তারপুর দাঙ্গার বহু পূর্ব্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেন যে, কংখল ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন ক'রলেন এ রহস্য জটিলতায় পূর্ণ, বিচার বুদ্ধির বহির্ভূত। অধিকাংশ ভক্তদের ধারণা যে, ভক্ত জগন্নাথ প্রসাদের যে, কারাবাস হবে তা তিনি দৈব-শক্তি বলে জ্ঞাত হয়েছিলেন ব'লেই, তারামাকে সচল প্রতিষ্ঠা ক'রে, দণ্ডাদেশের বহুপূর্ব্বেই আশ্রম ত্যাগ করেছিলেন। ভক্তের কারাবাসে মর্ম্মাহত হ'য়ে মহারাজ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, যতদিন না ভক্ত মুক্তি পায় ততদিন তিনি আর কংখলে পদার্পণ ক'রবেন না। সুদীর্ঘ ৭ বৎসর কারাবাসের পর ভক্ত যখন মুক্তি পান তখন তিনি মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে কংখল আশ্রমে উপস্থিত হন।

ইং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কংখল আশ্রম হ'তে তারামায়ের মূর্ত্তি লক্ষ্ণৌ আনা হয় এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হ'তে মায়ের মূর্ত্তি কাশীধামে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মহারাজের শিষ্য যোশী, ফট্‌কা বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় ক'রে বহু লক্ষ টাকা উপায় ক'রেছেন। কিছু টাকা তীর্থ ধর্ম্মে ব্যয় করবার জন্যে তিনি মহারাজকে নিয়ে দ্বারকা যাত্রা ক'রলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মহারাজের দ্বারা বাবা দ্বারকানাথের বিশেষ ভাবে পূজা, হোম ও হাজার আট কুমারী, তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এবং বালক ভোজনের ব্যবস্থা ক'রলেন। পূজা ও সেবা অন্তে মহারাজ শিশুর মত আব্দার ধ'রলেন, "আমি মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বাঁধবো।" যে মন্দিরের চূড়া হ'তে নিয়ে তাকালে মাথা ঘুরে যায়, অত উচ্চ, সেই মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বাঁধবেন এক অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ; একি কখনও সম্ভব হয়? ভক্ত যোশী এবং অন্য যাত্রীরা মহারাজকে অনেক বোঝালেন কিন্তু, কেউই সমর্থ হ'লেন না এই

দুঃসাহসিক বিপজ্জনক কাজে তাঁকে বাধা দিতে। সবার নিষেধ উপেক্ষা ক'রে মহারাজ সানন্দে মন্দির গম্বুজে উঠে চূড়ায় ধ্বজা বাঁধলেন। সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে দেখলেন এক অশীতি বৎসর বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর উৎসাহ ও ভীতিজনক কার্য্যের উদ্দীপনা। যখন তিনি প্রফুল্লচিত্তে মন্দির হ'তে নেমে এলেন তখন সবাই অবাক হ'য়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। "আমার তারামাতেশ্বরীই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণই তারামাতেশ্বরী"; এই কথা বলে তিনি আনন্দে হাততালি দিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ, শাক্ত আয়ানকে কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দেখিয়েছিলেন। এই মূর্ত্তি পুরুষ ও প্রকৃতি সমন্বিত। উর্দ্ধ অঙ্গ প্রকৃতি এবং অধঃ অঙ্গ পুরুষ ব'লে, 'বিপরীত রতাতুরা' বলা হয়। এই মূর্ত্তিই হ'লেন ত্রিতাপ নাশিনী তারা অর্থাৎ শ্যাম ও শ্যামা অভেদ মূর্ত্তি। শাক্ত আয়ান, ভগবান কৃষ্ণের এই মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন ক'রে প্রেমাশ্রু ফেলেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং নারায়ণ তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণের কালী মূর্ত্তি দর্শন ক'রে শ্রীরাধা এত তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন যে, নিজ স্তনকমল কর্ত্তন করে কালীকাদেবীর শ্রীপাদ-পদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। এই ছিন্ন স্তনকমল হ'তে কদলীর উৎপত্তি হয়।

গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত, কাথিয়াওয়াড়ে আরব সাগরতীরে অবস্থিত দ্বারকাধাম সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম। তিন রাত্র দ্বারকাধামে বাস করার পর মহারাজ ১৬ই অক্টোবর বোম্বাই ফিরে এলেন।

(২২)

এত তীর্থ পর্যটন ক'রেও মহারাজের শ্রান্তি ও ক্লান্তি কিছুই এল না। উদাসী মন চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকতে চায় না। কেবলই সে ছুটে চলে যেতে চায় দূরে—বহুদূরে, পৌরাণিক তথ্য বিজড়িত তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে। ভক্ত সুধীর বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামেশ্বর যাত্রা ক'রলেন। রামেশ্বর উপস্থিত হ'য়ে মহারাজ মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট হ'তে অনুমতিপত্র গ্রহণ ক'রে মন্দিরাভ্যন্তরে গর্ভ-গৃহে প্রবেশ ক'রলেন। অধ্যক্ষের অনুমতিপত্র ব্যতিত গর্ভগৃহে যাত্রীদের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। রামেশ্বর দেবকে স্বহস্তে পূজা ক'রে মহারাজ অপার আনন্দ লাভ ক'রলেন। রামেশ্বর দেবের মন্দির সীমানা প্রায় সিকি বর্গমাইল। প্রস্তর নির্মিত সুউচ্চ বিরাট মন্দিরের মধ্যে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ, পার্ব্বতি দেবী এবং প্রায় একহস্ত পরিমাণ স্বচ্ছ

স্ফটিকের শিবলিঙ্গ বিরাজ ক'রছেন। সীতা দেবীকে লঙ্কেশ্বর রাবণ রাক্ষসের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রবার জন্যে রামচন্দ্র স্বহস্তে এই হর-পার্ব্বতীকে পূজা ক'রে লঙ্কা অবধি সেতু বন্ধন ক'রেছিলেন।

গর্ভ-গৃহ হ'তে বেরিয়ে এসে মহারাজ মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ ক'রে সুধীর বাবুর সঙ্গে প্রায় এক মাইল দূরে 'রাম-ঝরকা', বা গন্ধ মাদনম্ দর্শন ক'রতে গেলেন। একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থিত পাকা ঘরের মধ্যে রামচন্দ্রের চরণচিহ্ন দর্শন ক'রে মহারাজ অভীভূত হয়ে পড়লেন। শ্রীরামচন্দ্রের চরম ত্যাগ, পিতৃসত্য পালন; অনুজ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম এবং অনাথিনী সীতাদেবীর করুণ-কাহিনী তাঁর স্মরণে জেগে উঠলো। উদাস আনন্দের মাঝে তাঁর দু-নয়ন হ'তে শোকের বারি ঝ'রে পড়লো। ক্ষোভে কাতর হ'য়ে তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু শিরে ও বক্ষে ধারণ ক'রে তিনি সুধীর বাবুর সঙ্গে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। ২১ শে ডিসেম্বর গোয়ালিয়র হ'তে আগ্রা এবং আগ্রা হ'য়ে ২৬শে ডিসেম্বব দিল্লী উপস্থিত হলেন। সেখানে ডাক্তার রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ী কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করে ২২শে জানুয়ারী ১৯২০ খৃষ্টব্দে দিল্লী হ'তে আগ্রায় উপস্থিত হ'য়ে ২৮শে জানুয়ারী গোয়ালিয়র যাত্রা করেন এবং সেখান হ'তে মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। লক্ষ্ণৌ পৌছে মহারাজ দিন কতক গোমতী নদীর তীরে পেয়ারা বাগানে এক কুটীরে সাধন ভজন করেন।[১]

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মহারাজ লক্ষ্ণৌ হ'তে শ্রীরাধারমণ মোহন্তের পুত্র সুধীরের সঙ্গে অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় রাধারমণবাবুও তাঁদের সঙ্গে বারাবঙ্কি অবধি গমন করেন। এই পথে গমন কালে রাধারমণ বাবুর একান্ত অনুরোধে মহারাজ অমরনাথ যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে রাধারমণ বাবুর বাড়ী নবদ্বীপে উপস্থিত হ'লেন। নবরসে আপ্লুত এই নবদ্বীপ, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের মিলন ক্ষেত্র, কালী ও কৃষ্ণের সমাবেশে, সমজ্ঞানে ব্রহ্মো-উপলব্ধি, ভেদ-বুদ্ধি লোপে নব-চক্র দীপান্বিত। তান্ত্রিকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশ ও বৈষ্ণব শিরোমণি গৌরাঙ্গ অবতারের লীলা ও তপঃভূমি এই নবদ্বীপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল একদিন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাধনায়-সাহিত্যে প্রোজ্জল এই নবদ্বীপ অতীতযুগে। প্রায় একমাস কাল নবদ্বীপে নানা দেব-দেবী দর্শন ক'রে মহারাজ লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন। মহারাজ লক্ষ্ণৌ ফিরে এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয় শিমলা শৈল হ'তে লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হ'য়ে মহারাজকে এক সপ্তাহের

জন্যে কাশীধামে নিয়ে গেলেন। সোমাবতী স্নানের জন্যে মহারাজ অক্টোবর মাসে পুনরায় কাশীযাত্রা করেন এবং স্নান সমাপন ক'রে ১৫ই-অক্টোবর লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন। ১৯ শে অক্টোবর তিনি সিমলা যাত্রা করেন। সিমলা শৈলে উপস্থিত হ'য়ে তিনি মহাষ্টমীতে বেদ-পাঠ, হোম ও কুমারী ভোজন করান। পুনরায় তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরে এসে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ হতে স্যাণ্ডিলার নিকট গরহী গ্রামে ভক্ত লছমীচরণ আস্থানার গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। জানুয়ারী মাসে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্যাণ্ডিলা ত্যাগ ক'রে তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন এবং দিনকতক পরে কাশীধাম যাত্রা ক'রলেন। দু-তিন দিন কাশীধামে অবস্থানের পর তিনি পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আসাম জেলার অন্তর্গত কামাখ্যা যাত্রা করলেন।

সতীদেবীর যোনি, আসাম জেলার অন্তর্গত গৌহাটীর নিকট, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নীলগিরি পর্ব্বতে পতিত হয়। প্রবাদ আছে ভক্তিভরে এই মহামাতৃ-যোনি স্পর্শ ও পূজা ক'রলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। মহাযোনি অর্থে সৃষ্টিতত্ত্বের আধার বোঝায়, অর্থাৎ এই বিরাট ভূমণ্ডল। এই মাটিতে জীবের উৎপত্তি এবং নিবৃত্তি হয় বলেই এই বিশাল কায়া পৃথিবীই মহা-মাতৃযোনি। পৃথিবীতে এলেই যখন জীব আঁধার-আলো, সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ ভোগ ক'রতে বাধ্য হয় তখন মহামাতৃ-যোনি যাতে আর স্পর্শ ক'রতে না হয় সেই কারণে ভক্তিস্পর্শে যোনিমুক্ত হওয়ার কামনা করাই শ্রেয়। দেবীর নাম কামাখ্যা অর্থাৎ তিনি জীবের কামনা পূর্ণ করেন। এ-জীবনে যদি কামনা কারো না পূর্ণ হয়, সেই কামনা তার নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে জন্ম-জন্মান্তরে। তার কারণ জীবের কামনা তো একটি নয়— আনুসঙ্গিক অনেক। তাই একটির পর একটি ক'রে সব কামনা মিটাতে গেলে, বহুবার তাকে যোনি প্রাপ্ত হতে হবে। এই কারণে উচ্চ মার্গের সাধকরা মহামাতৃ-যোনি স্পর্শ ক'রে কামনা করেন, "মা আর যেন যোনি প্রাপ্ত না হ'তে হয় তাই আমায় মোক্ষ দাও, এই কামনা পূর্ণ কর।"

মহারাজ মহামাতৃ-যোনি পূজা ও স্পর্শ ক'রে নীল পাহাড় হ'তে নেমে এসে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে উমানন্দ ভৈরব দর্শনে গৌহাটী অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। গৌহাটি সহরের পাশ দিয়ে বহে যাচ্ছে খরস্রোতে ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল জলরাশি কামাখ্যা পাহাড়ের গা দিয়ে বক্রভাবে। জন-কোলাহল হ'তে বহুদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রায় মধ্যভাগে দ্বীপে, এক উচ্চ টিলার উপর বাবা উমানন্দ ভৈরব সমাসীন রয়েছেন। উমার আনন্দে অভিভূত হ'য়ে ভৈরব, সর্ব

কর্ম্ম ত্যাগ করে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে বোধ হয় শিলাখণ্ডে পরিণত হ'য়েছেন। এই ভাবই হ'ল সোঽহং অবস্থা। আমি আছি তবু নেই ; স্থিরতায় স্পন্দন রহিত, সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ, একের সন্ধানে মনঃ সংযম, ত্রাস বা মনোবিকারের নাই ভয়, অকুত-ভয়ের 'মাভৈ' শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্ণ, অন্য শব্দ শ্রবণে আসে না, উপেক্ষায় শ্রবণেন্দ্রিয় বধির প্রায়। হিমাঙ্গ নিশ্চল কলেবর, রক্তপ্রবাহিকা নাড়ীর গতি রোধে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ভাব জড়ত্বে সোঽহং ভাবে পরিণত হ'য়েছে তাই, আমার মধ্যে আমি থেকেও নাই ; অহংভাব নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে।

অথৈ জলরাশির মাঝে, উদাস বায়ুর স্পর্শে শান্ত-গম্ভীর উমানন্দ ভৈরবের সমাসীন সৌম্য লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন ও স্পর্শ করে মহারাজ আবেগে ব'লে উঠলেন, "কবে হবে তোমার মত আমার এই অবস্থা ?" হবে হবে সবারই হবে, যবে হবে মন, উলঙ্গ শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে একে নির্ভরশীল। কয়েক ঘণ্টা নিরিবিলির পরিবেশে অবস্থানের পর তাঁরা নৌকাযোগে গমন করলেন ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে অশ্বক্রান্ত অভিমুখে। অশ্বক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পাহাড় পথরোধ ক'রে ঘুরিয়ে দিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের খরস্রোত অন্য দিকে। এই পর্ব্বতে দ্বাপর যুগে বীর কেশরী ধনঞ্জয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধ'রেছিল বভ্রুবাহন নামে এক সাধারণ বালক তামাসার ছলে। বহু সন্তোষ বাক্য, লোভ-লালসা দেখিয়েও যখন বালক যজ্ঞের ঘোঁড়া ছাড়লোনা তখন বাধ্য হ'য়ে ধনঞ্জয়কে অযোগ্য-অপাত্র, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়। উপেক্ষা কাউকে করা যায় না, কার মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে তা কে জানে। কুরু বংশ ধ্বংসকারী বীর কেশরী ধনঞ্জয় বালকের যুদ্ধ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে পাছে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন হ'তে হয় কালের বুকে তাই পুনরায় সন্তোষ বাক্য প্রয়োগে বালককে যুদ্ধ হ'তে নিরত হবার জন্যে স্নেহ প্রদর্শন ক'রলেন। ভবি ভোলবার নয়, বীরের ব্যাটা বীরই হয়। স্নেহ, আদর, সন্তোষ বাক্য সব অবজ্ঞা ক'রে বালক প্রাণ-পণে যুদ্ধ ক'রতে লাগলো। দৈবের কি লিখন, সর্ব্বশক্তি নিয়োগ ক'রেও অর্জ্জুন বালকের কাছে পরাস্ত হ'য়ে মান, যশ, খাতির, শৌর্য্য বীর্য্য জলাঞ্জলি দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। কে এই বীর বালক ? বীর কেশরী ধনঞ্জয়েরই বীর পুত্র বভ্রুবাহন। বিষাক্ত বড় সাপের চেয়েও তার ছাওয়ালীর বিক্রম ও বিষ বেশী হয়, সেই প্রমাণই এখানে পাওয়া গেল।

মহারাজ অশ্বক্রান্ত দর্শন ক'রে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে কামাখ্যা পাহাড়ে ফিরে এলেন। কয়েকদিন কামাখ্যায় অতিবাহিত করবার পর তাঁরা ক'লকাতায় ফিরে এসে ৺কালীঘাটে উপস্থিত হলেন।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

জননী ও জন্ম ভূমি স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রলেও সন্ন্যাসীরা একবার জন্মভূমি দর্শন করেন। যে সব মহাত্মারা দেশের এবং দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আত্মতৃপ্তি লাভ করবার উদ্দেশ্যে যাঁরা সন্ন্যাস সাজে সজ্জিত হন তাঁরা স্বার্থপর ও ভোগী।

ক'লকাতায় উপস্থিত হ'য়ে মহারাজ পুরুষোত্তম বাবুর সঙ্গে ৺কালীঘাটে গেলেন। "আদি গঙ্গায় স্নান ক'রে তিনি মায়ের মন্দিরে প্রবেশ ক'রলেন। মায়ের সামনে যখন তিনি উপস্থিত হ'লেন তখন মহারাজের মুখমণ্ডলের ভাব যেন শিশুর ন্যায় আবেগে ভ'রে উঠলো। কি জানি, কি কারণে, কোন্ ইঙ্গিতে, সুদীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর মাতা-পুত্রের এই সম্মিলনে ঝ'রে পড়লো মহারাজের নয়ন-ধারা আবেগে বা অভিমানে। হ'য়তো মা, শাসন ইঙ্গিতে রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পারেন, "আমায় ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলি?" অবোধ সন্তান, শিশু সুলভ চঞ্চল মতির আশ্রয়ে মাকে ছেড়ে হেথা সেথা ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার সঠিক উত্তর কিছু দিতে না পেরে, অভিমানে বা শাসন ভয়ে চোখের জলে মহামায়া মায়ের মন ভেজাচ্ছেন। মা ও ছেলে কি মধুর ও অদ্ভুত সম্বন্ধ। ছেলে যদি ছেলের মত হয়, তাতে মাকেও ছেলের জন্যে ব্যাকুল হ'তে হয়। যেখানে স্নেহ, সেখানেই শাসন। সন্তানের দাবীর অভিমানে, মায়ের বাৎসল্য বিকশিত হয়। স্নেহের বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণে। কে জানে, কি আছে ঐ কালের বুকে পাষাণী কালীমায়ের ত্রি-নয়নে? মায়ের কটাক্ষ ত্রি-লোচনে ইঙ্গিত দেয়, শাসন স্নেহও আকর্ষণ, তাই হাসি-কান্না প্রস্ফুটিত হয় সন্তান আননে। একমাত্র তিনিই জানেন বা বোঝেন যিনি পেরেছেন সব কিছু উজাড় ক'রে নিবেদন ক'রতে মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে নিজস্ব সব সত্তা। জানি না কি আছে এই কাল গতায়তে কালের বুকে কালো রূপে কত আলো।

(ওরে) কালি আছে দেহে ভরা
কালী আছেন হৃদয় জোড়া।
(ওযে) মনেতে লাগলে কালি
হৃদয় কালী যায়না ধরা॥
সাবান-সোডা-সাজি মাটি,
উঠে কাসি ক'রলে ভাঁটি,

মনের কালি তুলতে হলে
কালী নামে ছোপ ধরা।
পাঠায় ধোপা আছাড় দিয়ে
তোলে কালি সব হ'য়ে
হৃদয় কালি তুলতে হলে
ক'রনা রিপু আধমরা ॥
দেখবি তখন এই ভবে,
মনের কালি মুছে যাবে,
কালের ভয় যাবে ঘুচে
কালী নাম যে সারাৎসারা ॥

মায়ে ছেলে চকিত দেখায়, স্নেহ ও দাবীর আদান-প্রদান হল পরস্পরের মধ্যে, ভাবে ভাব তরঙ্গে। ভাব গদ-গদ-চিত্তে মাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে পুরুষোত্তম বাবুর সঙ্গে চল্লেন তিনি আহিরীটোলা তাঁর জন্মভূমি দর্শনে। মহারাজ আহিরীটোলায় এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন ভুতনাথ মিত্র মহাশয়, মহারাজকে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করবার জন্যে। জন্মভূমি দর্শন ক'রে মহারাজের মানসিক ভাব বালকের ন্যায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। অতীত স্মৃতি তাঁর চিত্তে এক এক করে ভেসে উঠলো। স্তরে-স্তরে সঞ্চিত অতীত ঘটনাবলীর বিস্মৃতির-স্মৃতি, সহসা জাগরিত হয়ে মহারাজকে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে নিয়ে গেল। এই সেই ভিটা, সেই বাড়ী আমার জন্মস্থান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ, দীর্ঘশ্বাস, উদ্দাম-উদ্দীপনা আঁখিজলে ভরা এই ভিটা, পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন এখন রয়েছে অটুট-অক্ষুণ্ণ, স্মৃতি স্বরূপ। ঐতো ঐ ঘরে আমার পিতা-মাতা দেহ রক্ষা করেছিলেন। মনে আসে কত কথা, মায়ের স্নেহ, পিতার আদর, দাদার ভালবাসা, সব হারিয়েছি; হারিয়েছি একমাত্র আদরিণী কন্যা ও তার অভিমানিনী মাকে। প্রতি ধূলিকণায়, ইঁট কাঠে, সাজ-সরঞ্জামে ভিতর-বাহিরে আজও বিজড়িত রয়েছে স্নেহ-বাৎসল্য, ভালবাসা, মমতা ও অভিমান আমার এই জন্ম-ভিটায়। একই ভূমি রয়েছে ব্যাপ্ত ভুবন প্রসারী—তবু কেন লাগে ভাল এই সীমাবদ্ধ জন্মভূমি? হলেও কুৎসিত ভাগাড়সম তবুও পবিত্র অতি পবিত্র, স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আমার এই জন্মভূমি। এই আবহাওয়ায়, এই মাটির রসে পুষ্ট আমার এ তনু এখন রয়েছে জাজ্জ্বল্যমান কিন্তু, তবু নাই অতীত ঘটনাবলী হারানো দিনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সজীবত্বে। কোথায় গেল এই বাল্যের হাসি-

কান্না, কৈশোরের চপলতা, যৌবনের প্রমত্ততা, কোথায় গেল সেই উদ্যম-উদ্দীপনা ? সবই কি কালের বঞ্চনায় কাল গহ্বরে হারিয়ে গেল ? না না এই পবিত্র মাটির ভিত্তি হ'তে প্রতি স্তরে স্তরে রয়েছে গাঁথা, হে মহান সাধক ! আপনার প্রসার চিত্তে প্রতি স্তরে স্তরে। উদাসী মন, উদাসী প্রাণ, উদাস বায়ুতে ভেসে গেলেও সবই রয়েছে নিহিত মহাকাল গর্ভে। পুনরায় অতীত ফিরে আসে সংস্কার-রূপে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের রূপ ধ'রে কার্য্য ও কারণে।

যোগীর ভাব প্রবণতা এবং অতীতের পুনরাবৃত্তি সান্ত্বনা ব'লে মহারাজ, জন্মভূমিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে সজল নয়নে জন্মস্থান ত্যাগ ক'রে ভক্তবৃন্দদের সঙ্গে ভূতনাথবাবুর বাড়ীতে গেলেন। শ্রীগুরুবাবার পদার্পণে ভূতনাথবাবুর আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগুরু বাবাকে সেবা ক'রে তিনি ধ'রে পড়লেন, "বাবা ! আজ সন্ধ্যার সময় মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের 'শ্রীচৈতন্য লীলা' অভিনয় দেখতে যেতে হবে।" মহারাজের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু, ভক্তের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হ'য়ে তিনি দর্শন ক'রতে রাজী হলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম ভক্ত, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রণীত শ্রীচৈতন্য লীলা নাটক অভিনয়ে তখনকার দিনে জন-মনে প্রেমের বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল। প্রায় সবারই মুখে শোনা যেতো, "মেরেছো কলসী কানা, তা ব'লে কি প্রেম দিব না। মেরেছো বেশ ক'রেছো, একবার হরিবোলে নাচ দেখি ভাই।" কি মধুর এ হরিনাম, এই নাম মাহাত্ম্যে অবধূত নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সক্ষম হয়েছিলেন দুর্দ্দান্ত মাতাল জগাই ও মাধাইয়ের জীবন চরিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাতে। খ্যাতনামা নাট্যকারের রচনার গুণে অভিনয়ে বিশুদ্ধপ্রেম যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহারাজ ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ১৩৭-১নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীটে পণ্ডিত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দোতলার সিঁড়িতে খানিকটা উঠে তিনি ডাক দিলেন, "জয়গোপাল-জয়গোপাল !" মহারাজের গলার স্বর শুনে জয়গোপালবাবু তাড়াতাড়ি নীচে এসে মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে সাদরে তাঁকে নিয়ে গেলেন উপরের ঠাকুর ঘরে। জয়গোপালবাবুর কুলদেবতা বৃন্দাবন চন্দ্রকে দর্শন ক'রে মহারাজ খুবই প্রীত হ'লেন। ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ ক'রে তিনি বল্লেন, "জয়গোপাল, তুমি আমার সঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখবার জন্যে মিনার্ভা থিয়েটারে চল।" "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য", এই কথা ব'লে জয়গোপালবাবু, মহারাজের সঙ্গে মিনার্ভা

থিয়েটারে গেলেন। মহারাজকে 'শ্রীচৈতন্যলীলা' দেখাবার জন্যে ভূতনাথবাবু সেই দিনকার পালা ক্রয় ক'রে মহারাজের সম্মানার্থে, বিনা টিকিটে জন-সাধারণের দর্শনের সুবিধা ক'রে দিলেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চ আবাল বৃদ্ধ বণিতায় পূর্ণ হল। জয়গোপালবাবু, পুরুষোত্তমবাবু, ভূতনাথবাবু এবং মহারাজের অন্যতম শিষ্য প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজকে সাবধানে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষিত আসনে বসিয়ে দিলেন। সুযোগ্য শিল্পিরা মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে, অভিনয় আরম্ভ ক'রলেন। যখন নিমাইয়ের গৃহত্যাগ দৃশ্য আরম্ভ হ'ল তখন মহারাজ চোখ মুছতে লাগলেন।

শচী মাতা :—"আরে রে নিমাই!

কি নিয়ে সংসারে রব বল?

... ...

... ...

বজ্রঘাত ক'রো না হৃদয়ে,

এই হেতু জঠরে ধ'রেছি তোরে?

নিমাই :—কৃষ্ণ ব'লে কাঁদমা জননি;

কেঁদনা নিমাই ব'লে।

... ...

... ...

করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন,

মায়া বশে নাহি কর নিবারণ।"

নিমাইয়ের গৃহত্যাগে শচীমাতার আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণে দর্শকবৃন্দ সমবেদনা জানিয়ে, তাঁরা যে অভিনয় দেখছেন সে কথা ভুলে গিয়ে সবাই চোখ মুছতে লাগলেন। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও হা-হুতাশে রঙ্গমঞ্চ ভ'রে উঠলো বিষাদে। মহারাজ অভিভূত হ'য়ে ঘাড় নিচু ক'রে ব'সে শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভাবে ভাবাবেশে, মাতা-পুত্র-পরিবার সকলের মায়া ত্যাগ ক'রে আজ চল্লেন নিমাই সানন্দে অজানা অচেনা এক দুর্গম পথে, মহামন্ত্র হরিনাম সম্বল ক'রে, উন্মত্ত এ ধরায় নাম বিলাতে। শোকে-তাপে, দুঃখ-কষ্টে, অভাব অভিযোগে জীব বাধ্য হয় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ক'রতে কিন্তু নিমাই এ পথের পথিক নন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছায় স্বত-প্রবৃত্ত হ'য়ে জীবকে সর্ব্বতাপ হ'তে মোচন

করবার জন্যে। বড় বড় চুল-দাড়ি রেখে, কপালে তিলক বা ফোঁটা কেটে, গলে রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালা ঝুলিয়ে, রক্ত বা গেরুয়া বসন কিম্বা লেংটী আঁটলে যে, সন্ন্যাসী হওয়া যায় তা নয়। চিত্তে বৈরাগ্যের ছাপ না লাগলে, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আজকাল এই ঘোর কলিতে বৈরাগ্য না থাকলেও অনেক ভেকধারী সাধু সন্ন্যাসী আছেন যাঁদের সাজ-সজ্জা, ও বচন ভঙ্গীর তারতম্যে তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার হয় লোক সমাজে। এখন যাঁর শিষ্য ও ভক্ত বেশী তিনিই প্রধান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষ। আমি অবশ্য একথা বলিনা যে প্রকৃত সাধু বা ত্যাগী নেই; যাঁরা আছেন তাঁরা বেশীর ভাগই আত্মগোপন ক'রে থাকেন। এখন প্রায় চতুর্দ্দিকে হাটে-বাজারে দেখতে পাওয়া যায়, বিনা পুঁজির চতুর ধর্ম্ম ব্যবসায়ী সাধু-সন্ন্যাসী যাদের পদধূলি, ও আশ্বাস বাণী এবং ভস্মই কারবারের মূলধন। এছাড়া আর একদল আছে, কবচ, তাবিজ, মাদুলি, বশীকরণ, মারণ ও স্তম্ভনে ওস্তাদ তান্ত্রিক, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় নারীজাতির কাছে। এই ভাবে অজ্ঞদের প্রবঞ্চনা ক'রে যারা বিখ্যাত তান্ত্রিক সেজে অর্থোপার্জ্জন করে, তারা জানে না যে, এই অপকর্ম্মের ফল আত্মপ্রবঞ্চনা করা।

চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শকদের মন আকৃষ্ট ক'রলেও মহারাজ অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলেন। দুই একটি দৃশ্য দেখার পর তিনি ভক্তদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেন।

(২৩)

তারামায়ের বাৎসরিক উৎসব এসে গেল। মহারাজের ইচ্ছা এইবার উৎসব বেরিলী সহর কুলাহর্পিরে তাঁর পুরাতন শিষ্য শিব স্বরূপের বাড়ীতে হোক্। বেশ তাই হবে, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। মহারাজ ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে বেরিলী যাত্রা ক'রলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ ২০শে মে, তারামায়ের জলসা উৎসব বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হ'ল। বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, পূজা ও হোম সমাপনান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হ'ল। মহামায়া মায়ের সন্ধ্যারতির পর শীতল সমর্পন ক'রে মহারাজ প্রসাদ গ্রহণ ক'রলেন। কয়েকদিন শিষ্যের গৃহে অবস্থানের পর মহারাজ কাশীধামে ফিরে এসে এলাহাবাদ যাত্রা ক'রলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করবার জন্যে। ভারতবর্ষে ত্রিবেণী দুটি। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীকে যুক্ত বেণী এবং এলাহাবাদের ত্রিবেণীকে মুক্ত বেণী বলা হয়। যুক্ত বেণীতে গঙ্গা ও সরস্বতী নদী যুক্ত হয়েছে কিন্তু, যমুনা নদী ম'জে যাওয়ায় তার কোন চিহ্ন

পাওয়া যায় না। মুক্তবেণী এলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হ'য়েছে তাই তার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মুক্ত ও মুক্ত বেণী যোগীর যোগাবস্থার পরিচায়ক। দেহাভ্যন্তরে মূলাধার (গুহ্যদারের উপর) হ'তে ইড়া-পিঙ্গলা ও শুষুম্না নাড়ীত্রয় উত্থিত হ'য়ে মস্তকে সহস্রার পদ্মে ত্রিকোণাকারে শেষ হ'য়েছে। এই স্থানকে মুক্তবেণী এবং মূলাধারকে যুক্ত বেণী বলা হয়। ইড়া-গঙ্গা, পিঙ্গলা-যমুনা এবং শুষুম্না নাড়ী সরস্বতী নামে খ্যাতা।

এলাহাবাদ প্রয়াগতীর্থে স্নান করবার পর মহারাজ লক্ষ্ণৌ যাত্রা ক'রলেন এবং সেখান হতে জুন মাসে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে বরুণা নদীর উপর দিয়ে নৌকা যোগে উত্তর কাশী উপস্থিত হ'লেন। মণি কর্ণিকার ঘাটে স্নান ক'রে, বাবা বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, অন্নপূর্ণা দেবী, কাল ভৈরব, দুর্গাবাড়ী ও বিশালাক্ষী দেবীকে দর্শন ক'রে পুনরায় লক্ষ্ণৌ হ'তে কাশী এবং কাশী হ'তে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ভক্তদের একান্ত অনুরোধে, বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে তিনি ৩০শে আগষ্ট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বম্বে রওনা হ'লেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ অক্টোবর মাসে শারদীয়া পূজা আগমনের পূর্ব্বে খড়্গপুরে বেশ আনন্দ কোলাহল দেখা গেল। মহামায়া মায়ের আগমনে প্রকৃতি দেবী নব-সাজে সজ্জিত হ'ল নব-জাগরণে। আনন্দে মাতোয়ারা হ'য় হিন্দু-বালক ও বালিকা নূতন পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে। এত আনন্দের মাঝে দারিদ্র দোষে দূষিত কতকগুলি বালক ও বালিকা ফেলে চোখের জল নব-সাজে সজ্জিত হওয়ার সুযোগ না পেয়ে। মলিন তাদের মুখ-মণ্ডল, পরণে জীর্ণ কানি, হতাশায় বুকভরা। মহামায়া মা সবারই মা, শুধু ধনীদের মা তো নয়, তবে কেন এ অবিচার? কর্ম্মদোষ, ভাগ্যবিড়ম্বনা অনেক কিছু দোহাই দিই আমরা কিন্তু একমন, একপ্রাণ হ'য়ে যদি সমবেত ভাবে চেষ্টা বা কর্ম্ম করি, তাতে কি এই দারিদ্রদোষ নষ্ট করা যায় না? কর্ম্মে বা চেষ্টায় যদি কর্ম্মদোষ নষ্ট না হয়, তবে কি প্রয়োজন, অত জপ-তপ, ধ্যান-ধ্যারণা, সাধন-ভজনে? মহাপুরুষেরা যখন সাধন-ভজনে অলৌকিক শক্তি লাভ ক'রে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে সামর্থ হন তখন কেন এই দারিদ্র দোষ দূর করা সম্ভব হবে না? সার্থসিদ্ধি বা আত্মসিদ্ধি লাভের জন্যে মহাপুরুষেরা শক্তি সঞ্চয় করেন না, তাঁরা প্রয়োগ ক'রেন সেই সঞ্চিত শক্তি সাধারণের উপকারার্থে। যিনি নিজ সুখ অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে সাধন ভজনে অলৌকিক শক্তিলাভে প্রয়াস পান, তিনি স্বার্থপর, নীচমনা ও ভোগবিলাসী। সনাতন আর্য্য ঋষিরা সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, বনে বাদাড়ে, শ্মশানে মশানে বা গিরি-গুহায় কঠোর তপস্যা ক'রে যে,

অলৌকিক শক্তি লাভ করতেন, সেই শক্তি তাঁরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে দান ক'রতেন জীবের কল্যাণে। এই আদর্শ অনুসরণ করাই হ'ল প্রকৃত সাধনা নতুবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ করা হয়, তা হ'ল আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজ আত্মাকে মনের দ্বারা বহুর সাথে সংস্থাপন এবং বহুকে কেন্দ্রীভূত করে একে সংযোজনই হ'ল সাধনা। সংযোজন ও বিয়োজন এ সৃষ্টির ধারা। সর্ব্ব জীবকে সেবা এবং রক্ষা করাই হ'ল সিদ্ধিলাভ। আত্মতুষ্টি বা নিজে আনন্দ উপভোগ করা স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। যে নিজে শুধু আনন্দ উপভোগ করে অথচ অন্যকে উপভোগ করাতে পারে না, সে আনন্দ সীমাবদ্ধ, দানব দৈত্যানন্দ।

শারদীয়া পূজা আরম্ভ হ'ল খড়গপুরে বেশ জাঁকজমকে। মুখরা হ'ল প্রকৃতি দেবী পক্ষীকুলের কুজনে। শীতের জড়াবস্থা দেখা দিল তিনদিন পরে মায়ের বিসর্জ্জনে। জীবের জন্ম-মৃত্যুর সংবিধানে আগমনী ও বিসর্জ্জন নিরূপন হ'য়েছে সাধকের সাধ্য ও সাধনে। মহামায়া মায়ের স্থূলমূর্ত্তি বিসর্জ্জন হয় জলে, নদ-নদী বা সরোবরে সাধকের দেহাভ্যন্তরে। বাহ্য-মূর্ত্তি স্থূল হলেও দেহাভ্যন্তরে মহামায়া মা সূক্ষ্মাকৃতি কুল কুণ্ডলিনী শক্তি।

"যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং
ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম
দুর্গাং ভগবতীং মুনে"॥ (অথর্ব্ববেদ)

যাঁর কৃপায় ভক্ত লোকেরা ভক্তির দ্বারা যাঁকে বিশ্বেশ্বরী স্বরূপে দেখিতে পান, যাঁকে ভগবতী দুর্গা বলা হয়, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব।

শ্রীদুর্গার দক্ষ পদ ইন্দ্র, বাম-পদ বরুণ, ঊর্দ্ধনয়নতারা দেবাদিদেব মহাদেব, দক্ষিণ নয়নতারা ব্রহ্মা বা কার্ত্তিক, বাম নয়নতারা বিষ্ণু বা গণপতি, দক্ষিণ প্রথম হস্ত কালী, দ্বিতীয় তারা, তৃতীয় ষোড়শী, চতুর্থ ভুবনেশ্বরী, পঞ্চম ভৈরবী। বাম প্রথম হস্ত দেবী ছিন্নমস্তা, দ্বিতীয় মাতঙ্গী, তৃতীয় ধূমাবতী, চতুর্থ বগলা, পঞ্চম কমলা। মহামায়া মায়ের কপোলদেশ লক্ষ্মী দেবী, জিহ্বা (বাণী) সরস্বতী, কেশ মায়া, দেহ ধর্ম্ম, কটাক্ষ যমরাজ এবং ভ্রূ-যুগল স্নেহ বিলাস।

এই আনন্দের মাঝে হঠাৎ দেখা দিল বিষাদের ছায়া। খড়গপুরে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মিত্র মহাশয়ের অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। জিতেনবাবুর ১২।১৩ বৎসরের একমাত্র পুত্র বৈকালবেলা গিয়েছে ষ্টেশনে চিঠি ফেলতে কিন্তু, সে বাড়ীতে ফিরে না আসায় তার পিতা, মাতা

ও ছোটকাকা খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। আত্মীয় স্বজন সবাই তৎপর হ'য়ে উঠলেন বালকের খোঁজে। বহু অনুসন্ধানেও বালকের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। প্রফুল্লবাবু সেই সময় কর্ম্মক্ষেত্র ফিরোজপুরে (পাঞ্জাব) রয়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাওয়া যাচ্ছে না এই সংবাদ পেয়ে ব্যথিত হ'য়ে তিনি তাঁর গুরু মহানন্দ গিরি মহারাজকে বম্বে টেলিগ্রামে জানালেন। মহারাজকে জানাবার তৃতীয় দিবসে ভোরের অন্ধকারে জিতেন বাবুর অধীনস্থ এক কর্ম্মচারী মলত্যাগ করবার জন্যে যখন জঙ্গলে উপস্থিত হয় তখন সে দেখতে পেলে খৃষ্টানদের কবর স্থানের ধারে একটি বালক উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বনের মধ্যে ছুটা-ছুটি ক'রছে। কৌতুহল বশতঃ সে বালকের কাছে গিয়ে দেখে যে জিতেনবাবুর পুত্র, পাগলের মত বিড়-বিড় ক'রে কি বকছে ও ছুটা-ছুটি ক'রছে। বালকের এই অবস্থা দেখে সে বালককে বলপূর্ব্বক ধরে, জিতেনবাবুর বাড়ীতে নিয়ে এল। হারান একমাত্র পুত্রকে পেয়ে জিতেনবাবুর আনন্দের সীমা রইল না। অদৃষ্টের কি পরিহাস অনাহারে অনিদ্রায় ক্লিষ্ট বালক মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূতলে পতিত হ'ল। অনেক শুশ্রুষার পর চৈতন্য ফিরে এলেও বালকের মোহঘোর কাটলো না। এই অবস্থায় সে আপন মনে বল্‌লে, এক কাপালিক তাকে প্রলোভন দেখিয়ে শালবনের মধ্যে এক গুহায় আবদ্ধ রেখেছিল কালী পূজায় বলী দেবার জন্যে। দু-দিন পরে রাত্রে যখন কাপালিক গুহা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন করে সেই সুযোগে সে, গুহা হ'তে পালিয়ে গিয়ে কতকগুলি অরণ্যবাসী সাঁওতালের সাহায্যে গভীর শালবন হ'তে বেরিয়ে আসে।" কাপালিকের নিকট হ'তে উদ্ধার পেলেও অনাহারে অনিদ্রায় এবং ভয় ভাবনায় বালক এখন উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ছেলেধরা ছেলে ধরে অর্থের লোভে কিন্তু, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে এই নিষ্ঠুর কাপালিক দল পর সন্তান বধ ক'রে। ছিন্নমস্তা দেবীর উপাসক, মায়াহীন নিষ্ঠুর এই কাপালিক দল। জানেনা তারা, ছিন্নমস্তাদেবীর মূর্ত্তিতে কি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রয়েছে। প্রতিটি দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে সাধকের আধার অনুযায়ী সাধন তত্ত্বের প্রতীক স্বরূপ একের বহুরূপে প্রকাশ বিদ্যমান রয়েছে। সঙ্গমে যে জীবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি প্রকাশ পায় তাতে তার মৃত্যু বা লয়ই অবধারিত সত্য। সেই সত্য হ'তে সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে মহামায়া মা, ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ ক'রেছেন। রজোময়ি দেবী ছিন্নমস্তা, সঙ্গমে রত পুরুষ ও প্রকৃতি বা মদন ও রতিকে পদদলিত ক'রছেন রজোমাখা পদ দিয়ে। এক করে তাঁর অসি এবং অন্য করে নিজ ছিন্নমুণ্ডে পান করছেন নিজ রক্ত। এই রক্তধারার কিছু অংশ

মাটিতে পড়ে এবং ঐ রক্ত হ'তে রক্তমুখী জবার উৎপত্তি হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গম অর্থে তমোগুণের প্রতিকৃতি। বীরাচারী সাধক মায়ের রজোগুণাত্মক শ্রীপাদ পদ্ম সদা-সর্ব্বদা ভাবনা দ্বারা এই দুরন্ত কামরিপুকে জয় করেন। যতক্ষণ কামনা প্রবল থাকে ততক্ষণ মায়াও বেদনাদায়করূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সাধন ক্রিয়ায় যদি সাধকের রজোগুণ বৃদ্ধি পায় তখন তিনি সত্ত্বাংশযুক্ত সুতীক্ষ্ণ খড়্গের (বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা) দ্বারা রজোগুণ ছিন্নভিন্ন করেন। মুণ্ড অর্থে বুদ্ধি গুহা। এই গুহায় বুদ্ধি-বৃত্তি গুণ তারতম্যে সু ও কু হয়। সৎ বুদ্ধির দ্বারা তমো ও রজো গুণকে মন হ'তে বিচ্ছিন্ন করার জন্যেই ছিন্নমস্তা দেবী মূর্ত্তিমতী হ'য়েছেন। এই দেবীর এইভাবে ধ্যান ধারণায় সাধক অচিরেই দুস্তরা মহামায়ার কবল হ'তে ত্রাণ পান। পরশিশু বধে পূণ্য অপেক্ষা পাপ আরও বৃদ্ধি হয়।

বাহ্যিক বিচারে অস্তমিত তপন সায়ংকালে তমসায় আবৃত হ'য়ে প্রকৃতির অন্তরালে (ছায়ায়) আত্মগোপন করেন। তাই তাঁর রক্তিম ছটা গুটিয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। সন্ধ্যাদেবী প্রকৃতি এবং পুরুষ হলেন তপন। উভয়ের সঙ্গমে রক্তাভ রশ্মির বিকাশ ও নিকাশের প্রতিমূর্তি হ'লেন দেবী ছিন্নমস্তা। সূর্য্যদেবের অবস্থান হেতু উদয় ও অস্তে দশদিকের আকাশ দশরূপে প্রতীয়মান হয় ব'লেই দশ-মহাবিদ্যা পরিকল্পিত হ'য়েছেন। তবে সবই তাঁর ইচ্ছা, আমরা ইচ্ছাধীন।

বালকের আদ্যোপান্ত ঘটনা এলাহাবাদে মহারাজের কাছে জানান হ'ল, তিনি জানালেন, "কোন ভয় নেই, অতি সত্বর বালক আরোগ্য লাভ করবে।" বাক্‌সিদ্ধ মহারাজের আশিস বাণী পেয়ে বালকের পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনেরা আশ্বস্ত হলেন। দুই-একদিনের মধ্যেই বালক পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পেল। যিনি কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠা পালন করেন তাঁর যে কোন বাক্য সত্যে পরিণত হয়। সৎ কথা হ'তে সত্য কথার উৎপত্তি হয়েছে। সৎ অর্থে ব্রহ্ম তাই ব্রহ্ম ও সত্য একই তত্ত্ব।

ভগবান আছেন কিনা, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চ'লে আসছে আস্তিক ও নাস্তিক দুই দলের মধ্যে আবহমানকাল ধরে। একদল বলেন প্রকৃতিই সব। প্রকৃতির রীতি অনুযায়ী সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্ত, গাছে ফল-ফুল এসব সূর্য্যকেই কেন্দ্র ক'রে ঋতুর আগমন ও পরিবর্ত্তন হয়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রকৃতি বা স্বভাবের রীতি হ'ল আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা। প্রকৃতি দেবীতে তিনটি গুণ আরোপ করা হয়েছে, সত্ত্বঃ, রজো ও তমো। তাই প্রকৃতি দেবীকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হয়। প্রকৃতি কার এবং কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে

বলা যায় তিনি অনাদি এবং লীলার কারণ স্বরূপা। লীলাই ব্রহ্মের ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই তাঁর লীলা। প্রকৃতি দেবী যখন অনাদি তখন, অজ্ঞেয় কোন অনাদি তত্ত্বেরই মহিমা, স্বভাব সৌন্দর্য্যে প্রকাশিকা। এক চৈতন্যে যখন জগৎ চেতনাময় হয় তখন সেই চৈতন্য সত্ত্বাই ব্রহ্ম বা ভগবান।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং
নাম চেতাংশ পঞ্চকম্।
আদ্যাত্রয়ং ব্রহ্মরূপং
জগদরূপং ততোদ্বয়ম্॥"

এ জগৎ চৈতন্যময়। বৃক্ষ-লতা, ধাতু ও প্রস্তরাদি জড় হ'লেও অচেতন নয়। তাদের চেতনাশক্তি অনুরুদ্ধ রয়েছে ব'লে এবং তমোগুণের আধিক্যবশতঃ আমাদের কাছে অচেতন প্রতীয়মান হয়। সত্ত্বগুণের আধারে চৈতন্যশক্তির প্রকাশ অধিক ব'লে মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশে বিকশিত হয়। রজোগুণ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পশুতে প্রবল এবং তমোগুণ প্রাণেন্দ্রিয়, বৃক্ষলতাদিতে বেশী কার্য্যকরী। উদয়কালীন সূর্য্য হ'তে মধ্যাহ্ন এবং অস্তাবধি ত্রি-সন্ধ্যায় তিনটি গুণের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রভাত সত্ত্বগুণ, মধ্যাহ্ন রজোগুণ এবং তমোগুণে আঁধার নিত্য নৈমিত্তিক ধারা। এই ভাবে চলেছে প্রকৃতি দেবীর খেলা আবহমান কাল ধ'রে। যে চৈতন্য সত্ত্বার শক্তির বলে সূর্য্য দীপ্তিমান্, চন্দ্র স্নিগ্ধ আলোকে পূর্ণ, বায়ু প্রবাহমান, এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় সেই শক্তিমান চৈতন্য সত্ত্বাই ভগবান এবং তাঁর অনাদি শক্তিই হলেন ভগবতী বা দেবী পার্ব্বতী। ভগবান আছেন ব'লেই পরস্পর বিরোধী হ্যাঁ ও না, এই দ্বন্দ, সন্দেহের মাঝে ফুটে ওঠে মানুষের মনে, সুখ ও দুঃখে। যে বস্তুর পৃথিবীতে কোন অস্তিত্ব নেই, সেই বস্তুর বিষয় মানুষের মনে কখন উদয় হ'তে পারে না। কারণ বাস্তব রসে মন পুষ্ট এবং বাস্তব ভঙ্গিতেই সে রূপায়িত। ভূত আছে কিনা? মনে ভয় থাকলেই ভূত আছে না থাকলে ভূত নেই। ভগবান ঘটিত ব্যাপারে আধার অনুযায়ী ঐ একই উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তবে যতকাল জীবের জন্ম ও মৃত্যু ভোগ থাকে ততকাল ভগবান আছেন। যখন আমিও নেই, তুমিও নেই, তখন এ পৃথিবীও নেই, ভগবানও নেই।

"শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যো পরে ব্রহ্মনি শব্দতে
মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ কারণে।
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভ কারোঽর্থ দ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গ কারর্থ স্তথা মুনে॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশ সঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলানি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু ব কারর্থ স্ততোঽব্যয় ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।২-৭০)

ভ, অর্থে=সংভর্ত্তা বা শাসন কর্ত্তা অথবা ধারণকর্ত্তা। গ, অর্থে নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (অষ্টসিদ্ধি), বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ভগ কথার অর্থ। ব, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং নির্ব্বিকারভাবে স্থিত। ৎ, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত।

এলাহাবাদে এক ব্রাহ্মণ যুবকের ধর্ম্ম, ভগবান বা সিদ্ধ যোগীদের প্রতি কোন আস্থা ছিল না। তিনি ভাবতেন এবং মাঝে মাঝে ব্যক্ত ক'রতেন, "ভগবান-টগবান্ সব বাজে, ও সব কিছুই নেই; আমি যা করি তাই সব।" কিছুকাল পরে দৈবক্রমে তাঁর অতি প্রিয় এক পুত্র হঠাৎ দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ল। তিনি তাঁর সর্ব্বশক্তি ও সম্পদ দিয়ে, ডাক্তার বৈদ্য ইত্যাদি বহু অর্থ খরচ ক'রেও যখন পুত্রকে রোগ মুক্ত ক'রতে পারলেন না তখন তাঁর "আমিই সব", এই অহংকার চূর্ণ হ'ল। ভগবান নেই এই ভাবের অন্তরালে একটা যে কিছু সত্তা আছে, হতাশার মধ্যে এই ভাব নিয়ে তিনি চোখের জলে, সেই অদৃশ্য সত্তার কাছে মনে মনে পুত্রের আশু মঙ্গল কামনায় কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। দৈব সহায় ব্যতীত এই দূরারোগ্য ব্যাধি হ'তে পুত্রের জীবন রক্ষার কোন আশা নেই দেখে তাঁর ভগিনী, পত্নী এবং আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে একবার মহারাজের কাছে শরণাপন্ন হ'তে বল্লেন। যাঁর ভগবানে বিশ্বাস নেই তিনি কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'রতে পারেন জটা-জুটধারী সন্ন্যাসী বা ফকিরদের? অনিচ্ছা সত্তেও আত্মীয় স্বজনদের পীড়া-পীড়িতে, তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তিনি বাধ্য হ'লেন মহারাজের শরণাপন্ন হ'তে। সেই সময় মহারাজ এলাহাবাদে এক ভক্তের বাড়ী দ্বিতল এক কক্ষে অবস্থান ক'রছেন। দৈবের লিখনে আজ নিরীশ্বর বাদীর চরম পরীক্ষা। যুবক যখন মহারাজের ভক্তের বাড়ী উপস্থিত হ'লেন সেই সময় মহারাজ দ্বিতল ঘরে বিশ্রাম ক'রছেন এবং তাঁর ভক্ত শ্রীকেশব বিষ্ণু বেহেরে মহারাজের সেবায় রত। হঠাৎ মহারাজ শয্যা হ'তে ধড়-মড়িয়ে উঠে পড়লেন এবং এক চিমটি হোমের ভস্ম কেশববাবুর হাতে দিয়ে বল্লেন, "নীচে এক ব্রাহ্মণ যুবক এসেছে, তার পুত্রের খুব অসুখ, তাকে এই ভস্ম দিয়ে বল, কোন

ভয় নেই, এখনি বাড়ী ফিরে গিয়ে যেন একটু ভস্ম সে পুত্রের মুখে ও শিরে দেয় তাহলেই রোগ মুক্ত হবে।" মহারাজের নির্দ্দেশ মত কেশব বাবু নীচে নেমে এসে, যুবকের হস্তে ভস্ম দিয়ে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বল্লেন। যুবক বাড়ী ফিরে মহারাজের নির্দ্দেশ মত পুত্রের মুখে ও শিরে ভস্ম স্পর্শ ক'রে দিলেন। মহারাজের কৃপায় বালক অচিরেই রোগমুক্ত হ'ল। পবিত্র ভারতের প্রকৃত সাধুরা যে ভগবানের দূত এবং ভগবান আছেন এই ধারণাই যুবকের বদ্ধমূল হ'ল। ক্রমশঃ যুবক মহারাজের খুবই অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর সেই প্রিয় পুত্র শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী, এলাহাবাদ, কর্ণেলগঞ্জে এখন সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন।

মহারাজের এক অন্যতম শিষ্য শ্রীকেশব বিষ্ণু বেহেরে শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র মহাশয়ের মাধ্যমে এই তথ্য সরবরাহ করেছেন।

(২৫)

কয়েকদিন মাত্র এলাহাবাদে অবস্থানের পর মহারাজের ইচ্ছা হ'ল কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন ক'রবেন। দেশ বিদেশে তীর্থ পর্যটন ক'রতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু সে অর্থ আসবে কোথা হতে? অর্থ যেমন অনর্থ ঘটায় তেমনি আবার না থাকলে কিছুই করা সম্ভব হয় না। কলির জীবের অন্নগত প্রাণ, অর্থ না থাকলে তার বিনিময়ে জীবন রক্ষার্থে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় বা পথ খরচ করা যায় না। আদান-প্রদান এই নিয়ে চলেছে জগৎ আবহমান কাল ধরে বিনিময়ের সূত্রে। মাধুকরী বা অজগর বৃত্তি জীবন রক্ষার্থে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অন্যের উদার মনোভাব ও করুণার উপর। কর্ম্ম, ব্যবসা বা গুণ দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হয়, তা হ'ল স্বেচ্ছা প্রণোদিত পরস্পরের সহযোগিতার বিনিময়। অর্থের প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে সদ্ব্যয় করাই হ'ল শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সঙ্গত ব্যয়।

ভগবানের ভক্তের প্রতি কি অসীম করুণা। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে ভগবান পাঠিয়ে দিলেন মহারাজেরই এক ভক্তকে এলাহাবাদে। হঠাৎ মহারাজকে দর্শন ক'রতে এলেন পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয় এলাহাবাদে। মহারাজের অমরনাথ দর্শন করবার ইচ্ছা হ'য়েছে শুনে তিনি সানন্দে বল্লেন, "আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।" ১৯২৪ খৃঃ আগষ্ট মাসের শেষ দিকে তাঁরা এলাহাবাদ হ'তে যাত্রা ক'রলেন। রাওয়ালপিণ্ডি ষ্টেশনে নেমে তাঁরা পদব্রজে অগ্রসর হলেন। রাওয়ালপিণ্ডি ষ্টেশন হ'তে প্রায় আড়াইশত

ক্রোশ দূরে পর্ব্বত গুহায় বাবা অমরনাথ বিরাজিত। চড়াই ও নামাই, সাপের মত আঁকা-বাঁকা পথে চলেছেন গুরু ও শিষ্য তীর্থরাজ দর্শনে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত এই মহান্ হিন্দু তীর্থ নির্জ্জন-নিস্তব্ধ এক স্বপ্ন রাজ্য। বিচিত্র বৃক্ষ-লতা গুল্মে পরিবৃত নৈসর্গিক অপরূপ দৃশ্যে মণ্ডিত এই পবিত্র স্থান অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় মাধুরীতে পূর্ণ। তীক্ষ্ণ শীতল বায়ু বইছে, মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়ে দিচ্ছে, "হে ক্ষণ ভঙ্গুর জীব! অহংকার ও অভিমান ত্যাগ কর। তোমার সঙ্গতির রূপসজ্জা, বাহ্যিক মনোমুগ্ধকর আবরণ, প্রকৃতি দেবীর এই অবর্ণনীয় রূপ সৌন্দর্য্যের কাছে অকিঞ্চিৎকর ও অতিনগণ্য। মান অভিমান সব ত্যাগ ক'রে, সরল মনে, উদার প্রাণে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভাল ক'রে লক্ষ্য কর এই নয়নাভিরাম স্নিগ্ধসৌন্দর্য্য সেই একেরই মহিমা প্রচারে প্রতিভাত হয়েছে। গুরু ও শিষ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হ'য়ে এদিক-ওদিক দেখছেন। এত দেখেও যেন তাঁদের তৃপ্তি হচ্ছে না। অদূরে তুষারাবৃত শৃঙ্গের আকাশচুম্বি মনোহর শ্বেত মূর্ত্তি যেন স্বয়ং শঙ্কর যুগ-যুগান্তর ধ'রে কঠোর তপস্যায় সমাসীন। উদিত তপনের আনন্দ নৃত্যে, সপ্তবর্ণের খেলায় শুভ্র আকাশ, নীল, লাল, কখন পীতাভ, কখন বা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত উজ্জ্বল আভায়। এত চাতুরী, এত কারিগরী, সূক্ষ্ম হস্তের শিল্পকলায় বিশ্বকর্ম্মা অপ্রতিদ্বন্দী রহস্যময় ওস্তাদ। ছোট ছোট কুঞ্জে বংশীর ন্যায় পক্ষীকুলের কূজন, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু নাদ আকর্ষণ করে সবার প্রাণ— এসো-এসো, জীবন সার্থক কর, মনহারিণী প্রকৃতি দেবীর রূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ একবার দেখ। কি জানি কি আকর্ষণে উদাসী মন বোবা হ'য়ে ছুটে চলে যায় কখন ধবল শৃঙ্গে, কখন স্নাত হয় কুলু কুলু নাদিনী নির্ঝরিণীর শীতল স্বচ্ছ জলে; আবার ঘুরে বেড়ায় কুঞ্জে কুঞ্জে, চয়ন করে বিচিত্র বরণের পুষ্প, সুবাসে পূর্ণ। এত ছুটেও তার শ্রান্তি বা ক্লান্তি নেই, নেই অবসাদ বা জড়ভাব তীক্ষ্ণ শীতল বায়ুর স্পর্শে। কি যেন পেয়েও সে পাচ্ছেনা তাই সে চকিতে ছুটে চলে গেল আকাশচুম্বি ধবল শৃঙ্গে পেঁজা তুলার ন্যায় তুষার ভেদ ক'রে, গুপ্ত-তত্ত্ব সন্ধানে পরশমণির স্পর্শ পাবার জন্যে। যতক্ষণ হাঁক-পাকানি ততক্ষণ প্রতিকৃতি অচঞ্চল হ'লেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্বভাব হলেও চঞ্চল, মনে হয় প্রকৃতস্থ।

যত তাঁরা আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে উর্দ্ধে গমন ক'রছেন ততই তাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে মহারাজ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, "তাইতো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এত রূপ রস,

স্রষ্টা কোথায় পেলেন? কি ক'রেই বা সৃষ্টি করলেন?" বিশাল এ রূপের তটে কত যোগী, কত ত্যাগী হারিয়ে ফেলেছেন নিজসত্তা, রূপ সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে। চিত্রকরের দক্ষ হস্তের কারিগরী সূক্ষ্ম তুলির টানে, গড়ে উঠেছে এই মনোরম দৃশ্যাবলী, অদৃশ্য শক্তির শিল্পকলার চাতুর্য্যে। উদাস বায়ুর শীতল স্পর্শে ভেসে যায় মন দূরে—বহুদূরে, দিক্‌চক্রবালে, কি যেন এক অলক্ষ্যের সন্ধানে। চিত্রকরের তুলি বন্ধ হ'য়ে যায় প্রকৃতি দেবীর জাঁক-জমক রূপ-সজ্জা দেখে। ভাবুকের ভাব বৃদ্ধি পায়, অবাক হ'য়ে যায় চঞ্চল মন, প্রকৃতি দেবীর এই শান্ত উজ্জ্বল রূপের শীতল স্পর্শে। গুণাতীতের গুণপ্রসারণ, অকৃপণের ধন বিতরণ, প্রকৃতির এ বিরাট দান, ভোগ ঐশ্বর্য্যের শেষ অবদান। সৃষ্টির রূপ যদি হয় এত চমৎকার, না জানি স্রষ্টার রূপ আরও কত মনোমুগ্ধকর। গুণাতীতে গুণারোপ, অপরিসীম অসীমকে সীমাবদ্ধ করা এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করা ও অবর্ণনীয়কে বর্ণে রঞ্জিত করা বাতুলতা মাত্র।

ঠিকানায় পৌঁছতে এখনও সতের মাইল বাকী আছে। এই পথটুকু অতিক্রম ক'রলেই তাঁরা পৌঁছবেন বাবা অমরনাথের মন্দিরে। দুর্গম এই সতের মাইল পথ তুষারে আবৃত: এত পিচ্ছিল যে, অসাবধানতায় যে কোন মুহূর্ত্তে, প'ড়ে গিয়ে প্রাণান্ত ঘটতে পারে। মহারাজ নগ্ন পদে এই বিপজ্জনক তুষারাবৃত পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হলেন। তীব্র ভক্তি ও বৈরাগ্য উদয়ে মানুষ দেহাত্ববোধ হারিয়ে ফেলে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও চঞ্চল হয় না। অলক্ষ্য শক্তির আকর্ষণে মানসিক যে উদাস ভাব তাই হ'ল বৈরাগ্য বা দেহাত্ববোধে বীতশ্রদ্ধ। বৈরাগ্য এবং ভক্তি হ'ল ঈশ্বর মুখী প্রাণের ব্যাকুলতা। পিচ্ছিল পথ পার হ'য়ে যখন তাঁরা বাবা অমরনাথের মন্দিরের সন্মুখীন হ'লেন তখন মহারাজ আনন্দে 'ওঁ', কার নাদ তুলে মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ী খেতে লাগলেন। সনাতন আর্য্য ঋষি ও যোগী মহাপুরুষদের পদরেণু সারা অঙ্গে মেখে তিনি গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। গুহার অভ্যন্তর এতো বৃহৎ যে, প্রায় ৪।৫ শত যাত্রী আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে পারে। গুহার মধ্যভাগে একটি কুণ্ডের মধ্যে প্রায় এক হস্ত পরিমিত ধবল তুষারের শিবলিঙ্গ বিরাজিত। দক্ষিণে গণপতির মূর্ত্তি চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক। প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উজ্জ্বল স্ফটিকের শিবলিঙ্গ এই মন্দিরে পূজিত হন। বাবা অমরনাথের ভোগারতির সময় এক জোড়া শ্বেত বর্ণের কপোত নিত্য উড়ে এসে বসে পর্ব্বত শিখরে এবং প্রসাদ গ্রহণের পর অদৃশ্য হয়। প্রবাদ আছে এই কপোত দর্শনে মোক্ষ দর্শন হয়।

মহারাজ ও পুরুষোত্তম বাবু, বাবা অমরনাথের পূজা দিয়ে মোক্ষ দর্শন ক'রে নেমে এলেন পর্ব্বত শিখর হ'তে সমতল ভূমিতে। ফেরবার পথে তাঁরা একান্নপীঠের অন্তর্গত অন্যতম দেবী ভগবতী (কাশ্মীরে সতীদেবীর কণ্ঠ পতিত হয়) বা মহামায়া এবং ভৈরব ত্রি-সন্ধ্যেশ্বর শিব-লিঙ্গ দর্শন ক'রে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে আগ্রায় উপস্থিত হলেন।

(২৬)

মরুতীর্থ হিঙ্গুলায় সতী দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছে। দেবী কোট্টরী এবং ভৈরব ভীমলোচন উল্লেখযোগ্য। দুর্গম এ মরুপথ, মরীচিকায় জীবনান্ত ঘটে পথভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের। ধূ-ধূ ক'রছে বালুকারাশি, যতদূর দৃষ্টি যায়। শোকার্ত্ত চিত্তই মরু এবং আশাই জীবের মরীচিকা। কুণ্ডলিনী শক্তিই দেবী কোট্টরী এবং নাভি মধ্যে স্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিবই দেবীর ভৈরব ভীমলোচন। এই সয়ম্ভু লিঙ্গ শিবের ছিদ্র মধ্যে কোটরে অনাদি শক্তি কোট্টরী দেবী সুশুপ্তা অবস্থায় নিদ্রিতা রয়েছেন। এই শক্তির জাগরণে উত্তপ্ত মরুময় চিত্ত শীতল ও সরস হয় এবং তখন থাকে না জীবের ভব যন্ত্রণা, মহামায়া মায়ের স্নেহ বিলাসে। এই মরুময় দুর্গম স্থান অতিক্রম ক'রতে হ'লে উচ্চ উটের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হয়। মনের দ্বারা কৌশলে (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা) চিত্তে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে জীবাত্মাকে সহস্রারে পরমাত্মায় লীন ক'রতে হয় তখন সাধক উত্তপ্ত মরু পার হ'য়ে, চির শান্তিময় পবিত্র স্থানে উপস্থিত হন। সতীদেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র হ'ল পরম শিবের শান্তিময় আলয়। ঐ আলয়ে যদি সাধক তীব্র ভক্তির দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে জীবাত্মাকে কৌশলে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের পাদ-পদ্মে স্থাপন ক'রতে পারেন তাহলে আর তাঁকে ভবিষ্যতে মরুময় এ সংসারে ক্ষোভ ভোগ ক'রতে হবেনা।

"মূল পদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্য সঞ্চয়ৈঃ।
তৎ প্রসাদমায়াতি মন্ত্র যন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥

(গৌতমীয় তন্ত্র)

মূলাধার স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি যাবৎ জাগরিত না হন, তাবৎকাল মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনা বিফল হয়। যদি বহু পুণ্যফলে কুণ্ডলিনী শক্তিদেবী জাগরিত হন তবে মন্ত্র সিদ্ধি লাভ হয়।

চলেছেন মহারাজ করাচি হ'তে উটের পিঠে তৃণশূণ্য দিগ্‌হীন বালুচরের উপর দিয়ে মরুতীর্থ হিঙ্গুলায়। জনমানবহীন নীরস এই বিস্তীর্ণ বালুকা রাশির মধ্যে মানুষের মনে স্বতঃই উদয় হয়, এসেছি একা, তাই যাচ্ছি একা। নিঃসঙ্গ এই মরুময় জীবনে আমার আপনার ব'লতে দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি আছি মরিচীকাবৎ আশার আশায়, কাল্পনিক ভাবে ভাববিলাসে। সব ভূয়া, আমার ব'লতে কেউ নেই, তুমিও নেই। অলীক এ মায়ার লীলা, সবই শূণ্য —মহাশূন্য। মহাশূণ্য, শূণ্যেই পূর্ণ. তাই সেথা নেই আমি তুমি পার্থক্য বা আমার তোমার স্থান। মরু ভীষণ মরু, সরস হয়না কখন, কল্পনা বিলাসে বা আনন্দের আতিশয্যে তাই আমি মরিচীকা এবং তুমি মরু। তুমি বিস্তীর্ণ মরিচীকার আধার আর আমি সীমাবদ্ধ তোমারই মরিচীকা। তোমারই রূপের জলবৎ চাক-চিক্য, ভ্রমরূপে প্রতীয়মান হয় আমি অহংকারে লীলা বিলাসে।

মাঝে মাঝে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় ভেসে আসে উত্তপ্ত বালুকারাশি, আবৃত করে পথ শ্রান্ত পথিককে দগ্ধ ক'রে মেরে ফেলবার জন্যে। নীরস এ বালুকাময় ক্ষণস্থায়ী এই সংসারে, জীবন যাত্রায় মায়া কল্পিত যে ক্ষণিক রসাস্বাদন হয় সে রস মরিচীকাবৎ মতিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নয়। জন্মালেই যখন মৃত্যু অবধারিত সত্য, তখন সত্যের সন্ধানে জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়। ক্ষণিক তৃপ্তির আশায় ছোটে জীব, আপনহারা হ'য়ে, মরিচীকার পিছু, তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্যে কিন্তু, তাতে ঘটে প্রাণান্ত ভ্রমে প'ড়ে। দিক্‌হীন এই মরু কান্তারে নেই দিকের সূচনা, মিশেছে নীল আকাশ বালুকারাশির কনক বরণে ঝুঁকে প'ড়ে। নিরীহ তৃষিত পশু উট মাঝে মাঝে কামড়াচ্ছে তার কুঁজ পিপাসা মেটাবার জন্যে। মহারাজের কাছে রয়েছে হরিতকীখণ্ড যার গুণে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁর একেবারেই লোপ পেয়েছে। সারারাত্র চল্‌লো উট দিগন্তপ্রসারী বালুকা অতিক্রম ক'রে এবং পরদিন বিশ্রাম নিলে তাপের সময় ছোট ছোট কুঞ্জ মধ্যে। এইভাবে দুর্গম মরুপথ অতিক্রম ক'রে মহারাজ হিংলাজ মরুতীর্থে উপস্থিত হ'লেন। পর্ব্বত গুহায় দেবী কোট্টরী বিরাজিতা। হিংলাজে দেবীকে দর্শন ক'রে কোটেশ্বর ভৈরবকে দর্শন ক'রতে হয় তা না হলে দর্শনের ফল পাওয়া যায় না। মহারাজ দেবীকে দর্শন ক'রে আগ্রায় ফিরে এসে বম্বে যাত্রা ক'রলেন। সেখানে পৌছে তিনি জাহাজে নারায়ণ সাগরে কচ্ছভোজে উপস্থিত হলেন। কচ্ছভোজের রাজসরকার, পোষ্টমাষ্টার এবং দেওয়ান সাহেবের সেবা ও সাহায্যে মহারাজ কোটেশ্বর ভৈরবকে দর্শন ক'রে আনন্দ লাভ করলেন।

কচ্ছভোজ তীর্থে স্থানীয় প্রথানুযায়ী যাত্রীদের উল্কি দেওয়া হয় কিন্তু, মহারাজ যোগী ব'লে তাঁকে উল্কির পরিবর্ত্তে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হ'ল। কোটেশ্বর ভৈরব দর্শন ক'রে মহারাজ ২৭শে মার্চ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে ফিরে এসে পুরুষোত্তম সিংহ মহাশয়ের বাসায় কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রলেন। কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করার পর তিনি বেনারসে ত্রিপুরা ভৈরবী মন্দিরে উপস্থিত হ'লেন।

"ত্রিপুরে ত্রিপুরস্ত্বেকং শিবং পরমকারণং
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ং।
লভতেহসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভীপসিতা॥"

(॥১০॥ শিবসংহিতা)

হে দেবী! একমাত্র ত্রিপুর শিবই পরম কারণ স্বরূপ, তদীয় চরণ কমলই অক্ষয়, শান্ত, অপ্রমেয়, অনাময় এবং যোগীগণের অভীপ্সিত। বুদ্ধিমান সাধকেই সেই পদ কমল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হিংলাজ তীর্থ দর্শন ক'রে মহারাজ কাশীধামে ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ পাইন ইত্যাদি ভক্তবৃন্দ ত্রিপুরা ভৈরবী মন্দিরে মহারাজকে দর্শন ক'রতে এলেন। ২৮শে এপ্রিল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বেণীলাল পাইন মহাশয়ের সুযোগ্য ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানি প্রসাদ পাইন এবং তাঁর পরিবারবর্গ সকলে মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পাছে মহারাজের সেবার ক্রুটী হয় সেই কারণে ভবানি প্রসাদ পাইন মহাশয় মহারাজকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং মহারাজের ইচ্ছামত বাস করবার জন্যে বাড়ীর উত্তরাংশে দোতলায় একখানি নূতন বড় ঘর তৈয়ারী করালেন। বাড়ীর এই উত্তবাংশের নাম রাখা হ'ল 'তারা কুটীর'।

(২৭)

২০শে মে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তারামায়ের জলসা মহোৎসব। এবার মহামায়া মায়ের উৎসব হবে মিসির পোকরায় তারা কুটীরে। ভবানীবাবু চারিদিকে সংবাদ পাঠিয়েছেন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের কাছে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রবার জন্যে। দুই একদিনের মধ্যে কাশীধামে উপস্থিত হ'লেন ভ্রাতা ও ভগিনীগণ বিভিন্ন স্থান হ'তে। তাঁদের যাতে কোন কষ্ট না হয় থাকা ও খাওয়ার সে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন ভবানিবাবু। আজ তারামাতেশ্বরীর মহোৎসব তাই ভবানিবাবু খুবই ব্যস্ত রয়েছেন বিশেষ ভাবে পূজার আয়োজনে। সদানন্দময় পুরুষ তিনি তাই সময়ে আহার নিদ্রা না থাকলেও

এত পরিশ্রমেও তাঁর মুখে হাসি লেগেই আছে। এই শুভ দিনে প্রভাত হ'তেই মহারাজ মৌন হ'য়ে মহামায়া মায়ের বিশেষ পূজায় ব্রতী হ'লেন। পূজা অন্তে বেদ ও চণ্ডীপাঠ এবং হোম যজ্ঞ হ'ল ভক্তির মাধ্যমে। মায়ের ভোগ নিবেদনের পর চল্‌লো প্রসাদ বিতরণ সন্ধ্যাবধি। বহু সাধু-সজ্জন, কুমার-কুমারী ও দরিদ্র জনগণ মায়ের প্রসাদে ধন্য হ'ল। মধ্যাহ্ন ভোগের পর ঠাকুর ঘর বন্ধ রাখা হ'য়েছিল হঠাৎ মহারাজ কি এক দ্রব্য ঠাকুর ঘর হ'তে আনবার জন্যে ইশারায় ভবানিবাবুকে নির্দ্দেশ দিলেন। ভবানিবাবু যেই চাবি খুলে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ ক'রলেন অমনি তিনি দেখলেন জনশূন্য ঠাকুর ঘরে গবাক্ষের নিকট উপবিষ্টা এক জ্যোতির্ম্ময়ী যুবতী রমণী নিজের কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখে ভবানিবাবু ভীত হ'য়ে বাবা! ব'লে চিৎকার ক'রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে প'ড়ে গেলেন। প্রিয় শিষ্যের চিৎকার শুনে মহারাজ দ্রুত ঠাকুর ঘরে প্রবেশ ক'রে তাঁর চোখে মুখে জলের ছিটা দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল তিনি মহারাজকে ভক্তি ভাবে প্রণাম ক'রে সব কথা প্রকাশ ক'রলেন।

সন্ধ্যারতি ও শীতলের পর মহারাজ কণিকা মাত্র মায়ের প্রসাদ গ্রহণ ক'রলেন। কিছুদিন কাশীধামে তারাকুটীরে অবস্থানের পর ২০শে জুলাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গোদাবরী নদীতে স্নান করবার উদ্দেশ্যে রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। বহু তীর্থ পর্য্যটন এবং সন্ন্যাস আশ্রমে তিন যুগ অতিবাহিত হবার পর মাথার জটা ত্যাগ ক'রতে হবে এই ছিল তাঁর শ্রীগুরু বাবার নির্দ্দেশ। ২৯শে জুলাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নিজ জন্ম সময় বেলা ১০টা ২০ মিনিট সময়ে মহারাজ স্বহস্তে জটা কর্ত্তন ক'রে তারামায়ের সম্মুখে এক রৌপ্য আধারে স্থাপন ক'রে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য ভবানি প্রসাদ পাইন মহাশয়ের হস্তে দিলেন। এই জটা উপলক্ষে সেই দিন পূজা, হোম, বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, কীর্ত্তন, ভজন ও সর্ব্বসাধারণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ক'লকাতা, এলাহাবাদ, বম্বে প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ভক্ত ও শিষ্য এবং শিষ্যাদের আগমন হয় এই জটা শঙ্কর উৎসবে। মহারাজের নির্দ্দেশ মত ভক্ত শিষ্যেরা নিত্য তারামায়ের পূজার সঙ্গে জটা শঙ্করের পূজা করেন। প্রতি বৎসর দোল পঞ্চমীর দিনে জটা শঙ্করের উৎসব প্রতিপালিত হয় মহানন্দ মিশনের ভক্তবৃন্দদের দ্বারা। মহারাজ এখন পরমহংস পদে অভিষিক্ত হ'য়েছেন ব'লে জটা ত্যাগ ক'রেছেন। পরম অর্থে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা বা সদাশিব। 'হং' অর্থে লয় এবং 'স' অর্থে

শক্তিকে বুঝায়। বেদান্ত মতে কুটিচক, বহুদক, হংস, পরমহংস ও অবধূত, শঙ্করাচার্য্যের দশনামি সাধুর মধ্যে গণ্য।

এত সাধন ভজন ক'রেও মহারাজের সাধন লিপ্সা গেলনা। ভক্তবৃন্দের মঙ্গল কামনায় তিনি এক অমাবস্যা হতে পূর্ণিমা অবধি ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে কঠোর সাধনায় ব্রতী হ'লেন। ক্রিয়া শেষ ক'রে যখন তিনি আসন ত্যাগ ক'রলেন তখন তাঁর প্রিয় শিষ্য ভবানি প্রসাদ পাইন মহাশয় তাঁর সেবায় তৎপর হ'লেন। মহরাজের দেহ জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার হলেও তাঁর সর্ব্বাবয়বে জ্যোতি পরিস্ফুট। স্মিত হাস্যে তিনি ভক্তদের আশিস দিলেন। ভক্তদের প্রতি এত টান, এত দরদ দেখে সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হতেন। তারামায়ের পূজা, বেদপাঠ এবং ভোগারতি সমাপন ক'রে মহারাজ মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমর্পন ক'রলেন।

(২৮)

শুধু কংখলে বা বেনারসে তারামায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রলে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা হবেনা এবং তাতে মায়ের মহিমা কীর্ত্তন সীমাবদ্ধই থেকে যাবে। শ্রীগুরু বাবার নির্দ্দেশ, "মায়ের নাম প্রচার ক'রবে, তাঁর পবিত্র নাম কীর্ত্তন ক'রবে।" বিভিন্ন স্থানে মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'লে চাই প্রচুর অর্থ। অর্থ সংগ্রহে মনঃস্থাপন ক'রলে স্বভাবতই চঞ্চল মন অনর্থে নিমগ্ন হয়। এই মনই হ'ল মা নিজে এবং মনই হ'ল ভগবান। চোর-জুয়াচোর, সৎ-অসৎ সব কিছু নির্ভর করে মনের সংকল্প ও বিকল্প ভাবে। কাজ নেই মন্দির বা মঠ স্থাপন করে, তাতে প্রভুত্ব ভাব জেগে উঠবে। অর্থ সংগ্রহে মন দিলে পাছে মন লোভী হ'য়ে যায় সেই কারণে মহারাজ মন্দির বা মঠ স্থাপনে বীতস্পৃহ ছিলেন। মন্দির, মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করবার জন্যে। ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রালোচনায় মন পবিত্র থাকে এবং আত্মানুভূতি লাভ হয় সাধন ভজনে। একাগ্রমনে তীব্র ভক্তির উদয়ে নিস্প্রাণ মূর্ত্তি সজীব হয় দৃঢ় বিশ্বাসে। ভগবান বা ভগবতী ইচ্ছাময় ও ইচ্ছাময়ি তাই দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদন তাঁদের ইচ্ছা ও করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা)

তাঁর কৃপা হ'লে বোবার বোল ফোটে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন ক'রতে পারে ; সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তদের অনুরাগ বাড়িয়ে দেবার জন্যে মহারাজ, বিভিন্নস্থানে গৃহী ভক্তদের বাড়ী "সাচ্চা গুরু দরবার" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দরবারের উদ্দেশ্য হ'ল সকাল ও সন্ধ্যায় স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমবেত ভাবে যোগদান ক'রবে এবং তারিণী মায়ের স্তব স্তুতি ও আরাধনায় কিছু সময় অতিবাহিত ক'রবে। যেখানে দরবার হ'তো সেখানে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি ও 'তারা-শঙ্কর' স্থাপন করা হ'তো। মহারাজ ব'লতেন, "বাহ্যিক মূর্ত্তি স্থাপন না ক'রলে ভক্তির উদয় হয়না। ভক্তির উদয় না হ'লে ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে। এই কারণে বাহ্যিক মূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়োজন আছে।" তারিণী দেবী পরমা বৈষ্ণবী, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ি। তিনি অদ্বিতীয়া, সাকারা হলেও নির্গুণা এবং নিরাকারা। তিনি ইচ্ছাময়ি ব'লে সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি বহুরূপে-বহুভাবে প্রকাশমানা হলেও সেই অনাদি, অনন্ত এক তত্ত্বের ইচ্ছাশক্তির বহু বিকাশ। ভেদ বুদ্ধির দ্বারা দেব-দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে একটিকে শ্রেয় এবং অপরটিকে হেয় মনে মনে ভাবা অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

ইষ্ট চিন্তাই জীবের আসল চিন্তা ইষ্ট অর্থে মঙ্গল, এক এবং ইচ্ছাশক্তি। যে চিন্তায় জীবের মঙ্গল হয় সেই চিন্তাই হ'ল ইষ্ট চিন্তা। "ব্রহ্মমেকা দ্বিতীয়ম্ নাস্তি", ব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নন। বিভিন্ন নদ-নদী সাগরে মিশেছে, যে কোন একটিকে অবলম্বন ধরে অগ্রসর হ'লে কালে আমরা সাগরে পৌঁছতে সক্ষম হ'বো।

"তদ্ ঐক্ষত অহম্, বহুস্যাম।" তাঁর ইচ্ছা হ'ল আমি বহু হ'য়ে লীলা ক'রবো।

একই ব্রহ্ম যখন বহুরূপে বহুভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীতে প্রকট হ'য়েছেন তখন আমরা যে কোন একটি দেব-দেবীর সাধনা ক'রে ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হতে পারি। যে কোন দেব-দেবীর বিশেষ ভাবে শরণাপন্ন হওয়াই হ'ল ইষ্ট চিন্তা। যাঁরা মাতৃসাধক তাঁরা বিষ্ণু, শিব, রাম বা কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখে ভাববেন, আমার ইষ্টদেবী কালী বা তারাই ঐ মূর্ত্তি ধারণ ক'রছেন। এই ভাবে চিন্তায় জীবের ভেদ-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সে তখন একের অবলম্বনে, সমজ্ঞানে সকল দেব-দেবীতে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করে। আধার অনুযায়ী চিত্ত সংগঠনে, কাল্পনিক ভাবমূর্ত্তি ফুটে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে। ভেদ বুদ্ধি সাধনার প্রধান অন্তরায়। এই ভেদ বুদ্ধি রূপ অজ্ঞানতাই হ'ল

মায়া। অনন্ত মায়াকে গুটিয়ে নিয়ে যে কোন একটি দেব-দেবীতে ভক্তির দ্বারা স্থাপন করাই হ'ল ইষ্ট চিন্তা। এই হ'ল প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এইভাবে মায়াকে সীমাবদ্ধ করাই হ'ল সাধনা এবং এই সাধনায় আনন্দ লাভ করাই হ'ল সিদ্ধি-লাভ। মায়ার বশীভূত যারা, চির-দুঃখী তারা।

মায়ের পবিত্র তারা নাম প্রচার করবার জন্যে মহারাজ, কাশী, গয়া ইত্যাদি বহুতীর্থ পর্য্যটন করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ জুলাই মাসে কাশীধামে অবস্থান কালে শ্রীগুরু বাবার পবিত্র জল-সমাধি দর্শন করবার অভিপ্রায়ে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে তাঁর ভক্ত পাপারজুর গৃহে দুইমাস কাল অবস্থানের পর, তিনি ১৭ই অক্টোবর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর ভক্ত জিতেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে 'দববার' করেন। এই সময় এক দৈব ঘটনা ঘটে তাঁর ভক্তিমতী শিষ্যা রাধামা স্বপ্নে জ্ঞাত হ'লেন যে, মহারাজ পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছেন। ১লা জানুয়ারী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রয়াগধামে 'পরমহংস জলসা উৎসব' পালন করেন।

কিছুকাল পরে মহারাজ প্রয়াগধাম ত্যাগ ক'রে বেনারসে মিশির পোকরায় পাইন কুটীরে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীভবানি প্রসাদ পাইনের ব্যবস্থায় ১১ই মার্চ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে "জটাশঙ্কর জলসা উৎসব" প্রতিপালিত হয়।

মিশির পোকরায় তারাকুটীরে বৈকাল বেলা মহারাজ যখন ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন সেই সময় এক ভক্ত জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "বাবা, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করা উচিৎ?" ভক্তের মুখে এই অদ্ভুত বাণী শুনে মহারাজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "দেখ বাবা সকল স্ত্রীলোক শক্তির অংশ, তাঁদের তারামাতেশ্বরী রূপে দর্শন ক'রবে। ইষ্টদেবীর কাছে কখন মোক্ষ কামনা ক'রবে না, কারণ কামনা ভোগ বাসনার অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয় জয় না হ'লে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। গৃহী এবং সন্ন্যাসীর কোন প্রার্থনা নেই। যিনি সংসারে থেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ।" বাহ্যিক পূজা সম্বন্ধে তিনি ব'লতেন, "বাহ্য পূজা করা উচিত কারণ বাহ্য পূজায় দেহ ও মন পবিত্র হয় এবং ক্রমশঃ বাহ্যপূজা অন্তর্মুখীন হ'য়ে চিত্তকে সত্ত্বগুণে গুণান্বিত করে।" ধ্যান-ধারণা এবং মন্ত্রজপে মন চিত্তে বশীভূত হয় ব'লেই তিনি ধ্যান-ধারণা ও মন্ত্র জপকে বশীকরণ ব'লতেন। বশীকরণ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ ক'রতে হ'লে যে সব আনুসঙ্গিক ক্রিয়া অভ্যাস করা প্রয়োজন তা তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিতেন।

(১) বৈরাগ্য অভ্যাস। (২) জাগতিক বিষয় বস্তু ভোগে জীব কখন চিরশান্তি ভোগ করতে পারে না তাই জীবন ধারণ ও দেহ ঠিক রাখার জন্যে পরিমিত ভোগ করা উচিত। (৩) ত্যাগ; শাস্ত্র নির্দ্দেশানুযায়ী সৎপথে অর্থোপার্জ্জন এবং বংশ রক্ষার্থে পুত্রহেতু বিবাহ করা উচিত। (৪) প্রত্যেক জীবের উচিত আয়ের প্রতি টাকায় এক পয়সা (বর্ত্তমানে ২ নয়া পয়সা) ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় করা। (৫) শরণ;—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর উপর নির্ভর ক'রে সকল কর্ম্ম সততার সঙ্গে সু-সম্পন্ন করা। (৬) অনুতাপ:—পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করা কর্ত্তব্য, তাতে পাপ ক্ষয় হয়। পুনরায় যাতে পাপ কাজ করা না হয় তার জন্য প্রতিজ্ঞা করা উচিত। (৭) বিবেক; অর্থাৎ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বস্তু ও বিষয় ত্যাগ ক'রে জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, ভজন-পূজন, স্তব ও স্তুতি পাঠ ইত্যাদি শাস্ত্র সম্মত কার্য্য করাই হল বিবেকের কর্ম্ম।

মাতৃ মহাপূজায় নিরীহ পশু বলি, মহারাজ সমর্থন ক'রতেন না। তিনি ব'লতেন, "মা নিজেই যখন পরমা বৈষ্ণবী তখন অহিংস নীতিই পরম ধর্ম্ম।" ইষ্টদেবীর পূজার সঙ্গে গুরু ও কুমারী পূজার তিনি সমর্থক ছিলেন।

"গুরু মূলং জগৎ সর্ব্বং গুরু মূলং পরন্তপঃ।
গুরোঃ প্রসাদ মাত্রেন মোক্ষমাপ্নোতি সদ্বশী॥"

(রুদ্রযামল)

গুরুই সমগ্র জগতের মূল বস্তু, গুরু তপ ও উপাসনার আদি কারণ। গুরু সন্তুষ্ট হইলে অবশ্যই শিষ্যের মোক্ষলাভ ঘটে।

গুরু পূজার সঙ্গে কুমারী পূজাও আবশ্যক ব'লে মহারাজ গুরু পূজায় সঙ্গে ইষ্ট দেবী জ্ঞানে কুমারী পূজাও ক'রতেন। যে কন্যা ঋতুমতী হয় নাই সেই কুমারীই হ'ল মায়ের প্রতিভূস্বরূপা। এই দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে কুমারী পূজা ক'রলে সাধকের শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়।

পরম গুরু সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর লীলাক্ষেত্র কাশীধাম। এই পবিত্র ধামে দেহ-রক্ষা ক'রতে হবে। দেহ যখন সবাই ত্যাগ ক'রতে বাধ্য তখন বৃথা বিলম্ব ক'রে লাভ কি? সাপের খোলস ছাড়ার মত, বার্দ্ধক্য জনিত এ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়। আচার, নিষ্ঠা, সাধন, ভজন, তীর্থ পর্য্যটন সব সাঙ্গ করে মহারাজ এখন স্থির আসন স্থাপন ক'রলেন কাশীধামে বিখ্যাত পাইন কুটীরে। কর্ম্মচঞ্চল এই বিরাট পৃথিবীর মহাশূন্যে অবস্থিতি, তাই সে একদিন মহাশূন্যে লয় পেয়ে কালের গহ্বরে লীন হবে তখন আর কি প্রয়োজন এই জরাজীর্ণ তনু ধারণ করে?

মায়ে ছেলে এ লুকোচুরী খেলায় ছেলে এখন শ্রান্ত ক্লান্ত ও স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন। মায়ের পবিত্র নাম কে প্রচার ক'রতে পারে? যেথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব অপারগ সেথা আমি কোন্ ছার যে মায়ের নাম প্রচার করবো। তুমি বলালে বলতে পারি, না বলালে বোবা হ'য়ে থাকি, খেতে দিলে তবে খেতে পাই; না দিলে উপবাসী থাকি; তবে কেন এ অভিমান, বৃথা অহংকার আমি নাম প্রচার ক'রবো? আত্মঘাতী রূপ আত্মতুষ্টি আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। হাত তোলার শক্তি দিয়েছো তাই তুলি, বলবার বা নাম করার শক্তি দিয়েছো তাই বলি বা নাম করি। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চলন-বলন, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃসরণ সবই তোমার শক্তিতে শক্তিবন্ত। মাগো অণু-পরমাণু হ'তে বৃহৎ অবধি তোমারই শক্তিতেবিকশিত ও লীলান্বিত তখন আমার এ অভিমান কৃপা ক'রে চূর্ণ করে দাও; আমি আমার এ ঘৃণ্য ভাবকে চিরতরে মুছে দাও এ ধরা হ'তে। ভাগ্য, কর্ম্ম, সাধন, ভজন কিছুই বুঝিনা, বুঝতেও চাইনা। তুমি মা, আমি ছেলে, ভুল, ত্রুটী অনেক ক'রেছি এখন কত ক'রবো তা জানিনা কিন্তু, মা তোমার তো অজানা কিছু নেই,—আমি যে তোমারই সন্তান, তাই মলা মাটি মাখলেও তুমিইতো সন্তানকে ধুইয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেবে মা। ভুল সন্তানেই ক'রে থাকে, তাব'লে মা হ'য়ে রাগ ক'রে আড়ালে লুকিয়ে থাকলে কি চলে? মা-মা, তারামাতেশ্বরী—সর্ব্বতাপনাশিনী—ত্রি-নয়না স্নেহ দায়িনী।

ভাগ্যই যদি হয় প্রধান
এ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।
কাজ কি তবে জপে-তপে
ওগো ভগবান॥
কর্ম্মদোষে ভাগ্য মন্দ
ভোগে জীব সবে।
কহেন শাস্ত্র অকপটে
মিথ্যা নাহি হবে॥
কর্ম্মে যদি কর্ম্মক্ষয়
নাহি কভু হয়।
নামের মাহাত্ম্য তবে
হবে অপচয়॥

কলিকালে নাম জপে
উদ্ধারিবে জীব।
হেলায়ও করিলে নাম
হবে তারা শিব॥
এ সব শাস্ত্রের বাণী
ঋষির বচন।
পঙ্গুও লজ্ঘায় গিরি
লইলে শরণ॥
কার্ কর্ম্ম কেবা করে
বুঝিয়া না পাই।
সংশয়ে কাল কাটে তাই
ভাগ্যেরে ডরাই॥

ভাগ্য, পুরুষকার এসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। শুধু এই জানি তারামা, তুমি ইচ্ছাময়ি, তোমার ইচ্ছাতেই ভাগ্য বা পুরুষকার গ'ড়ে ওঠে আবার ভেঙ্গে চুরে ধুলির সাথে মিশে যায়। বড়াই করা কিছুই চলেনা, যতক্ষণ আমি আমার ভাব মজ্জাগত হ'য়ে জেঁকে ব'সে থাকে ততক্ষণ অবধি চলে ভাগ্য ও পুরুষকারের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ। অনাদি তত্ত্বে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আধারই যখন মা, যে শব্দ জন্ম-মৃত্যু ও দুঃখ-কষ্টে যখন আপনা হ'তেই উচ্চারিত হয় এবং প্রতিটি জীব, জন্তু ও প্রাণী মাত্রেই উচ্চারণ করে সেই মা বুলিই থাক অস্তিমের সাথী হ'য়ে। মাগো! রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ তোমাতেই বহু হ'য়ে থাক্। আমি চাইনা স্বর্গ; চাইনা মোক্ষ; চাইনা বৈকুণ্ঠ ও নির্ব্বাণ; শুধু এই চাই থাক্ চিরসঙ্গিনী হ'য়ে আমার রসনায় বিবসনা মধু মা বুলি অহঃরহ। প্রতিধ্বনিত হোক অন্তর বাহির অমৃতময়ি এই মাতৃ-ধ্বনিতে। মা-মা, ত্রি-তাপনাশিনী তনয়ে মোক্ষপ্রদায়িনী তারা মাতেশ্বরী।

জানি তুমি কাছে আছ
তবু কেন পাইনা?
মা মরা ছেলের মত
কেঁদে মরি অবিরত,
দিয়ে দেখা দিলে ফাঁকি
ধরা তবু দিলেনা॥

তন্ত্র মন্ত্র জপের মালা
ছিল মনে পারের ভেলা
দেখি এখন বড় জ্বালা
বাড়ে শুধু যাতনা।
মধুরিমা মা-মা বুলি
লাগে ভাল যাই ভুলি
ধ্যান-ধারণা জপ-তপ
যাগ-যোগ অর্চ্চনা॥
ঐ মা বুলি যে শিখেছে
হৃদে যার ছাপ প'ড়েছে
তার কাছে নয়কো বড়
ধ্যান-ধারণা জপসাধনা।
সময় যে এগিয়ে এল
আর কেন বিলম্ব বল
মা বুলি সার্থক কর
মিটাও শেষ বাসনা॥

মহারাজের নিশ্চেষ্ট মনের উদাস হাব-ভাব দেখে ভক্তবৃন্দ আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় মুহ্যমান হ'লেন। হঠাৎ পিতাজীর একি হ'ল। কেন এ উদাস ভাব? তারামায়ের বিগ্রহ সম্মুখে তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন,—তাঁর দু-নয়নে ধারা ঝ'রে প'ড়ছে—কি যেন মাকে ব'লবো ব'লবো ক'রেও ব'লতে পারছেন না—তাই তিনি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছেন মায়ের মুখপানে উদাস ভাবে। তাঁর দেহ এখন ধীর স্থির এবং মন একে নিবদ্ধ। স্বভাবের ধর্ম্ম ক্ষুৎ-পিপাসা বা মল-মূত্র ত্যাগ এখন সবই যেন লোপ পেয়েছে। তবে কি পিতাজী, আমাদের ত্যাগ ক'রে মর-জগতের উর্দ্ধে যাবেন? নানা কথা গোপনে চলতে লাগলো বিষাদগ্রস্ত ভক্তদের মধ্যে। একনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য ভবানি প্রসাদ পাইন মহাশয় গুরু ভ্রাতাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বল্লেন, "পবিত্র এই কাশীধামে পিতাজী এসেছেন দেহ রক্ষা ক'রতে—এই তাঁর শেষ আসা। তাঁর অসীম কৃপায় তারামা আমায় পূর্ব্বেই জানিয়েছেন। সেবার যাতে তাঁর কোন ত্রুটী না হয় আমাদের সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তারামা আরো জানিয়েছেন যে, দেহ রক্ষার পর তাঁর পবিত্র দেহ যেখানে সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে জল সমাধি দেওয়া হয়েছে সেইখানেই পিতাজীকে

যেন জল সমাধি দেওয়া হয়।" এই কথা ব'লে ভবানিবাবু ছোট শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। থম্-থমে বিষাদ ভাবের মধ্যে চল্‌লো গুরু গম্ভীর নাদে মধুর তারানাম অবিরাম।

কি পবিত্র এই মধুর তারানাম, শোকে-তাপে, দুঃখ-কষ্টে, একবার উচ্চারণে সুধা ক্ষরে রসনায়, ঝরে প্রেমাশ্রু অন্তর বাহিরে। উর্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি এবং নিম্নাঙ্গ পুরুষ, একত্র সম্মিলনে তাঁরা হ'লেন কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি। বাস্তব ভঙ্গীতে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিভেদ থাকলেও মূলত: আত্ম তত্ত্বে কোন বিভেদ নাই, সেই প্রমাণই তারামূর্ত্তিতে পাওয়া যায়।

"আকাশন্তু মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরং।
তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্॥"

প্রথমে আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ তত্ত্বাকাশ, এবং তার উর্দ্ধে সূর্য্যাকাশ। ঐ সূর্য্যাকাশে সূর্য্যমণ্ডলে তারিণীদেবী বিরাজ ক'রছেন।

"চিন্ময়ি শ্রুতি রূপা যা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা।
অরূপা সর্ব্বরূপা সা,
সারদে মে প্রসিদতম্॥"

তিনি চিন্ময়ি অর্থাৎ চিরস্থায়ী চৈতন্য প্রদায়িনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আত্মস্বরূপা। তিনি ইচ্ছাময়ি তাই অরূপা ও সর্ব্বরূপা। এই কারণে তারিণী দেবীকে সাকারা ও নিরাকারা বলা হয়। হে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী তুমি প্রসন্না হও।

বিশুদ্ধ জ্ঞানই পরম পুরুষ এবং দ্বৈত ভাবে ভক্তি বা শক্তি হ'ল পরা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের বিপরীতে প্রকাশিতা ব'লে তারিণী দেবীকে বলা হয় "বিপরীত রতাতুরা।" পরম পুরুষ ধীর, স্থির, নিশ্চল, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন কিন্তু, তাঁর প্রকৃতি বা শক্তি বিপরীত বলেই মায়া বিস্তার ক'রে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রহসনে সদাই রত। এই কারণে বিপরীত রতা তুরা বলা হয়। এই শক্তি যখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অনুরুদ্ধ থাকেন তখন তিনি নিরাকারা, নির্গুণা। সগুণ ব্রহ্মে তিনি সাকারা হন ব'লেই তাঁকে ইচ্ছাময়ি বলা হয়। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং প্রকৃতিরূপ ধারণ করেছিলেন তাই তাঁর নিম্ন অংশ পুরুষ এবং উর্দ্ধ অংশ প্রকৃতি ব'লে তাঁকে অর্দ্ধনারীশ্বরী বলা হয়। শাক্ত আয়ানকে অবতার কৃষ্ণ যে, শ্যামা মূর্ত্তি দেখিয়ে ছিলেন সেই মূর্ত্তিই তারিণীদেবী পরম বৈষ্ণবী। এই শ্যামা মূর্ত্তি দর্শন ক'রে শ্রীরাধা

ভাবে বিভোর হ'য়ে তাঁর নিজ স্তন কমল কর্ত্তন ক'রে শ্যামা মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে প্রেমার্ঘ্য প্রদান ক'রেছিলেন। ঐ কর্ত্তিত স্তন কমল হ'তে কদলীর উৎপত্তি হয়, এই কারণে কদলীফল সর্ব্বপূজায় উপচার দেওয়া হয়।

বৈদান্তিকদের মতে তারাতত্ত্ব অতিগুহ্য ও জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। উত্তর মেরু হ'তে অক্ষোভ্য ঋষি তারা পূজার ক্রম প্রথম ভারতে আনেন এবং সিদ্ধ নাগার্জ্জুন ভারত বর্ষ ও মহাচীনে প্রচার করেন। এই অক্ষোভ্য ঋষি সর্পাকারে তারামায়ের শিরে স্থান পেয়েছেন। যাঁর ক্ষোভ নাই তিনিই অক্ষোভ্য অর্থাৎ আনন্দময় পুরুষ। অনেকের মতে ঋষি বশিষ্টই একমাত্র তারাপূজার প্রবর্ত্তক। বশিষ্ট অর্থে ইষ্টকে যিনি বশ ক'রতে সক্ষম হন তিনিই বশিষ্ট। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছা শক্তি, মঙ্গল ও এক। ইচ্ছা শক্তিকে একে (আত্মায়) বশিভূত ক'রতে পারলেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় এবং জীবের তাতে মঙ্গল হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ আনন্দ সে লাভ করে।

"ব্রহ্মমেকা দ্বিতীয়ম নাস্তি" এই জ্ঞান পথে অগ্রসর হবার একমাত্র প্রতীক হ'লেন ব্রহ্মময়ি তারিণীদেবী।

"আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরমং মোক্ষৈক সাধনম্।
জ্ঞানাগ্নিহৈব মুক্তস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
ন কর্ম্মনা বিমুক্তঃস্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥"

হে দেবি! আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা-জ্ঞাত হইলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাদন এবং ধনব্যয়ে জীব মুক্ত হয় না কিন্তু, আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়।

"জ্ঞান জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতামেবাত্মা যো জানতি স আত্মবিৎ॥"

মায়া প্রভাবে জ্ঞান-জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি প্রতিভাত হইতেছে। এই তিনটি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, যাঁহার এ বোধ দৃঢ় হইয়াছে তিনিই আত্মবিৎ।

সত্বঃ প্রধান মায়া দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, তমোপ্রধান মায়াদ্বারা জ্ঞেয় এবং রজো প্রধান মায়ার দ্বারা জ্ঞাতা কল্পিত হইয়াছে।

"প্রপঞ্চো-পশমং শান্তং শিব দ্বৈতম্ চতুর্থং।"

(মাণ্ডুকশ্রুতি)

মোক্ষ বা প্রলয়ের অবস্থায় কিছুই থাকে না। শিব শব্দে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝায়। পূর্বেই বলা হয়েছে শিবই তারিণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন। শিব হলেন প্রলয় বা মোক্ষের অবস্থা। সগুণ ও নির্গুণ শিব মূলতঃ একই। ই, শ, ব = ই = স্থিতি ; শ = লয় ; ব = সৃষ্টি। স্থিতির লয়ে শিব নির্গুণ এবং পুনরায় সৃষ্টিতে তিনি স-গুণ হলেন। স্থিতি, লয় ও সৃষ্টির মধ্যে তিনটি ভাব আছে। যথাঃ—ব্রহ্মা স্থূলরূপী জাগ্রদবস্থা, বিষ্ণু সূক্ষ্মরূপী স্বপ্নাবস্থা এবং শিব কারণরূপী সুষুপ্তি অবস্থা। ব্রহ্মোপনিষদ বলেন, "জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষরম্। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় উৎপত্তি ও লয় স্থান সুষুপ্তি। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যে, শিব হ'তেই উৎপন্ন হ'য়েছেন এবং শিবেই লয় পান এই সুষুপ্তি হ'তেই জানা যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা বীজ ভাবে বিদ্যমান রয়েছেন, একে তিন এবং তিনে এক, ব্রহ্মের এই হ'ল ত্রয়ীধর্ম্ম। পরম শিবের শক্তি বা প্রকৃতি হ'লেন আদ্যাশক্তি। মহামায়া মায়ের পদতলে যে মূর্ত্তি পতিত রয়েছেন তিনিই হলেন পরম শিব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য। সবই আছে কিন্তু, কারণ নাই ও কার্য্য নাই, কেবলই গুণ ও ভাব অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান রয়েছেন। সেই চৈতন্যের ইচ্ছা হ'ল সৃষ্টি ক'রবো তাই তিনি নিজ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে তারিণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রলেন।

এই পবিত্র ভারতে কত সিদ্ধযোগী ইচ্ছাশক্তিকে বশে এনে ভাব-শক্তির দ্বারা নামে, মা শব্দ উচ্চারণে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন যা, সাধারণের মনে সন্দেহ আনিয়ে দেয়। আমার নিজের শক্তি বা বুদ্ধি নেই ব'লে যে অপরের থাকতে পারে না এ ধারণা অজ্ঞান প্রসূত। জ্ঞানী গুরু শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবা, স্বামী বিবেকানন্দ, বাবা গম্ভীরানাথ প্রভৃতি শক্তিধর যোগী মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী, প্রেম ভক্তি ও জ্ঞানে মণ্ডিত। মা শব্দের কি মহিমা এই সব মহাপুরুষেরাই হৃদয়ঙ্গম ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। মনে আসে আর এক শক্তিধর মহামানবের কাহিনী যিনি বঙ্গ ও সংস্কৃত ভাষার পরমপিতা। নিঃস্বার্থ তাঁর দান ও চরম ত্যাগের কাহিনী আজও রয়েছে গাঁথা বাঙ্গলার প্রতি ঘরে ঘরে। এখন শোনা যায় লোকমুখে 'ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর—না দয়ার সাগর।' তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, দানী, জ্ঞানী, গুণী ও মাতৃভক্ত।

তারিণী মায়ের সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট মহারাজের শেষ প্রয়াণের দিন ঘনিয়ে এল। ঘন-ঘন ভাব সমাধিতে আচ্ছন্ন তাঁর অবয়ব, নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ অবস্থায় সমাহিত। বিশ্বমাতা ও প্রিয় পুত্রের এই পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে বিরহ বিচ্ছেদের অসহ্য যাতনা সন্তান আর সহ্য ক'রতে পারছেন না। এই মর-জগতে ক্রীড়ার পুঁতুল হ'য়ে, এলে বেলে খেলায় তিনি ভুলে থাকতে আর চান না। এখন তিনি চান বিশ্বমাতার চির-শান্তিময় কোল—সে শান্তিময় কোল পেলে থাকে না হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক-তাপ, এবং আমি—আমার অহংকার। মাঝে মাঝে সমাধি ভেঙ্গে গেলেও তিনি মহামায়ার কোলরূপী আসন ত্যাগ ক'রতে অনিচ্ছুক। এখন মহারাজের পবিত্র দেহ জড়ে পরিণত হ'লেও দিব্য কান্তিতে মণ্ডিত। মাঝে মাঝে ভেসে আসে কানে অস্ফুট মা-মা, ধ্বনি বেদনার সুরে, আকলি-বিকলি প্রাণের আবেগভরা আহ্বান। সে কাতরোক্তি শ্রবণে সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জেগে উঠে। শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসাদগ্রস্থ সন্তান এখন সর্ব্বহারা হ'য়ে আজ মহামায়া মায়ের শরণাপন্ন হ'য়েছেন। তাঁর ধীর-স্থির-অচঞ্চল তনুটি মহামায়া মায়ের স্নেহবাৎসল্য ও ঔদার্য্যের ভাব স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। এই ভাবে কেটে গেল ভীতিপ্রদায়িনী নিশি সন্দেহের অবকাশে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় থাকলেও ভক্তদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'তে লাগলো ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ও বিষাদে। ভোর ৫টা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সময়ে মহারাজের সমাধি ভেঙ্গে গেল। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়ন দ্বয় ধীরে ধীরে খুলে গেল। সেবক ভবানি পাইন মহাশয়কে বুকে টেনে নিয়ে তিনি আদর ক'রে বল্লেন, "আমার অবর্ত্তমানে মায়ের সেবা ক'রবে এবং তোমার গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়ে দেবে। আজ হ'তে তাদের ভার তোমায় দিলাম।" এই বাণী শুনে ভবানি পাইন মহাশয় শ্রীগুরুর চরণ যুগল স্পর্শ ক'রে কেঁদে ফেল্লেন। মহারাজ উদাস ভাবে মায়ের মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে আবেগে চিৎকার ক'রে উঠলেন "তারা মাতেশ্বরী—মা—মা—।" সব শেষ হ'য়ে গেল—চিরতরে মহারাজের শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হল। কুম্ভক বায়ু রোধে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে মহারাজ মর্ম্মান্তিক ৪ঠা এপ্রিল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সময়ে দেহত্যাগ ক'রলেন।

দু-দিনের খেলা শেষ হ'ল, ভক্তবৃন্দ মহারাজের শ্রীচরণে আছড়ে প'ড়ে, "বাবা—বাবা" ব'লে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। ভগবানের কি রহস্যময়

লীলা, ঐ মহৎ জীবনটা যোগ-যাগ, ধ্যান-ধারণা, ত্যাগ-নিষ্ঠা, তীর্থ পর্য্যটন ইত্যাদিতে গ'ড়ে তুলতে কত সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু, যাবার সময় এক মুহূর্ত্তও সময় লাগেনি। ধরার যাবতীয় কর্ম্ম, স্বভাবের ধর্ম্ম, মর্ম্মব্যথা সবই রইলো ধরাতে প'ড়ে কিন্তু, তিনি গেলেন একা লিঙ্গ-দেহে নিষ্কর্ম্মী ও নিগু‍র্ণ হ'য়ে। তবে কেন আমরা বলি আমি করি এবং আমার—আমার। এই তো পরিণাম কেউ ঊর্দ্ধে কেউ বা অধে যায়। যাবার সময় কেউ তুমি ভাব নিয়ে যায় চিরতরে, আবার কেউ ফিরে আসে ধরাতে আমি—আমার ভাব মেটাবার জন্যে। কিছুই বুঝিনা, বুঝতে গেলে নিজেকে হারাই জীবন- মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অর্থ-সম্পদ, যশ-ভাগ্য, সুখ-দুঃখ, সবই এক মুহূর্ত্ত সময়ের অপেক্ষায় নির্ভর করে কিবা ধনী কিবা দরিদ্র, সাধু-সন্ন্যাসী কারো রেহাই নেই রহস্যময়ের লীলা চক্রে।

মহারাজ দেহ রক্ষা ক'রেছেন এই সংবাদ যখন কাশীধামে ছড়িয়ে প'ড়লো তখন চারিদিক হ'তে ছুটে এলেন পাইন কুটীরে,, দণ্ডী-স্বামী সাধু, সন্ন্যাসী ও অগণিত ভক্ত মণ্ডলী। কিছুক্ষণ পরে মহারাজের পবিত্র দেহ পাইন কুটীর হ'তে চতুর্দ্দোলায় পুষ্প শয্যায় শায়িত ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল অসি ঘাটের উপরে যে, বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে অবস্থান ক'রতেন। সেখানে আরতি প্রদান ক'রে ভক্তবৃন্দ বহন ক'রে আনলেন তাঁর পবিত্র দেহ, মান মন্দিরের ঘাটে। একটি পাথরের সিন্দুকে চন্দন চর্চ্চিত পুষ্প শয্যায় শায়িত ক'রে নৌকা যোগে, তাঁর পবিত্র দেহ আনা হ'ল দত্তাত্রেয় মন্দিরের সম্মুখে জ্ঞান গঙ্গার মাঝখানে এবং তারানাম সহকারে জল সমাধি দেওয়া হল বেলা ৩টা ২০ মিনিট সময়ে।

পরের ঘর দিয়ে ছেড়ে
নিজ ঘরে গেলেন ফিরে।
ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর এ ঘর
সদা নড়ে লাগলে ঝড়
কালের বুকে সহে কত
মহাকালে কাল যে হরে॥
আপনারে যে আপনি চিনে
নাই ভয় তার শেষ দিনে
মুখে তারা হৃদয়ে তারা
উঠে ঝঙ্কার ত্রি-তারে।

অসীমের এ সীমা ঘেরা
ভেঙ্গে দিয়ে ভব কারা
গেলেন চলে মায়ের কোলে
নিরঞ্জন নিরাকারে ॥

মহারাজের দেহ রক্ষার পর গ'ড়ে উঠলো মহানন্দ-মিশন ভক্ত ও শিষ্যদের আন্তরিক চেষ্টায়। মহারাজের অতিপ্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য মিশনের প্রধান কর্ত্তারূপে স্থলাভিষিক্ত হ'লেন ভবানন্দ গিরি মহারাজ (শ্রীমৎ ভবানি প্রসাদ পাইন)। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাই যে, যাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ও সাহায্যে মহাপুরুষের এই জীবনী প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হই সেই সর্বত্যাগী সদানন্দময় ভবানন্দগিরি মহারাজ ৪ঠা জুলাই ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে, বুধবার রাত্র ৩টা ১৭ মিনিট, শুক্লা নবমী তিথিতে গাজিয়াবাদে (মীরাট) দেহরক্ষা করেন। ৫ই জুলাই বেলা ১১টা ২০ মিনিট সময়ে শুক্রবার উল্টোরথের দিন গড় মুক্তেশ্বরে পবিত্র গঙ্গা গর্ভে তাঁকে জল সমাধি দেওয়া হয়। ভবানন্দগিরি মহারাজের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ গিরি মহারাজ (শ্রীবিমল ঘোষ) মহানন্দ মিশনে এখন প্রধান কর্ত্তারূপে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রে মিশনের শ্রীবৃদ্ধি করুন এই কামনা করি। এই পুস্তক প্রকাশে মহানন্দ গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্য শ্রীসুকুমার মিত্র (৭/ই, গৌর সুন্দর শেঠ লেন, সিতি, কলিকাতা-৫০) আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি—
বিনীত—লেখক

সমাপ্ত

দৈনিক বসুমতী (তাং ৪।৮।১৯৬৮)

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত :—শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বামদেব সংঘ, ৮, প্রামাণিক ঘাটরোড. কলিকাতা-৩৬ হইতে শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—২'০০।

ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্র বলতে প্রধানতঃ যে বেদ ও তন্ত্রকে বোঝায়, সেই বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার দ্বি-বিধ মূল ধারাই বিশ্লেষিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে। ....মূলতঃ বেদান্তে ব্রহ্মই সর্ব্বকারণিক হিসাবে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, তন্ত্রে অঘটন গটিয়সী মহাশক্তি রূপিণী মহামায়াকেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই উভয়বিধ শাস্ত্রের নিগূঢ় সমূহ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার কয়েকটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ, যথা :—মায়া ও ব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি, দ্বৈতভাবে মায়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যোগ ও সাধনা, কর্ম্ম ও মায়া, মন ও আত্মা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, মূর্ত্তিপূজা, ব্রহ্মানন্দ, দুর্গাতত্ত্ব, কালিকাদেবী, তারা তত্ত্ব, ষোড়শী মূর্ত্তি, ত্রিপুরাদেবী, দেবী ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা প্রভৃতি দেব-দেবী ও আচার, উপাসনার জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকলে এরূপ জটিল বিষয়কে সহজভাবে প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। বেদান্ত ও তন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

বিচিন্তা ভারতী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত :—

আস্তিক্য সাধন মার্গের বিবিধ ধারার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে বৈদিক ও তান্ত্রিক। ......শাস্ত্রের এই জটিল ও নিগূঢ় রহস্য শুধু টিকা টিপ্পনিতে উপলব্ধি করা যায় না। তমো ও রজভাব মুক্ত সাধকই একমাত্র সাধনোচিত উপলব্ধি দিয়ে তা সাধারণ মানুষকে সহজ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধাস্পদ সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যোগজ সাধনার বলে অনুমিতিকে বাদ দিয়ে সাধন মার্গের এই জটিল সোপান গুলো অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে সাধারণের পারঙ্গম করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এই গ্রন্থে। বর্ত্তমান বণিক বৃত্তির যুগে সমস্যাপীড়িত মানুষের কাছে চির শান্তি ও শুদ্ধির পক্ষে এই গ্রন্থের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার এবং পঠন পাঠন একান্তভাবে কামনা করি।

(—নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী)

যুগান্তর সাময়িকী (১০।৫।৭০)

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত—মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক শ্রীরমেন্দ্র নাথ বসু

বামদেব-সংঘ, ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬

ভারতীয় সাধনার গূঢ় মর্ম জানতে হ'লে দুটি ধারাকে প্রধানতঃ আশ্রয় করতে হয়। তার একটি বৈদিক এবং অপরটি তান্ত্রিক। এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা এই দুইটি ধারায় নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। বৈদিক ধারার দুটি দিক ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক। মূলতঃ বেদান্তে ব্রহ্মই সর্বকারণিক ও সর্বাধার রূপে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত কিন্তু তন্ত্রে অঘটন পটিয়সী মহাশক্তি মহামায়াকেই সর্বশক্তির মূলাধার রূপে গণ্য করা হয়েছে। এই উভয় মতের নিগূঢ় বিষয়গুলি গ্রন্থকার কয়েকটি পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন।

মায়া ও ব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি, দ্বৈতভাবে মায়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যোগ ও সাধনা, কর্ম্ম ও মায়া, মন ও আত্মা, বিদ্যা-অবিদ্যা ও মূর্ত্তিপূজা, ব্রহ্মানন্দ, দুর্গাতত্ত্ব, কালিকা দেবী, তারাতত্ত্ব, ষোড়শী মূর্তি, ত্রিপুরাদেবী, দেবী ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি সাহায্যে আলোচনা সঙ্গে লীলাতত্ত্ব, নাম জপ ও বীরাচার প্রভৃতি বিষয়ের আলো ও তত্ত্বজ্ঞ লেখকের উপলব্ধিজাত পাণ্ডিত্য এবং সহজ সরলভাবে প্রকাশের বর্ণনা অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রের কাছে এই গ্রন্থখানি অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

দৈনিক বসুমতী।

সাধক শশিভূষণ—মূল্য ৪'০০।

কেবল মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাই জ্ঞানী হওয়া যায় না, উক্ত শাস্ত্র সমূহের সার মর্ম্ম অবগত হ'য়ে জীবনে তথা জগতের কল্যাণার্থে যিনি তা প্রয়োগ করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য। সাধক শশিভূষণ যে অনুরূপ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তা এই জীবনী পাঠেই অবগত হওয়া যায়।

গ্রন্থকার সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই যোগী সাধক প্রবরের জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। তন্ত্র উপনিষদ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল হওয়ায় সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কোথাও অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তিদের নিকট গ্রন্থখানি অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

সাধক শশিভূষণ শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক :—রমেন্দ্রনাথ বসু।

বামদেব সংঘ, ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬।

ভারত তথা বাংলা সাধু সন্তের দেশ। লোক শিক্ষার সনাতন ধারা আদি যুগ থেকে এ সকল সাধু সন্ত বা মহাপুরুষদের করুণা ধারায়ই প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় মর্ম সঞ্জীবিত রেখেছে। সাধক মহাত্মা শশিভূষণ সান্যাল বাংলারই এক যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁরই জীবন, শিক্ষা ও অলৌকিক জীবন মাহাত্ম্যের কথা আছে এই সুন্দর গ্রন্থে।

Hindusthan Standard (9th Feb. 1964)

Mahatma Sashi Bhusan Sanyal, also known by the imposing name Siva Ram Kinkar Jagotrayananda Swami, ranks highly among the spiritual personages……

His was a life as simple, utterly dedicated to contemplation full of elevating concern for his disciples and humanity at large usually distinguish the lives of noble preceptors and spiritual leaders of every time.

The author has built up an informative biography of Sadhak Sashi Bhusan for the benifit of the saints adherents admirers whose is legion. Others not of his fold will also be benefited by his well narrated biography of a pious soul K. N. R.

দেশ (১৩ই ভাদ্র ১৩৬৫ সাল)

প্রেমের ঠাকুর :—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের লীলা তত্ত্ব) মূল্য চার টাকা। শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ পরমাত্মার স্বরূপ, ফলে তাঁহার কথা সমস্ত কিছুই অলিখিত আছে। অনেকেই হৃদয়ের আবেগ দিয়া রাম কৃষ্ণ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে সুশীল বাবু একজন এ কথা সগর্ব্বে বলা যায়। ……বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী (ভৈরবী) কথা প্রসঙ্গে অর্থাৎ (২৩ অধ্যায়) সুশীলবাবু তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক যুক্তি দিয়াছেন যাহা এতাবৎ এত সুন্দরভাবে অন্য কেহ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না।